আনিসুল হক
উষার
দুয়ারে

উষার দুয়ারে

আনিসুল হক

পুলিশ ভেঙে ফেলল ১৯৫২ সালের শহীদ
স্মৃতিস্তম্ভ। সোহরাওয়ার্দীর
মনোভাব—বাঙালিদেরও উর্দু শিখতে
হবে। তাজউদ্দীনরা ভাবছেন, একটা
আলাদা দল করতে হবে। মওলানা
ভাসানী কারাগারে।
এবার কী করবেন শেখ মুজিব?

ISBN 978 984 90252 8 3

পুলিশ ভেঙে ফেলল ১৯৫২ সালের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি। শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তি পেলেন ফরিদপুর কারাগার থেকে অনশন ধর্মঘট করার পর। তাঁর আব্বা তাঁকে নিয়ে গেলেন গ্রামের বাড়িতে। সেখানেই মুজিব জানতে পারলেন তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর মনোভাব—বাঙালিদেরও উর্দু শিখতে হবে। এবার কী করবেন মুজিব? তাজউদ্দীনরা ভাবছেন, একটা আলাদা দল করতে হবে। গণতন্ত্রী দল গঠনের তৎপরতার সঙ্গে খানিকটা যুক্ত থাকলেন তিনি। মওলানা ভাসানী কারাগারে। সেখান থেকে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়া, তাজউদ্দীনের আওয়ামী লীগে যোগ দেওয়া, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, এ কে ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রী হওয়া আর শেখ মুজিবের মন্ত্রিত্ব লাভ এবং মন্ত্রীর বাড়ি থেকে সোজা জেলযাত্রা। তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে রেনুর অকূলপাথারে পড়ে যাওয়া।
রাজনীতির ডামাডোল ওলটপালট করে দেয় ব্যক্তিমানুষেরও জীবন। এই রাজনীতির গতি-প্রকৃতি কেবল একটি দেশের নেতা বা জনগণ নির্ধারণ করে না, তা নির্ধারণের চেষ্টা চলে ওয়াশিংটন থেকেও। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি তো তা-ই বলতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের ইচ্ছাই কি জয়ী হয় না?

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

আনিসুল হক

জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, নীলফামারী। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে রংপুরে। পড়েছেন পরীক্ষণ বিদ্যালয় রংপুর, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি সক্রিয়। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ২০১২ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সে সময়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে লেখা উপন্যাস *যারা ভোর এনেছিল*। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

যুদ্ধাপরাধীদের
বিচার চাই!
আমারবই.কম

উষার দুয়ারে

মুক্তিযুদ্ধ
ই
আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

আনিসুল হক

উষার দুয়ারে

'যারা ভোর এনেছিল' উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব

উৎসর্গ

নতুন প্রজন্ম

ভূমিকা

যারা ভোর এনেছিল বেরিয়েছিল ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এবার বেরোচ্ছে *উষার দুয়ারে*। এটি আসলে *যারা ভোর এনেছিল* উপন্যাসের পরবর্তী পর্ব।

আগের বইটির মতোই এই কাহিনি রচনাকালে বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ব্যাপকভাবে। কোথাও কোথাও নেওয়া হয়েছে একেবারে দুহাতে, কোথাও করা হয়েছে পুনর্লিখন। এবার সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করা হয়েছে ২০১২ সালে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে।

তার পরও বলব, এই বই উপন্যাস, ইতিহাস নয়। বাংলাদেশ নামের এই প্রিয় দেশটি আমরা কীভাবে পেলাম, কারা ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার ভোরের কারিগর, কেমন মানুষ ছিলেন তাঁরা—ইতিহাসের নির্জীব শুষ্ক মানুষ নয়, জীবন্ত মানুষ—এই কাহিনিতে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

যারা ভোর এনেছিল প্রকাশের পর পাঠকের বিপুল সাড়া আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আনিসুল হক
anisulhoque1971@gmail.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের আমগাছের ডালে ডালে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি হুটোপুটি করছে। পাতায় পাতায় আলোর নাচন, তার সঙ্গে পুচ্ছ তুলে নাচে এই ত্রিকালদর্শী পাখি দুটো। ব্যাঙ্গমা বলল, 'কত কিছু ঘইটা গেল এই কয় দিনে, তাই না?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'হ, হইছে।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'কও তো, কী কী হইছে?'

ব্যাঙ্গমি গ্রীবা বাঁকাল, ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকে বলল :

রক্ত ঝরেছে যে মেডিকেল চত্বরে।
শহীদ মিনার সেথা উঠেছিল গড়ে ॥
গোলাম মাওলা আর সাঈদ হায়দার।
বদরুলের ওপরে দেয় নকশার ভার ॥
এরা পড়ে ডাক্তারি, লাগল প্রাণে।
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ধ্বনি আসে কানে ॥
শহীদ স্মৃতিরে চির অমর করিতে।
ঠিকাদারে বলে তারা সিমেন্ট-ইট দিতে ॥
শরফ উদ্দিন ছিল মেডিকেল ছাত্র।
ইঞ্জিনিয়ার বলে তাকে সকলে ডাকত ॥
কারফিউ চারদিকে ভয়ার্ত চৌদিক।
ছেলেরা মিনার গড়ে, এমনি নির্ভীক ॥
সারা রাত কাজ হলো, ভোর হলো রাত।
শহীদ মিনার গড়ে সম্মিলিত হাত ॥
শহীদ শফির বাবা উদ্বোধন করে।
কালাম শামসুদ্দিনও করেছেন পরে ॥
দলে দলে চলে আসে ফলক চত্বরে।

ফুলেল শ্রদ্ধা তারা নিবেদন করে ॥
কাগজে খবর হলো শহীদ মিনার।
শাসকে প্রমাদ গোনে, কী আছে করার ॥
পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে ভাঙো ও মিনারে।
বুকের পাঁজর যেন ভাঙল আহা রে ॥
ইটের মিনার ভাঙে পুলিশেরা যত।
বুকে বুকে গড়ে ওঠে স্মৃতিস্তম্ভ তত ॥

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি দেখেছে সেই স্মৃতিস্তম্ভটির গড়ে ওঠা। দেখেছে পুলিশের নিষ্ঠুর আক্রমণে কীভাবে খসে পড়ল একেকটা ইট। কীভাবে ছাত্ররা ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল তাদের নিজ হাতে গড়ে তোলা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটার ধ্বংসদৃশ্য দেখে।

তারা দুজনে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল আমগাছের ডালে।

২.

'স্মৃতিস্তম্ভটা ভেঙে ফেলেছে মা।'

ঠান্ডা ভাত মুখে তুলে আনিসুজ্জামান বললেন। মা তাঁর পাতে তরকারি তুলে দিলেন চামচে, বললেন, 'তরকারিটা গরম। তরকারি মেখে ভাত খাও।'

১৭ বছরের আনিসুজ্জামান। জগন্নাথ কলেজে পড়েন। যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। কতই-না কাজ তাঁর। সারা দিন তাঁর কাটে বাইরে বাইরে। বাড়ি ফিরেছেন মধ্যরাতে। ঠাঁটারীবাজারে ৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের দোতলায় এই বাড়ি। খাবার টেবিলে বসে রাস্তা দেখা যায়। একটা মাধবীলতার ঝাড় আছে দোতলার বারান্দায়, সেখান দিয়ে চোখ গেলে রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, চলন্ত রিকশার নিচে কেরোসিনের লণ্ঠনের আলো দেখা যায়। চলন্ত ঘোড়ার গাড়ির চলাচলের আওয়াজ, অশ্বখুরধ্বনি, মাঝেমধ্যে ঘোড়ার ডাকও শোনা যায়। আজ অবশ্য খুব নীরব চারদিক। কেবল পেছনের আমগাছটায় ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে কুকুরের বিলাপ—কান পাতলে শোনা যাবে।

আনিসুজ্জামান মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি নীরব।

'আমাদের চোখের সামনেই ভাঙল,' আনিসুজ্জামান বললেন।

ভাত মেখে নিচ্ছেন তিনি তরকারিতে। মা সব সময়ই চান, ভাতটা তরকারির সঙ্গে ভালো করে মেখে নিয়ে ছেলে মুখে তুলুক। আনিসুজ্জামানরা পাঁচ ভাইবোন। তাঁর বড় তিন বোন, ছোট একটা ভাই আখতারুজ্জামান—স্কুলে পড়ে। দোতলা বাড়ির নিচতলায় তাঁদের একটা বোন থাকেন, সংসার পেতে। ছোট ভাইটা নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে। আব্বাও শুয়ে পড়েছেন। বাসাটা নীরব। শুধু একা জননী জেগে ছিলেন ছেলের আসার প্রতীক্ষায়।

খুব ভয়ার্ত এখন ঢাকার পরিবেশ। দুই দিন আগেও গুলি হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি, বাইশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই স্লোগান দিতে দিতে কতজন মারা গেল। কতজন আহত হলো। এখন চলছে সাধারণ ধর্মঘট। আবার কারফিউ। রাস্তা পাহারা দিচ্ছে পুলিশ আর মিলিটারি। মিলিটারিবাহী শকট রাস্তায় চলে ভীতি ছড়াতে ছড়াতে। তারা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র তাক করে রাখে ট্রাকের সামনের মাথাটার ওপরে।

মাধবীলতার ঝাড় থেকে সুগন্ধ আসছে।

আনিসুজ্জামান পানির গেলাস তুলে নিলেন। মা বললেন, 'ভাত খাওয়ার সময় পানি খেতে হয় না, বাবা।'

আনিসুজ্জামান বললেন, 'পুলিশ আসছে, এই খবর শুনে আমরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। তুমি তো স্মৃতিস্তম্ভটা দেখে এসেছ, মা আমরা সবাই যতটা পারি, স্তম্ভটার কাছেই ভিড়েছিলাম। লোহার রেলিংটা ধরে। ইমাদুল্লাহ আছে না, ওই যে লম্বা ছেলেটা, শেরওয়ানি-পাজামা পরে থাকে, ও তো কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছিল, ক্যামেরা, ক্যামেরা। কেউ একজন ক্যামেরা নিয়ে এসো। ওরা শহীদ মিনার ভেঙে ফেলছে। একটা একটা করে ইট খুলে ফেলল। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন আমাদের পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলছে।'

মা টেবিল ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

মা কি খুব দুঃখ পেলেন?

আনিসুজ্জামানেরও আর খেতে ইচ্ছে করছে না। তিনিও উঠে পড়লেন।

মা গতকাল স্মৃতিস্তম্ভে গিয়েছিলেন, আব্বাকে সঙ্গে নিয়ে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক আব্বাও হয়তো গিয়েছিলেন নিজের গরজেই। বাংলা ভাষার প্রতি টান তো সবারই আছে। তবে মা-ই তাঁকে বলেছিলেন, 'চলো, শুনলাম শহীদ স্মৃতি মিনার হয়েছে। ওখানে যাই। দেখে আসি।'

ধর্মঘট চলছিল। কাজেই গাড়ি আর নেওয়া হলো না। রিকশা ভাড়া করে গিয়েছিলেন আনিসুজ্জামানের পিতা ডাক্তার এ টি এম মোয়াজ্জেম আর মা সৈয়দা খাতুন।

তোয়ালেতে হাত মুছছেন আনিসুজ্জামান। বারান্দায় তাঁর ছায়া পড়ে। নাতিদীর্ঘ তরুণ, নাকের নিচে প্রজাপতির মতো গোঁফ, হালকা-পাতলা অবয়ব, চোখে চশমাটা স্থায়ী হয়ে আছে। ছায়ায় চশমাটার এক কোনা দেখা যায়। এ সময় আব্বার চপ্পলের আওয়াজ। আব্বা কি ঘুম থেকে উঠে এলেন!

তিনি বারান্দায় দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমার মা বলছিলেন, স্মৃতি মিনারটা ভেঙে ফেলেছে পুলিশ!'

'জি আব্বা।'

'তোমার মা কথাটা শুনে একটু আঘাত পেয়েছেন।'

শুনে আনিসুজ্জামান ঘরের খোলা দরজাপথে মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। চশমাটা একটু ঠিক করে নিলেন। মা কি কাঁদছেন?

'তোমার মা একটু বেশি ইমোশনাল হয়ে পড়েছেন। তুমি কি জানো, কালকে যখন আমরা বিকেলবেলা শহীদ মিনারে যাই, তখন খুব একটা আবেগঘন দৃশ্য তৈরি হয়েছিল। সবাই সাধ্যমতো সাহায্য করছিল। টাকাপয়সা, ফুল। ওরা বলাবলি করছিলেন, এই সাহায্য আন্দোলনের তহবিলে জমা করা হবে। যেখানে যা খরচ লাগছে, দেওয়া হবে। তোমার মা সোনার হার দিয়ে দিলেন। আমি তো অবাক। এই হারটা তিনি আমাকে না বলেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। জিগ্যেস করলাম, 'কোন হার।' তোমার মা বললেন, নাজমুনের।'

আনিসুজ্জামানেরও চোখটা ছলছল করে উঠল। নাজমুন তাঁর ছোট বোন। মাত্র ১১ মাস বয়সে তাদের এই ছোট বোনটি বছর দুয়েক আগে মারা যায়।

মা তাকে ভোলেননি।

মা ভাষা আন্দোলনে শহীদদের জন্যও কিছু একটা করার কথা ভেবেছেন।

অকালে প্রাণ হারানো ১১ মাস বয়সী কন্যার সোনার হার সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে। স্তম্ভের বেদিতে সেটা নিবেদন করে এসেছেন চুপি চুপি। মায়ের সঙ্গে এই কয়েক দিন বেশি কথা বলার সময় হচ্ছে না বটে, কিন্তু মা এই কথাটাও তাঁকে বলেননি।

ইলেকট্রিক বাতির আলোয় মায়ের চোখের নিচের জলবিন্দু আনিসুজ্জামান দেখতে পান।

মা তাড়াতাড়ি করে আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে ফেলেন।

কোথাও একটা শকুনি কি কেঁদে উঠল। ঠিক মানবশিশুর কণ্ঠে। নাকি পাশের বাড়ির বাচ্চাটা!

আনিসুজ্জামান বারান্দা ছেড়ে নিজের ঘরের দিকে হাঁটতে থাকলেন।

৩.

কত দিন পর এই বাড়ি ফেরা! কত দিন পর সেই পরিচিত নদী মধুমতী, বাইগার, বাড়ির পাশের গভীর অথচ কররেখার মতো চিকন আর পরিচিত খালটি পেরিয়ে ফিরে আসা! সেই পরিচিত হিজলের ডাল ঝুঁকে আছে খালের পাড়ে, কোথাও বা জলের গায়ে নুয়ে আছে তার সবুজ পাতা! সেই পরিচিত ঘাট, দূরে বাজে পোড়া জামের ডাল। কত দিন পর ফিরছেন শেখ মুজিব! কত মাস! ২৭-২৮ মাস। প্রায় ৮০০টা দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী শেখ মুজিবুর রহমানকে পার করতে হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। সন্ধ্যা হলেই তাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তালাবদ্ধ কুঠুরিতে। একা সেলে কত রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। একটুখানি আকাশ দেখার জন্য কী রকম আকুলিবিকুলিই-না করত তাঁর পুরো অন্তর। চাঁদের আলো কেমন, মনে করার চেষ্টা করতেন জেলখানার দেয়ালঘেরা কক্ষে শুয়ে। মনে হতো, একটা জোনাকিও কি পথ ভুলে আসতে পারে না কারাগারের ভেতরে। মনে হতো, রাতের আকাশ কেমন, একটিবার কি দেখা যাবে না। মনে হতো, যদি কোনো দিন মুক্তি পান এই কারাগার থেকে, রাতে শুয়ে থাকবেন খোলা কোনো মাঠে, ঘাসের ওপরে, চিত হয়ে, শুধু আকাশ দেখার জন্য। দেখবেন রাতের আকাশ, আকাশের গায়ে অনন্ত নক্ষত্রবীথি, দেখবেন চাঁদের নিচে মেঘের ছুটে চলা! দেখবেন আকাশের ওপারে আকাশ।

শেখ মুজিব দূর থেকে দেখতে পেলেন নিজেদের বাড়ির ঘাট। নৌকার পাটাতনে ছইয়ের নিচে বসে থেকে তিনি শুনতে পাচ্ছেন একটানা দাঁড় টানার শব্দ, পানির ছলাচ্ছল। শ্যাওলার গন্ধ নাকে এসে লাগছে, কচুরিপানার দাম কেটে পথ করে নৌকা এগিয়ে চলেছে, হোগলার বনে একটা বেজি মুখ তুলে তাকাল। একটু পরই তাদের নৌকা ভিড়বে ঘাটে,

লুৎফর রহমান সাহেব তাঁর লাল রঙের গামছাখানা নৌকার পাটাতন থেকে তুলে ঘাড়ে রাখলেন। ওই তো ঘাট। এবার নামতে হবে। বাড়ি ফিরছেন মুজিব, ২৮ মাস পর।

ছলাৎ করে একপশলা পানি নৌকার বৈঠার বাড়ি খেয়ে ছিটকে এসে পড়ল মুজিবের হাতে। সেই পানিতে আঙুল বোলাতে বোলাতে মুজিবের মনে পড়ল, বছর দুয়েক আগে বন্দী অবস্থায়ই গোপালগঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁকে। ওখানে একটা মামলা ছিল। গোপালগঞ্জ উপকারাগারে ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দী আর নিরাপত্তা বন্দী রাখার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দিলেন, মুজিবকে রাখতে হবে থানা চত্বরে। থানায় তাঁর থাকার জায়গা হলো 'নজরবন্দী' ঘরে। শেখ মুজিব সেই ঘরে ঢুকেই মৃদু হেসেছিলেন। সেটা তো সেই ঘর, যেখানে ব্রিটিশ আমলে স্বদেশি আন্দোলনের কর্মীদের নজরবন্দী করে রাখা হতো। সে ঘর যেখানে, সেই মহল্লাতেই বালক মুজিব থাকতেন। গোপালগঞ্জে সেই ছোটবেলা থেকেই বসবাস করেছেন মুজিব, সেখানেই তাঁর স্কুলজীবন, সেখানকার মাঠেই তাঁর ফুটবল খেলা, সেখানকার নদীতে সাঁতার কেটে তাঁর বেলা পার করা, সেখানকার আলো-বাতাসেই তাঁর জীবনীশক্তি সঞ্চয়, তার প্রতিটা ধূলিকণা, প্রতিটা গাছপালা, প্রতিটা রাস্তা, দোকান, ঘরবাড়ি, হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকের বাড়ির সদর-অন্দর তাঁর কত চেনা! আর ওই থানা চত্বর তো ছোটবেলায় হাফপ্যান্ট পরা মুজিব রীতিমতো চষে বেড়িয়েছেন। ছোট্ট বালক ওই ঘরের নজরবন্দীদের সঙ্গে মিশতেন, গল্প করতেন, কেউ বাধা দিত না। তাদের কাছে শুনতেন দেশপ্রেমের কথা, দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার ব্রতের কথা। সেদিন দেশ ছিল পরাধীন। সেদিন শাসক ছিল ব্রিটিশরা। ওইখানে যাঁরা বন্দী থাকতেন, তাঁরা ছিলেন স্বাধীনতার কর্মী। ব্রিটিশরা বিদায় নিয়েছে। কায়েম হয়েছে পাকিস্তান। যে পাকিস্তানের জন্য মুজিব আন্দোলন করেছেন দিনের পর দিন। ওই গোপালগঞ্জবাসীকেই কত আশার কথা শুনিয়েছেন। তাঁদের সংগঠিত করেছেন মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য। ব্রিটিশদের বানানো সেই নজরবন্দী ঘরে এখন ঠাঁই মিলেছে মুজিবের। একটা রাতের জন্য।

২৮ মাস পর টুঙ্গিপাড়ার নিজের বাড়ির ঘাটে নৌকা ভিড়ছে, আর মুজিবের মনে পড়ছে সেই থানা চত্বরের নজরবন্দী ঘরে আশ্রয় পাওয়া রাতটার কথা। তিনি ঘরের বাইরে বসে আছেন। জেলের মধ্যে প্রত্যেক সন্ধ্যায় সেলে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। জানালা দিয়ে

একটুখানি জ্যোৎস্না একটুখানি তারা দেখার জন্য কী ব্যাকুল হয়েই-না তিনি উঁকিঝুঁকি মারতেন! তাই থানা চত্বরে নজরবন্দী ঘরে আশ্রয় পেয়ে মুজিব গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে বসে থেকেছিলেন। অন্ধকার দেখলেন। আকাশের তারা দেখলেন। দূরে নদী বয়ে যাচ্ছে, কল্লোল শোনা যায় কান পেতে থাকলে। তিনি নদীর স্রোতধ্বনি শুনলেন। পুলিশ কর্মচারী তাঁর পাশে বসে রইলেন। তাঁরা গল্প জুড়ে দিলেন। দু-একজন বন্ধুবান্ধবও এসে জুটল। আহ্! কত দিন পর মুক্ত আকাশের নিচে রাতযাপন। পুলিশের দিক থেকে কোনো ভয় ছিল না, তারা জানে, এই বন্দী পালিয়ে যাবে না। তিনি দেখলেন, দূরে শটিবনে জোনাকির ঝাঁক। তাঁর মনে হলো, জোনাকির জীবনও কত মুক্ত। তারা ইচ্ছামতো ঘুরছে, চলছে, ফিরছে। আর আলো জ্বালাচ্ছে। মুজিবের মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের গান :

ও জোনাকি, কী সুখে আজ ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তাই বলে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ করে আপন আলো জ্বেলেছ ॥

রাত বেড়ে গেল। বন্ধুরা বিদায় নিল। একটা নীরবতা নেমে এল যেন চরাচরে। মুজিব খোলা আকাশের নিচে বসে সেই নীরবতাই উপভোগ করতে লাগলেন। আকাশে তারা জ্বলে উঠল। কত তারা। কত দূর, আকাশের ওপারে কোন আকাশে এই তারাগুলো জ্বলছে। মুজিব অন্ধকারে অসীম আকাশের নিচে বসে তারা দেখছেন। পুলিশ কর্মচারী নিজেও ঘুমোতে যাবেন। তিনি বুঝছেন না, এই অসীম অন্ধকারে, এই নির্জন থানা চত্বরে বসে মুজিব পাচ্ছেনটা কী! তাঁকে কে বোঝাবে, কারাগারে কোনো দিন সন্ধ্যার পর খোলা আকাশের নিচে থাকার সুযোগ হয় না মুজিবের। তিনি আর কিছু না হোক, পাচ্ছেন ছাদহীন, সীমাহীন আকাশের নিচে থাকার আস্বাদ। তিনি হয়তো তাঁর সীমানার বাইরে আনুভূমিকভাবে কোথাও যেতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি তো মুক্তি পেয়েছে এখানে। সামনে কোথাও দেয়াল নেই। মাথার ওপরে জেলখানার ছাদটা নেই। এখানে বসে থাকাতেই তাঁর একধরনের আরাম, একধরনের প্রশান্তি। পুলিশ কর্মচারী হাই তুললেন, বললেন, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে। এবার যে শুতে যেতে হয়।' মুজিব বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে। কিন্তু তাঁর ঘরের পাশেই একটা ওয়্যারলেস মেশিন। সারাক্ষণ তাতে খটখট শব্দ হচ্ছে। মুজিব ঘুমোতে না পেরে আবার বেরোলেন। বাইরেই ঘুমোবেন, একবার ভাবলেন। কিন্তু গোপালগঞ্জের

বিখ্যাত মশার যন্ত্রণায় তা-ও সম্ভব হলো না। আবার ঘরের ভেতরেই গিয়েই তাঁকে শুয়ে পড়তে হলো।

এখন টুঙ্গিপাড়ায় শেখবাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে তিনি। সঙ্গে আব্বা। পাঁচ দিন আগে তিনি মুক্তি পেয়েছেন ফরিদপুর কারাগার থেকে। নৌকা থেকে ঘাটে উঠতে কষ্ট হচ্ছে মুজিবের। রোগা শরীর, প্রায় ১০ দিনের অনশন ধর্মঘটের ধকল গেছে তার ওপর দিয়ে। ঘাটের সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠছেন তিনি। একটা একটা করে ধাপে পা রাখছেন। আব্বা এসে তাঁর হাত ধরলেন। মুজিব বললেন, 'আব্বা, আমাকে ধরতে হবে না। আপনি সাবধানে ওঠেন।'

ফরিদপুর থেকে টুঙ্গিপাড়ায় আসতে পাঁচ দিন লেগে গেল শেখ মুজিবুর রহমানের।

শেখ লুৎফর রহমান ছুটে গিয়েছিলেন ফরিদপুরে। আব্বার সঙ্গেই নৌকায় ফিরছেন শেখ মুজিব। সেই পরিচিত মধুমতী নদী, বাইগার খাল হয়ে টুঙ্গিপাড়া ঘাট। ঘাটের ধাপগুলো বেয়ে খালপাড়ে উঠলেন তিনি। আব্বা তাঁর হাত ধরে রেখেছেন। বাড়ির দাওয়া। ফাল্গুনের হাওয়ায় গাছগাছালির পাতা দুলছে। আমের মুকুলের মাদকতাভরা গন্ধ চারদিকে। খোলা জায়গাজুড়ে খড়বিচালি ইতস্তত ছড়ানো। লাল গাভি গা চেটে দিচ্ছে তার বাছুরের। লোকজন এসে ভিড় করে ধরতে লাগল তাঁকে। তিনি উঠোনের দিকে তাকালেন। মাকে দেখা যাচ্ছে দূরে, সাদা শাড়ি পরে মা এদিকেই এগিয়ে আসছেন। মুজিবকে দেখে তাঁর মায়ের মুখটা প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল।

তাঁরা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

শেখ মুজিবের চোখে চশমা। গায়ে হাওয়াই শার্ট। পরনে পায়জামা। ৩২ বছরের এই যুবক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। নাকের ভেতরে ক্ষত। তিনি নিজেদের বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস নিলেন। ধানের খড়ের গন্ধ, আমগাছ থেকে ভেসে আসা মুকুলের গন্ধ নাকে এসে লাগল। তিনি যেন ঠিক তাঁর শৈশবের গন্ধ পাচ্ছেন। একদল হাঁসের বাচ্চা তাঁকে পাশ কাটিয়ে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে খালের দিকে চলে যাচ্ছে।

মুজিব তাঁর নিজ ভিটেয় হাঁটছেন। ঘাট থেকে হেঁটে হেঁটে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে রেনু আর তাঁর দুই সন্তান, হাসু আর কামাল। মুজিবের মনে হলো, আহা, মহিউদ্দিনের না জানি কী অবস্থা? ও কি এখনো অনশন করছে ফরিদপুর কারাগারে? নাকি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

মুজিব ঢাকা জেলে ৫ নম্বর খাতা বা ওয়ার্ডে নির্জন প্রকোষ্ঠে থাকতেন। কাউকেই নির্জন প্রকোষ্ঠে তিন মাসের বেশি রাখার নিয়ম নেই, মুজিবের বেলায় নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছিল। মুজিব যখন চিকিৎসার জন্য জেল-হাসপাতালে, তখন মহিউদ্দিনকেও এই সেলে আনা হয়। একদিন দুপুরবেলা মহিউদ্দিন বিছানায় শুয়ে আছেন, তখন হঠাৎ মুজিব এলেন সেখানে। মহিউদ্দিনকে দেখেই তিনি ভীষণ জোরে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসিতে সমস্ত জেলখানা যেন কেঁপে উঠছে। মহিউদ্দিনও মুজিবকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

মুজিব মহিউদ্দিনের পাশে শুয়েই কেঁদে ফেললেন, যেন কত দিন পর নিকটজনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে।

এরপর মুজিব গল্প আরম্ভ করলেন। কীভাবে তিনি গোয়েন্দাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছেন, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করেছেন, পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে মিশেছেন, পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে আবার দেশে ফিরেও এসেছেন, সেসব গল্প।

তারপর তিনি বললেন, 'মহিউদ্দিন, ঢাকায় একটা খুব ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, জানো, দারুণ! খুব গোছানো। খুবই নিষ্ঠাবান। রাজনৈতিক সাংগঠনিক ক্ষমতাও খুব ভালো।'

মহিউদ্দিন বিছানা থেকে উঠে বসে বললেন, 'কে?'

মুজিব বললেন, 'তাজউদ্দীন আহমদ। খুব ভালো ড্রাফট করতে পারে, খুব মেধাবী। পড়াশোনা করে, ভাবনাচিন্তাও খুব পরিষ্কার।'

কথায় কথায় বেলা হয়ে গেল। মুজিব বললেন, 'উঠি রে। আমাকে আবার হাসপাতালে যেতে হবে। শরীরটা ভালো না।'

মুজিব দরজার দিকে পা বাড়ালেন। মহিউদ্দিন আহমদ বলে উঠলেন, 'মুজিব, আমার তো এখনই একা একা লাগছে। এই নিঃসঙ্গ প্রকোষ্ঠে তুমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একা থাকলে কী করে?'

ঢাকা জেল-হাসপাতাল থেকে শিগগিরই মুজিবকে আবার কারাগারের ওই সেলে ফিরে আসতে হলো। তার পর থেকে তারা দুজন থাকেন একই সেলে। কিন্তু এইভাবে আর কত দিন!

টুঙ্গিপাড়ার শেখবাড়িতে নিজের ভিটেয় দাঁড়িয়ে আমগাছের মুকুলগুলোর দিকে তাকালেন মুজিব। কাঁঠালগাছে এঁচোড় ধরেছে, মাটিতে ছোট ছোট এঁচোড় পড়ে আছে। মুজিবের মনে পড়ল কারাগারের দিনগুলোয় তাঁদের অনশনের

প্রস্তুতির দিনগুলোর স্মৃতি। তিনি উপুড় হয়ে একটা এঁচোড় হাতে তুলে নিলেন, অলক্ষ্যে আঙুল দিয়ে খোঁচাতে লাগলেন এঁচোড়ের গায়। একটা বিড়াল তার পায়ের কাছে এসে মিউ মিউ করছে। মুজিবের মনে পড়ে গেল ঢাকা কারাগারে তাঁর পোষা বিড়ালটার কথা।

৪.

ঢাকা কারাগারে মুজিবের একটা পোষা বিড়াল ছিল।

আজ থেকে প্রায় এক মাস আগের কথা। ফেব্রুয়ারির শুরু। ১৯৫২ সাল। সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। খাজা নাজিম উদ্দিন উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিয়ে আবারও ঘুমন্ত অগ্নিগিরির জ্বালামুখ খুলে দিয়েছেন। সারা দেশ, বিশেষ করে ঢাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে একুশে ফেব্রুয়ারিতে বিক্ষোভ মিছিল-প্রতিবাদ আয়োজন করার। শেখ মুজিব কিছুদিন আগেও ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ছাত্রলীগের নেতারা। মোহাম্মদ তোয়াহা আর অলি আহাদ এসেছেন। শওকত মিয়া এসেছেন। আওয়ামী লীগের কর্মীরা এসেছেন। সবাই মিলে সেখানেই ঠিক করা হয়েছে, একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হবে এবং এ জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে। মুজিবও জানিয়ে দিয়েছেন, 'আমার মুক্তি দাবি করে আমি ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করব।'

জেলখানায় এসে মুজিব আর মহিউদ্দিন আল্টিমেটাম পাঠিয়ে দিলেন সরকারের কাছে। তাঁদের স্পষ্ট ঘোষণা, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুক্তি না দিলে তাঁরা অনশন ধর্মঘট করবেন। দুই বছরের বেশি মুজিবকে আটক রাখা হয়েছে বিনা বিচারে। আর কত অন্যায় জুলুম সহ্য করা যায়!

তাঁদের অনশনের নোটিশ পেয়ে ঢাকা জেলের জেলার ছুটে এসেছিলেন মুজিবের কাছে।

'অনশন করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার শরীর খারাপ। মাত্র হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন। এখন অনশন করলে নির্ঘাত মারা যাবেন।' তিনি মুজিবের উদ্দেশে বললেন হাত নেড়ে নেড়ে।

'শরীর খারাপ? আপনাদের মেডিকেল বোর্ডই তো একজামিন করে রিপোর্ট দিয়েছে আমি সুস্থ। এখন আর হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নাই। বাকি চিকিৎসা জেলখানাতেই চলতে পারে।'

'হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন নাই, সেটা বলেছে। কিন্তু আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন নাই, সেটা তো বলে নাই।'

'ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনা বিচারে বন্দী রেখেছেন। কোনো অন্যায় তো করি নাই আমি ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব। হয় জ্যান্ত অবস্থায়, না হয় মৃত অবস্থায়। ইদার আই উইল গো আউট অব দি জেইল অর মাই ডেডবডি উইল গো আউট।'

তাঁরা অনশন করবেন। সব ঠিকঠাক। বাইরে নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুজিব আর মহিউদ্দিন মানসিকভাবে প্রস্তুত।

আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস। তার আগেই মুক্তি পেতে হবে মুজিবকে।

সকালবেলা। কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মুজিব আর মহিউদ্দিন এসব নিয়েই কথা বলছিলেন। রাজপথে রোজ মিছিল হচ্ছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন কারাভবনের তিনতলার সিঁড়িতে এসে দাঁড়ান। এখান থেকে মিছিলকারীদের দেখা যায়। মিছিলকারীরাও বোধ করি শেখ মুজিবকে দেখে চিনতে পারেন। তাঁরা স্লোগান ধরেন, 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। নাজিম উদ্দিন রোডে এই কারাগার। মাঝামাঝি জায়গায় দেয়াল ঘেঁষে একটা মাজার। মিছিলগুলো সেই মাজারের কাছে এসে সমাবেশ করে। বক্তৃতা হয়।

মুজিব আর মহিউদ্দিন তিনতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জঙ্গি রূপ নিচ্ছে, মুজিব ছাত্রনেতাদের হাসপাতালে থাকতেই একুশে ফেব্রুয়ারি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন। তাঁর সমস্ত অন্তর ছুটে যাচ্ছে বাইরের মিছিলে। কিন্তু তিনি নিজে যেতে পারছেন না। অনশন ধর্মঘট করে হয় একুশের আগেই মুক্তি আদায় করে নিতে হবে, না হলে ভেতরে থেকেই অনশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানানো যাবে।

মুজিব একটা জগে করে পানি নিয়ে বের হলেন বাইরে। ফেব্রুয়ারির নরম রোদে তাঁর লাগানো ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলার গাছগুলোর পাতা তীব্র সবুজ

দেখাচ্ছে। গাছের পাতায় এখনো শিশিরবিন্দু জমে আছে। মুজিব জগ থেকে পানি ঢাললেন গাছের গোড়ায়।

তাঁদের পোষা বিড়ালটা এসে শুয়ে আছে বারান্দায়, কারাগারের পাঁচিল টপকে বারান্দায় এসে পড়া এক টুকরো রোদে। ভীষণ মোটা এই বিড়ালটা। মুজিব আর মহিউদ্দিন পাশাপাশি বিছানায় থাকেন। আর তাঁদের সঙ্গে থাকে এই বিড়ালটা। রাজবন্দী হিসেবে তাঁরা পর্যাপ্ত খাবার পান, মুরগির মাংস থেকে শুরু করে পাউরুটি, মাখন, দুধ পর্যন্ত। তাঁরা বিড়ালটাকে সেই খাবারের ভাগ দেন। বিড়ালটা ভীষণ মোটা হয়ে গেছে। কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়মিত ওজন নেওয়া হয়, সেই ওজন মাপা মেশিনে বিড়ালটাকে তুলে মহিউদ্দিন একদিন মেপে দেখলেন, এর ওজন হয়েছে ১৩ পাউন্ড। সে এতই আরামপ্রিয় যে মুরগির মাংস নিজে চিবিয়ে খেতে পারে না। মুজিব মাংস চিবিয়ে বিড়ালটার সামনে ধরেন। ছোটবেলা থেকেই শেখ মুজিব বাড়িতে নানা ধরনের পশুপাখি পুষে আসছেন। বিড়ালটার জন্য আলাদা করে বিছানা-বালিশ-তোশকেরও ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। বিড়ালটা এমন অলস আর মোটাগাটা হয়েছে যে ছোট্ট বিড়ালের বাচ্চা দেখলেও ভয়ে সে দৌড়ে মুজিব বা মহিউদ্দিনের বিছানার কোণে এসে আশ্রয় নেয়।

একজন ফালতুর পায়ে লেগে মুজিব-মহিউদ্দিনের ফুটবলটা গড়িয়ে গিয়ে বিড়ালটাকে আঘাত হানল। বিড়ালটা এমন অলস আর ধীরগতির যে সময়মতো নড়ে নিজেকে আঘাত থেকে বাঁচাতেও পারল না। ফুটবলের আঘাত পেয়ে সে মিউ মিউ করতে করতে মুজিবের পাশে চলে এল। মুজিব হাত বুলিয়ে তাকে আদর করলেন।

এই ফুটবলটাও এই নিঃসঙ্গ কারাগারে এ দুজন বন্দীর জন্য অনেক বড় সঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ এক বিনোদনের মাধ্যম। মুজিব আর মহিউদ্দিন রোজ ফুটবল খেলেন বিকেলবেলা। খেলা শেষে গোসল সারেন। তারপর কারাপ্রকোষ্ঠে ঢোকেন, যেমন করে রোজ সন্ধ্যায় পোষা মুরগি ঢুকে পড়ে খাঁচায়। ওয়ার্ডেন এসে প্রকোষ্ঠের লোহার দরজায় তালা না লাগানো পর্যন্ত তাঁদের কেমন যেন অস্বস্তি হয়। মুজিবকে সে কথা বলেছেন মহিউদ্দিন, 'যেদিন ওরা তালা লাগাতে দেরি করে, সেদিন আমার কেমন যেন লাগে, মনে হয়, তালা দিতে আসে না কেন?'

খবরের কাগজ এসেছে। দুজনে একই সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। এই সময় একজন কারাকর্তা এসে বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব, আপনাকে একটু জেলগেটে যেতে হবে।'

মুজিব মাথা না তুলেই বললেন, 'কেন?'

'আলোচনা আছে।'

'কী আলোচনা?'

'অনশন বিষয়ে।'

মুজিব জেলগেটে গেলেন। একটু পর মহিউদ্দিনকেও আনা হলো সেখানে। তারও একটু পর মুজিবের মালপত্র, কাপড়চোপড়, বইপত্র সব আনা হলো। মহিউদ্দিনের জিনিসপত্রও এসে গেল।

মুজিব বললেন, 'ব্যাপার কী?'

কারাকর্তারা বললেন, 'আপনাদের বদলি করা হচ্ছে। অন্য জেলে নেওয়া হবে।'

'কোন জেলে?'

কেউ কিছু বলতে চায় না। একটু পর একজন বলেই দিল, ফরিদপুর জেলে।

আর্মড পুলিশ, গোয়েন্দা অফিসার প্রস্তুত হয়ে আছেন।

মুজিব তাঁর জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন খুব ধীরে ধীরে। তাঁর উদ্দেশ্য হলো, দেরি করিয়ে দেওয়া। ফরিদপুর যেতে হলে তাঁদের প্রথমে যেতে হবে নারায়ণগঞ্জে। সেখান থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ। নারায়ণগঞ্জে স্টিমার ফেল করলে তারা কিছুটা সময় বেশি নারায়ণগঞ্জে থাকার সুযোগ পাবেন। এখন তাঁদের ঢাকা কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে সরানো হচ্ছে কঠোর গোপনীয়তায়। কিন্তু মুজিবের প্রথম কর্তব্য হলো মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে তিনি কোথায় আছেন। নারায়ণগঞ্জে তাঁর পার্টির অবস্থা ভালো। কর্মীরা সংগঠিত ও সক্রিয়। তাঁদের কারও না কারও সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই তিনি জানিয়ে দিতে পারবেন তাঁর অবস্থান আর কর্মসূচির কথা। এই কারণে মুজিব তাঁর বইগুলো একটা একটা করে মেলে ধরলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই, নয়া চীনের ওপরে বই। তিনি পাতা উল্টে কবিতা পড়ছেন। যেন তাঁর কোনো তাড়া নেই।

তাঁর পাশে দাঁড়ানো গোয়েন্দা কর্মচারীরা অধৈর্য হয়ে উঠছেন। সুবেদার তাগিদ দিতে লাগলেন, 'তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো।' এই সুবেদার অবশ্য মুজিবকে প্রথম দিন জেলখানায় দেখে চমকে উঠে বলেছিলেন, 'ইয়ে কিয়া বাত হায়, আপ জেলখানা মে।' ('এ কী কথা, আপনি জেলখানায়?') মুজিব তাকিয়ে দেখলেন, এ যে সেই বেলুচ ভদ্রলোক, যিনি কিনা বহু দিন গোপালগঞ্জে নিয়োজিত ছিলেন। মুজিবকে দেখেছেন মুসলিম লীগের হয়ে পাকিস্তান আন্দোলন করতে। এখন পাকিস্তান আন্দোলনের এত বড় নেতাকে

পাকিস্তানের কারাগারে দেখে তিনি বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না। মুজিব হেসে বললেন, 'কিসমত। আমার ভাগ্য।'

ঘোড়ার গাড়ি এল কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে। তাতে উঠতে বলা হলো মুজিব-মহিউদ্দিনকে।

মুজিব বললেন, 'আমাদের পোষা বিড়ালটাকেও ফরিদপুর নিয়ে যাব। ওকে আমাদের সঙ্গে দেন।'

জেলার বললেন, 'ওকে তো দেওয়া যাবে না। ওর তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।'

ওরা দুজনে ধীরে ধীরে ঘোড়ার গাড়িতে উঠলেন। তারপর গাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেওয়া হলো। দুজন প্রহরী রইল গাড়ির ভেতরে এই দুই রাজবন্দীর সঙ্গে। বাকিরা আরেকটা গাড়িতে তাঁদের অনুসরণ করছে। গাড়ি চলছে ভিক্টোরিয়া পার্কের দিকে। সকাল ১০টার মতো বাজে। বাইরে বোধ হয় বেশ রোদ। আবহাওয়াটা সুন্দর। ফাল্গুনের শুরু। এখনো তেমন গরম পড়েনি। দুজন একসঙ্গে যাচ্ছেন। একজন গোপালগঞ্জের। আরেকজন বরিশালের। দুজনেই মুসলিম লীগ করতেন। দুজনেই পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন করেছেন। তবে শেখ মুজিব চিরকালই সোহরাওয়ার্দীপন্থী, আবুল হাশিমকেও তিনি তাত্ত্বিক গুরু মানেন, আর মহিউদ্দিন ছিলেন হাশিমবিরোধী। এখন তাঁরা একসঙ্গে একই সেলে থেকেন। একই সঙ্গে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কিংবা লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অনশন করবেন। 'তুমি থাকো খালে-বিলে আমি থাকি ডালে, দেখা হবে একসাথে মরণের কালে।' মুজিব বিড়বিড় করলেন। ছোটবেলায় এই ধাঁধাটা শুনেছেন। এর উত্তর হলো : মাছ ও মরিচ। মাছ পানিতে থাকে, মরিচ থাকে ডালে, তাদের দেখা হয় রান্নার পাতিলে। মহিউদ্দিনের সঙ্গেও তাঁর এমনি করে দেখা হলো। তাঁরা দুজনে ছিলেন দুই মেরুতে। আজ মৃত্যু কি তাঁদের একসঙ্গে করল? ঘোড়ার খুরের শব্দ উঠছে রাস্তায়। তাঁদের গাড়ি চলছে।

ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশের রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি থামল। তাঁরা নেমে দেখেন, বাইরের পৃথিবীটা সত্যি রোদে-বাতাসে অপরূপ হয়ে আছে। একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছে আর্মড পুলিশ। মুজিব ও মহিউদ্দিন আস্তে আস্তে নামলেন ঘোড়ার গাড়ি থেকে। ট্যাক্সিতে উঠলেনও আস্তে আস্তে। এদিক-ওদিক তাকালেন। পরিচিত কাউকে দেখা যায় কি না। না, পরিচিত কাউকে পাওয়া গেল না। ট্যাক্সি স্টার্ট নিল। আস্তে আস্তে চলতে শুরু করল নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, মোটরগাড়ি। দু-একটা পেটমোটা বাস।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে বাইরের আলোকিত পৃথিবীটা দেখে নিচ্ছেন মুজিব। আদমজী কারখানা দেখা যাচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জ এল ট্যাক্সি। তাঁরা ট্যাক্সি থেকে নামলেন। ছায়া পড়ল তাঁদের পায়ের নিচে। দুপুর হয়ে গেছে। তাঁদের ইচ্ছাকৃত বিলম্ব কাজে লেগেছে নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে এসে দেখা গেল স্টিমার চলে গেছে। এই বিলম্বের কারণ হলো, নারায়ণগঞ্জ শহরের ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানো। তাঁদের থানায় নিয়ে যাওয়া হলো। পরের জাহাজ রাত একটায়। থানায় পরিচিত লোক পেয়ে গেলেন মুজিব। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল নারায়ণগঞ্জের নেতা-কর্মীদের মধ্যে, মুজিব এখন থানায়। থানায় চলে আসতে লাগলেন নেতা-কর্মীরা। তাঁদের কারও কারও হাতে খাবার। পুলিশ তাঁদের বেশিক্ষণ থানায় থাকতে দিতে চায় না। মুজিব বললেন, 'রাতে কোন হোটেলে খেতে যাব বলেন।'

একজন নেতা বললেন, 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রোডে নতুন দোতলা হোটেল হয়েছে। ওখানে আসেন।'

মুজিব বললেন, 'আমি রাত আটটা-সাড়ে আটটার দিকে ওই হোটেলে আসব। সবাইকে খবর দেন। জরুরি কথা আছে।'

রাত আটটায় সেই হোটেলে খেতে গিয়ে সব নেতা-কর্মীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মুজিবের। তাঁরা বসেছেন দোতলায়।

মুজিব বললেন, 'ভাসানী সাহেব, হক সাহেব, অন্য নেতাদের খবর দিন। খবরের কাগজগুলোকে জানান। আর *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* তো আছেই। আমরা আগামীকাল থেকেই আমরণ অনশন করব।'

নারায়ণগঞ্জের নেতারা বললেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল করব। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি তো আছেই, আমরা আপনার মুক্তির দাবিও করব।'

'আমার মুক্তির দাবির সঙ্গে মহিউদ্দিনের মুক্তির দাবিও লাগায়ে দেন।'

'মহিউদ্দিনকে কি বিশ্বাস করা যায়? সে তো মুসলিম লীগার। আবার কারাগারে এসেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে। কী রকম অত্যাচারী হলে মুসলিম লীগ সরকার একজন মুসলিম লীগারকে জেলে পোরে, বোঝেন। উনি বেরিয়ে গিয়ে আবার মুসলিম লীগই করবেন।'

মুজিব মুখের খাবারটা গিলে নিয়ে বললেন, 'আমাদের কাজ আমরা করি। তার কর্তব্য সে করবে। তবে মুসলিম লীগ করবে না। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। সে বন্দী, তার মুক্তি চাইতে আপত্তি কী? মানুষকে ভালোবাসা,

ভালো ব্যবহার ও প্রীতি দিয়েই জয় করা যায়, অত্যাচার, জুলুম, ঘৃণা দিয়ে জয় করা যায় না।'

রাত ১১টায় মুজিব ও মহিউদ্দিনকে স্টিমার ঘাটে আনা হলো। জাহাজ ঘাটেই নোঙর করা ছিল, তাঁরা তাতে উঠে পড়লেন। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সব নেতা-কর্মী জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে রইল। রাত একটায় জাহাজ ছাড়বে। জোরে জোরে হর্ন বেজে উঠল। মুজিব নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। বললেন, 'জীবনে আর কোনো দিন দেখা হবে কি না জানি না, আপনারা আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। দুঃখ নেই। মরতে তো একদিন হবেই। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি, সেই মরণেও শান্তি আছে।' কর্মীরা কেউ জাহাজ থেকে নামছে না। জাহাজ ছাড়তে পারছে না। মুজিব কর্মীদের বললেন, 'আপনারা জাহাজ থেকে নামেন। আমাদের যেতে দেন। আমরা থাকব ফরিদপুর জেলে। আপনারা নারায়ণগঞ্জের রাজপথে আমরা আপনাদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম। আমরা সবাই এক থাকব, একাত্মা হয়েই থাকব। আমাদের দয়া করে যেতে দেন। স্টিমারটা ছাড়তে দেন।' নেতা-কর্মীরা স্টিমার থেকে নেমে গিয়ে স্টিমারটা ছাড়ার সুযোগ করে দিলেন। নোঙর উঠল। কাঠের সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হলো। নদীতে কল্লোল তুলে জাহাজ জেটি থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। ঘাটে সব নেতা-কর্মীর মুখ দেখা যাচ্ছে ইলেকট্রিকের আলোয়। তাঁদের অনেকের চোখেই টলমল করছে অশ্রু।

মুজিব আর মহিউদ্দিনকে দেওয়া হয়েছে ইন্টারক্লাস। কাঠের বেঞ্চ। মহিউদ্দিন ঘুমোতে পারলেন না। মুজিব একটু পরই ঘুমিয়ে পড়লেন। গভীর রাতে জাহাজ পৌঁছাল গোয়ালন্দ ঘাটে। সেখান থেকে ট্রেনে ফরিদপুর।

ফরিদপুর কারাগারে মহিউদ্দিন আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানকে নেওয়া হলো জেল হাসপাতালে।

ফরিদপুর কারাগারটা বেশ ছিমছাম। জেলখানার ভেতরের সরু পথগুলোর দুই পাশে সারি সারি পেঁপেগাছ। তাতে পেঁপে ধরে আছে। সেই পথ বেয়ে তাঁরা এলেন হাসপাতালে। দোতলা হাসপাতাল ভবন। তাঁদের রাখা হলো নিচতলার একটা কক্ষে। সেখানে ঢুকে তাঁরা দেখতে পেলেন দুটো পালঙ্ক, জাজিমের ওপর ধোপদুরস্ত চাদর। দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। মহিউদ্দিন বললেন, 'এই আমাদের মৃত্যুশয্যা পাতা হয়েছে, আমাদের দুজনকেই এখানে শেষশয্যা গ্রহণ করতে হবে।'

মুজিব নীরব-নিথর হয়ে গেলেন। মৃত্যুকে তিনি ভয় পান না আমরণ অনশন মানে যে মরণ না হওয়া পর্যন্ত না খেয়ে থাকা, এটা জেনে-বুঝেই তিনি অনশনে যাচ্ছেন।

মহিউদ্দিন কারাকর্মীদের বললেন, 'আমাদের জন্য ক্যাস্টর অয়েল আর ঘোলের শরবত আনেন। এটা খেয়ে আগে পেট পরিষ্কার করে নিতে হবে।'

কারা কর্তৃপক্ষ ক্যাস্টর অয়েল ও ঘোলের শরবতের ব্যবস্থা করলেন। তাঁরা দুজনেই ক্যাস্টর অয়েল মুখে ঢেলে খেয়ে নিলেন। রাতের মধ্যেই তাঁদের পেট পরিষ্কার হয়ে গেল।

সকালে উঠে তাঁরা প্রথমে দুই গেলাস ঘোলের শরবত খেয়ে নিলেন।

এরপর তাঁরা আর কিছুই খাবেন না। তবে কাগজি লেবু আর লবণ দিতে বলেছেন।

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য এমনিতেই খুব খারাপ। চোখে অসুখ, হার্টের অসুখ। মহিউদ্দিনেরও প্লুরিসিস রোগ। তাঁরা মুখে কোনো কিছুই খাচ্ছেন না। শুধু লেবু আর লবণ মেশানো পানি পান করছেন। কারণ তাঁরা জানেন, এর কোনো ফুড ভ্যালু নেই। শিগগিরই তাঁদের ওজন কমে যেতে লাগল। জেলার, ডেপুটি জেলার, জেলের ডাক্তাররা প্রমাদ গুনলেন। প্রতিদিন পাঁচ পাউন্ড করে ওজন কমছে দুজনের। দুই অনশনকারীর নাকের ভেতরেই জোর করে নল ঢুকিয়ে পাকস্থলী পর্যন্ত নেওয়া হলো। সেই নলের এক মাথায় একটা কাপের মতো, যার ভেতরে নল ঢোকানোর ছিদ্র আছে, সেই কাপের মধ্যে দুধের মতো তরল খাবার রাখা হয়। পেটের ভেতর সেটা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে। মহাবিপদ! শেখ মুজিবের নাকে আগে থেকেই একটা অসুখ ছিল। দু-তিনবার খাবারের নল ঢোকাতেই নাকে ঘা হয়ে গেল। এখন নল ঢোকাতে গেলেই রক্ত উঠে আসে। প্রচণ্ড কষ্ট হয়। তিনি বাধা দিতে লাগলেন, কিছুতেই নাকে নল ঢোকাতে দেবেন না। তখন জেল কর্তৃপক্ষ হ্যান্ডকাফ নিয়ে এল। যদি নাকে নল ঢোকাতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে মুজিবের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হবে।

নল ঢোকানোর সময় ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মুজিবের। তিনি বুঝতে পারছেন, নলটা একটু এদিক-ওদিক হলেই তিনি মারা যাবেন। তাঁর হার্টের অসুখও বেড়ে গেছে। ভীষণ প্যালপিটিশন হচ্ছে। বিছানার সঙ্গে শরীর একেবারেই সেঁটে গেছে। তিনি নিঃশ্বাসও নিতে পারছেন না ঠিকমতো।

মুজিবের মনে হলো, মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু তিনি অনশন ভাঙবেন না। তিনি তো এককথার মানুষ। তিনি মুক্তি আদায় করেই ছাড়বেন। হয় তিনি বাইরের আলো-বাতাসে শ্বাস নেবেন, নয়তো তাঁর লাশ কারাগার থেকে

বাইরে আসবে। সিভিল সার্জন, জেলার সাহেব, জেলের ডাক্তার সবাই বারবার বলছেন, 'সাহেব, অনশন ভাঙুন।' কিন্তু দাবি আদায় না করে রণে ভঙ্গ দেওয়ার পাত্র তো মুজিব নন।

তিনি একজন কয়েদিকে দিয়ে কয়েক টুকরো কাগজ আনালেন। তিনি চিঠি লিখবেন। বিছানায় জেলখানার লাইব্রেরি থেকে আনা বইয়ের ওপরে কাগজ রেখে কলম দিয়ে লিখবেন। উঠে বসতেও কষ্ট হচ্ছে। হাত কাঁপছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। বুক কাঁপছে হাপরের মতো। কাঁপা কাঁপা অক্ষরে তিনি চিঠি লিখলেন। প্রথমে লিখলেন আব্বাকে। তারপর রেনুকে। আর দুটো চিঠি লিখলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানী সাহেবের নামে। তিনি সবার কাছে বিদায় নিলেন। লিখলেন, 'আমার ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিও/দিবেন।'

নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। রক্তে তাঁর গায়ের জামা লাল হয়ে গেছে। মুজিব সেই রক্তের দিকে একবার তাকালেন। কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। চার দিন খাওয়া নাই। বুক টিপটিপ করছে। যেন প্রাণপ্রদীপ নিভে আসছে। কেরোসিনের ল্যাম্পোর তেল শেষ হয়ে গেলে পটপট শব্দ হয়, আর শিখাটা দপদপিয়ে একটুখানি উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলে ওঠে, তারপর নিভে যায়। শেখ মুজিবের হৃৎপিণ্ডটা কি নিভন্ত সলতের মতো শেষ আওয়াজটুকু করে নিচ্ছে। শরীর অসাড় হয়ে পড়ছে।

ঠিক এই সময় যেন স্লোগানের আওয়াজ কানে আসতে লাগল : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বাঙালিদের শোষণ করা চলবে না', 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। শেখ মুজিবের মনে হলো, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, রাষ্ট্রভাষা দিবস, সারা দেশে হরতাল পালিত হচ্ছে। ঢাকায় আজকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বড় ধরনের আন্দোলনের কর্মসূচি পালিত হওয়ার কথা। ঢাকায় কী হচ্ছে কে জানে?

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান শেখ মুজিবের নিস্তেজ শরীরে যেন খানিকটা তেজের সঞ্চার করল। 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই' স্লোগান শুনে মুজিব একটু মন খারাপ করলেন মহিউদ্দিনের জন্য। বেচারা মহিউদ্দিন! রোগে-শোকে মহিউদ্দিনের অবস্থা কাহিল। কিন্তু তাঁর মুক্তির দাবিতে কেউ স্লোগান দিচ্ছে না। আসলে মহিউদ্দিন আহমদ মুজিবের সঙ্গে একত্রে অনশন করবেন, এই কথা ছাত্রলীগের বা আওয়ামী মুসলিম লীগের কেউই মানতে পারছে না। যেমন মানতে পারেননি নারায়ণগঞ্জের নেতা-কর্মীরা।

আজকেও ফরিদপুরের মানুষ মুজিবের মুক্তির দাবিতে জেলখানার বাইরে স্লোগান দিচ্ছে, কিন্তু মহিউদ্দিনের মুক্তি চাইছে না। আচ্ছা, তাহলে শুধু রাজবন্দীদের মুক্তি চাই স্লোগান দিলেই তো হয়, মুজিব বিড়বিড় করেন।

রাতের বেলা মুজিব আর মহিউদ্দিন ফরিদপুর কারাগার হাসপাতালে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছেন। সেপাইরা ডিউটি করতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কত লোক মারা গেছে বলা মুশকিল। গুলি হয়েছে।

শরীরে এক কণা শক্তিও অবশিষ্ট নাই, তবু মুজিব উত্তেজনায় উঠে বসলেন। তাঁকে দেখে উঠে বসলেন মহিউদ্দিনও। ডিউটিরত প্রহরীদ্বয় আবার ধরে তাঁদের দুজনকেই শুইয়ে দিলেন। মুজিবের খুবই খারাপ লাগছে। তাঁর মনে হচ্ছে, তিনি চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। গুলি কেন করবে? তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন। মানুষ হরতাল করবে, শোভাযাত্রা করবে, সভা করবে, কেউ তো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। তিনি নিজের মনে কথা কইতে থাকেন। কোনো গোলমাল করার কথা কখনো কোনো আন্দোলনকারীর চিন্তায়ও থাকে না। ১৪৪ ধারা জারি করলেই গন্ডগোল লাগে। ১৪৪ ধারা জারি না করলে কোনো সমস্যাই হয় না।

রাত বাড়ছে। মুজিবের চোখে ঘুম নাই। মাথার ওপর একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। ওই বিছানায় মহিউদ্দিন শুয়ে আছেন। দুজন সেপাই পাহারা দিচ্ছেন। আরেকজন সেপাই এলেন। মুজিব বললেন, 'ঢাকার আর কোনো খবর পাওয়া গেল?'

অনেক ছাত্র মারা গেছে। বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছে। সেপাই ভদ্রলোক জানালেন।

মুজিবের চোখের ঘুম একেবারেই হারাম হয়ে গেল।

পরের দিন সকাল থেকেই স্লোগানের শব্দ আসছে। শোনা গেল, ফরিদপুর শহর পরিণত হয়েছে মিছিলের শহরে। কয়েকজন ছাত্রছাত্রী এক জায়গায় একত্র হলেই স্লোগান ধরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর স্লোগান দিচ্ছে। এই হাসপাতালটা বড় রাস্তার মোড়েই। রাস্তায় যে অনেক লোক জমে গেছে, বিক্ষোভ করছে, সব শোনা যাচ্ছে। হর্ন লাগিয়ে বক্তৃতা করছে কেউ একজন। মুজিব বিছানায় শুয়ে সব শুনতে পেলেন। দোতলায় গেলে দেখাও যাবে। কিন্তু শরীরে একটু বল নাই। দোতলায় উঠতে পারবেন না।

মুজিব বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে, তখন বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবেই।' তবে তাঁর শরীরের যে অবস্থা, তাতে তিনি দেখে যেতে পারবেন কি না, ঘোরতর সন্দেহ।

এক দিন পরের খবরের কাগজে জানা যেতে লাগল ঘটনার কিছু কিছু। দুদিন পর জানা গেল আরেকটু বিস্তৃত। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শেখ মুজিবের নাড়ি ধরে আছেন সিভিল সার্জন সাহেব। তিনি দিনের মধ্যে পাঁচ-ছয়বার করে আসছেন। তাঁর চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কারণ, মুজিবের নাড়ির গতি ধীর হয়ে আসছে। যেকোনো সময় যেকোনো কিছু ঘটে যেতে পারে। মুজিব দেখলেন, তাঁর হাত ধরা অবস্থাতেই সিভিল সার্জন সাহেবের মুখটা অন্ধকারে ছেয়ে গেল। তিনি হাত ছেড়ে দিলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মুজিব বুঝতে পারলেন, তার সময় ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবীকে বিদায় বলতে হবে। মরতে তিনি ভয় পান না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মরার মধ্যে একটা সার্থকতা আছে।

আবার জুতার শব্দ। সিভিল সার্জন সাহেব ফিরে আসছেন। তিনি আবারও মুজিবের পাশে বসলেন। মুজিবের হাত ধরে বললেন, 'এভাবে মৃত্যুবরণ করে কোনো লাভ হবে? বাংলাদেশ আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করে।'

মুজিবের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তিনি অনেক কষ্টে মুখ খুলে আস্তে আস্তে বললেন, 'অনেক লোক আছে, কাজ পড়ে থাকবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবাসি, তাদের জন্য জীবন দিতে পারলাম, এটাই শান্তি।'

একসময় ডেপুটি জেলার সাহেবও পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, 'কাউকে খবর দিতে হবে? আপনার ছেলেমেয়ে, স্ত্রী কোথায়? আপনার আব্বার কাছে টেলিফোন করবেন কি?'

মুজিব অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'দরকার নাই। জীবনে অনেক কষ্ট তাঁদের দিয়েছি। আর কষ্ট দিতে চাই না।'

আর কোনো আশা নাই। মুজিবের হাত-পা সব ঠান্ডা আর অবশ হয়ে আসছে। একজন কয়েদি সরষের তেল গরম করে শেখ মুজিবের হাত-পায়ে মালিশ করে দিতে লাগলেন।

মুজিব তাকালেন মহিউদ্দিন আহমদের বিছানার দিকে। তাঁর অবস্থাও ভালো নয়। প্লুরিসিস রোগ তাঁকে আক্রমণ করেছে। বুকে প্রচণ্ড ব্যথার কথা তিনি বলেন। তাঁর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বারবার কাশি দেন। ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছেন তিনি।

একজন কর্মচারী এসে দাঁড়িয়েছেন মুজিবের বিছানার পাশে। মুজিব তাঁকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। তারপর চারটা কাগজের টুকরায় লেখা চিঠি চারটা বালিশের নিচ থেকে বের করার চেষ্টা করলেন। কর্মচারী তাঁকে সাহায্য করলেন। তিনি চিঠিগুলো লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি তো আর বাঁচব না। ফরিদপুরেই আমার বোনের বাসা আছে। আমার মৃত্যুর পর চিঠি চারটা সেখানে পৌঁছে দিলেই চলবে। পারবা না?'

'জি, পারব।' কর্মচারীটি বললেন।

'দেখো, তুমি কিন্তু কথা দিতেছ। মৃত্যুপথযাত্রীকে দেওয়া কথা কিন্তু রাখতে হয়। ওয়াদা করে বলো, কথা রাখবে।'

কর্মচারীটি ওয়াদা করলেন।

শেখ মুজিবের চোখের সামনে তাঁর আব্বার মুখ। তাঁর মায়ের মুখ। ভাইবোনের মুখ। তারপর তাঁর মনের পর্দায় স্থির হয় রেনুর মুখ। রেনুর তো বয়স বেশি নয়। পুরো জীবনটাই তাঁর পড়ে আছে সামনে। দুটো ছোট্ট বাচ্চা তাঁর কোলে। বাচ্চা দুটোকে নিয়ে সে কোথায় দাঁড়াবে? খাওয়া-পরার চিন্তা হয়তো করতে হবে না। আব্বা আছেন। মা আছেন। ভাইবোনেরা আছে। নাসের হয়তো তাঁর ভাবিকে, ভাস্তে-ভাস্তিকে ঠিকমতোই দেখাশোনা করবে। হাসিনাকে, কামালকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। হাসিনা কত বড় হয়েছে? সাড়ে চার? কামাল? হাসিনা তো অনেক কথা বলে। কামালও আধো আধো কথা বলতে পারে...এদের সবাইকে ছেড়ে অসময়ে চলে যেতে হচ্ছে। যুগে যুগে মানুষ মানুষের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। এভাবেই অন্যায়ের প্রতিবাদ সংঘটিত হতে পেরেছে। মৃত্যুভয়ের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে কিসের দেশপ্রেম! আত্মদান করতে প্রস্তুত থাকতে না পারলে কিসের রাজনীতি! মানুষ যখন মরতে শেখে, তখনই তাকে আর দাবায়া রাখা যায় না!

মহিউদ্দিনের হাত ধরে শুয়ে আছেন মুজিব। পাশাপাশি খাট। হাত বাড়ালে হাত ধরা যায়। মুজিবের বুকে খুব ব্যথা। মহিউদ্দিনেরও নিশ্চয়ই। মাগরেবের আজান হয়ে গেছে অনেক আগে। একটা ছোট্ট টেবিলে রাখা হারিকেন জ্বলছে। টেবিলে লেবুর কাটা টুকরো, গেলাস, লবণ। এই কেবল তাদের খাদ্য। এখন জোর করে নাকের নল দিয়ে খাওয়ানোর চেষ্টাও কমে এসেছে। কারণ নাকের ভেতরে ঘা। নল ঢোকাতে গেলেই রক্ত উঠে আসে।

মৃত্যু যখন আসন্ন, তখন তাকে সুন্দরভাবে বরণ করে নেওয়াই সংগত। দুজন কয়েদি বসে আছে এই ঘরের দরজায়। মুজিব তাঁদের ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। ওরা মুজিবের খুবই অনুগত। ছুটে এল। মুজিবের মুখের কাছে কান আনল। বলেন।

মুজিব বললেন, 'পানি আনো। অজু করিয়ে দাও।'

দুজন কয়েদি মিলে প্রথমে মুজিবকে আর পরে মহিউদ্দিনকে অজু করালেন। ওরা দুজন শুয়েই শুয়েই অজু করলেন। ওঠার শক্তি দুজনের কারোরই নেই।

অজু করার পর তিনি দোয়াদরুদ পড়তে লাগলেন। সুরা ফাতিহা, সুরা এখলাস তিনবার, দরুদ শরিফ। মুজিব চিত হয়ে শুয়েই দুই হাত একত্র করে

মুখের সামনে মোনাজাতের ভঙ্গিতে ধরলেন। তারপর প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ, গাফুরুর রাহিম। তুমি মাফ করে দাও। পৃথিবীর সব মানুষকে ভালো রাখো। আমার বাংলার প্রতিটি মানুষকে ভালো রাখো। তাদের মঙ্গল করো। আব্বাকে ভালো রাখো, মাকে ভালো রাখো। ভাইবোনদের ভালো রাখো। রেনুকে ভালো রাখো। আমার ছোট্ট সোনামণি হাসিনাকে ভালো রাখো। কামালকে ভালো রাখো। আমার না থাকার বিনিময়ে আমার দেশের সব মানুষকে ভালো রাখো।'

তিনি চোখ বন্ধ করে আপনমনে দোয়া করে চলেছেন। কখন যে ডেপুটি জেলার তাঁর পাশে এসে বসেছেন, তিনি টেরও পাননি। তিনি তাঁর কপালে হাত রেখে বললেন, 'আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, খাবেন তো!'

মুজিব চোখ মেললেন। দেখলেন, তাঁর পাশে ডেপুটি জেলার, ভদ্রলোক আবারও বললেন, 'আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, আপনি খাবেন তো!'

শেখ মুজিব অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'মুক্তি দিলে খাব। না দিলে খাব না। তবে মুক্তি নিয়ে আমি আর চিন্তিত না। আমার লাশ ঠিকই মুক্তি পেয়ে যাবে।'

ডাক্তার সাহেব এসে গেছেন, সঙ্গে আরও কয়েকজন কর্মচারী, মুজিব একটু চোখ সরিয়ে দেখতে পেলেন।

ডেপুটি জেলার বললেন, 'আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে। ঢাকা থেকে এসেছে রেডিওগ্রামে। আবার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও একটা অর্ডার পাঠিয়েছেন। দুটো অর্ডারই পেয়ে গেছি।'

ডেপুটি জেলার অর্ডার পড়ে শোনালেন।

মুজিব বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা আমাকে খাওয়ানোর জন্য এসব বানিয়ে বলছেন।'

মহিউদ্দিন বললেন, 'আমাকে দেন তো অর্ডারগুলা। আমি পড়ে দেখি।'

শয্যাশায়ী মহিউদ্দিনের কাছে কাগজগুলো নেওয়া হলো। তিনি পড়লেন। দেখলেন, ঠিকই অর্ডার এসেছে। বললেন, 'তোমার অর্ডার সত্যি এসেছে, মুজিব।'

তিনি হাত বাড়িয়ে মুজিবের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ডেপুটি জেলার বললেন, 'আমাকে অবিশ্বাস করার কিছু নাই। কারণ, আমার কোনো স্বার্থ নাই। আপনার মুক্তির অর্ডার সত্যি এসেছে।'

কাটা ডাব চলে এল। গেলাসে ডাবের পানি ঢালা হলো।

মহিউদ্দিন বললেন, 'মুজিব, আমি তোমার মুখে পানি দেব। আমিই তোমার অনশন ভঙ্গ করাব।'

মহিউদ্দিনকে ধরে বিছানায় বসানো হলো। চামচে ডাবের পানি ঢেলে তাঁর হাতে দেওয়া হলে তিনি তা মুজিবের মুখে ধরলেন। মুজিবের অনশন ভঙ্গ হলো।

মুজিবের মুক্তির আদেশ এসে গেছে। কিন্তু জেলে যাওয়ার শক্তি তো মুজিবের নেই। সিভিল সার্জন সাহেবও বললেন, 'এইভাবে আপনাকে ছাড়া যাবে না। রাতটা থাকুন। আপনার শরীরটা একটু ভালো হোক। তারপর কালকে দেখা যাবে।'

মুজিবকে ডাবের পানিই খাওয়ানো হতে লাগল। অন্য কিছু মুখে নেওয়ার মতো শক্তি তাঁর নেই।

মুজিব চিন্তিত হয়ে পড়লেন মহিউদ্দিনের জন্য। তাঁর মুক্তির আদেশ এসে গেছে, কিন্তু মহিউদ্দিনেরটা যে এল না? মহিউদ্দিনের অবস্থাও তো খুবই খারাপ। তাঁকে কেন ছাড়বে না? মুজিব না হয় মুসলিম লীগ সরকারের দুশমন হয়ে পড়েছেন, মহিউদ্দিন তো কারাগারে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম লীগারই ছিলেন। দুশ্চিন্তার কথা হলো, রাজনীতিতে নিজের দলের লোক যখন পর হয়ে যায়, তখন অন্য দলের লোকের চেয়েও সে-ই হয়ে ওঠে বড় শত্রু।

এসব নানা ভাবনায় রাত কেটে গেল।

পরের দিন মুজিবকে নরম ভাত খেতে দেওয়া হলো। খুব একটা যে খেতে পারলেন, তা নয়। তবু শরীরে খানিকটা বল ফিরে আসছে। সকাল ১০টার দিকে খবর পেলেন, তাঁর আব্বা এসেছেন জেলগেটে। মুজিবের তখন বাইরে যাওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা নয়। কাজেই লুৎফর রহমান সাহেব নিজেই এলেন জেলখানার এই হাসপাতালে।

মাথায় টুপি, শ্মশ্রুমণ্ডিত লুৎফর রহমান ছেলের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন। কী চেহারা হয়েছে ছেলের! এমন শুকিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে, দু-টুকরা কাপড় পরে আছে বিছানায়। তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছে। তাঁর সহ্যশক্তি অসাধারণ বলেই সবাই জানে। তিনি নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু চোখের পানি বাঁধ মানছে না। তিনি চোখ মুছে নিলেন। ছেলের পাশে বসে তাঁর কপালে হাত রাখলেন।

মুজিব বললেন, 'আব্বা।'

লুৎফর রহমান সাহেব বললেন, 'বাবা, তোমার মুক্তির আদেশ হয়েছে। তোমাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। তুমি অনশন ধর্মঘট করবে, এই খবর পাওয়ার পর আমরা ঢাকা গিয়েছিলাম। তোমার মা, রেনু, হাসিনা, কামাল...ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। জেলে গিয়ে শুনলাম, তুমি ঢাকায় নাই। কোথায় আছ, কেউ বলে না। দুই দিন বসে রইলাম। তারপর জানতে

পারলাম, তুমি ফরিদপুর। তখন আর ফরিদপুর আসার উপায় নেই। হরতালের কারণে রাস্তাঘাট সব বন্ধ। নারায়ণগঞ্জ এসে জাহাজ ধরব, তা-ও পারছিলাম না। তোমার মা, রেনু ও বাচ্চাদের সবাইকে ঢাকায় রেখে আমি চলে এসেছি। কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তোমাকে আদৌ ফরিদপুর নিয়েছে নাকি অন্য কোথাও নিয়েছে। আজই ঢাকায় টেলিগ্রাম করে দেব, ওরা টুঙ্গিপাড়া চলে আসুক। আমি তোমাকে নিয়ে আগামীকাল বা পরশু রওনা করব ইনশাল্লাহ। সিভিল সার্জন সাহেব তোমাকে ছাড়তে চান না। আমি জোর করায় বললেন, তাহলে লিখে দিতে হবে আমি নিজ দায়িত্বে তোমাকে নিচ্ছি।'

মুজিব বললেন, 'আব্বা, আমি তো মুক্তি পেলাম। কিন্তু মহিউদ্দিনের কী হবে? ওকে না ছাড়লে তো ও অনশন ভঙ্গ করবে না। ও তো এখানেই মারা যাবে।'

লুৎফর রহমান বললেন, 'খবর পেয়েছি মহিউদ্দিনকেও মুক্তি দেওয়া হবে। তবে তোমার সঙ্গে ছাড়বে না। এক দিন পর ছাড়বে।'

মুজিব হাত বাড়িয়ে তাঁর আব্বার হাতটা ধরলেন। লুৎফর রহমান সাহেব বললেন, 'আর দুশ্চিন্তা কোরো না। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তুমিও সুস্থ হয়ে উঠবে মহিউদ্দিনও ছাড়া পাবে। মানুষের দোয়া তোমার জন্য আছে। ইনশাল্লাহ কোনো ক্ষতি হবে না তোমার।'

মুজিবকে স্ট্রেচারে তোলা হলো। কারাগারের বাইরে নেওয়া হবে। মুজিব মহিউদ্দিনের খাটের কাছে চলে এলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'মহিউদ্দিন, আজকে তোকে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে এ জন্য তুই আমার কোনো অপরাধ নিস না। আমি সব সময়ই তোর পাশে আছি। বাইরে গিয়ে তোকে ভুলে যাব না। তোর মুক্তির জন্য অবশ্যই আমি সংগ্রাম করব।'

মুজিব বেরিয়ে এলেন।

কারাগারের বাইরে তখন জনতার ভিড়। সেখান থেকে ফরিদপুরের বোনের বাড়ি। পরদিন ট্যাক্সিতে ভাঙ্গা। ভাঙ্গা থেকে মুজিবের বড় বোনের বাড়ি দত্তপাড়া। সেখানে এক দিন এক রাত থেকে নৌকায় গোপালগঞ্জ। মুজিব এখনো শয্যাশায়ী। কিন্তু যেখানে যে ঘাটে যাচ্ছেন, জনতা ভিড় করে ঘিরে ধরছে তাঁকে। সিন্ধিয়াঘাটে কর্মীরা যখনই শুনল, নৌকা যাচ্ছে গোপালগঞ্জ, তারা জাহাজে উঠে পড়ল গোপালগঞ্জ যাবে বলে। গোপালগঞ্জ যখন পৌঁছালেন তখন নদীর পাড়ে মানুষ আর মানুষ। তাঁকে তারা নামাবেই। লুৎফর রহমান প্রমাদ গুনলেন, 'তোমরা ওকে মেরে ফেলতে চাও নাকি?'

জনতা কিছুই শুনল না। তারা মুজিবকে কোলে করে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে মিছিল করতে লাগল।

৫.

এইভাবে পাঁচ দিন পর তারা এসে পৌঁছেছেন টুঙ্গিপাড়ার ঘাটে।

এখন তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ঘরের দিকে। আঙিনার কাছাকাছি হতেই লোকজন এসে তাঁকে ঘিরে ধরল।

তাঁকে ধরে বাড়ির ভেতরে নেওয়া হলো। সাড়ে চার বছরের হাসিনা তাঁর গলা ধরে ঝুলে পড়ল। প্রথম যে কথাটা সে বলল, তা হলো, 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।'

মুজিব একটুও বিস্মিত হলেন না। কারণ একুশে ফেব্রুয়ারিতে হাসুরা ঢাকায় ছিল। ফরিদপুরের রাস্তায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে যত মিছিল-শোভাযাত্রা হয়েছে, কারাগারের ভেতরে শুয়েই তিনি এই স্লোগান বহুবার শুনেছেন। ঢাকায় হাসিনার কানে সে এই স্লোগান যে বারবার প্রবেশ করেছে, তাতে আর সন্দেহ কী! বাচ্চারা যা শোনে, তা শিখে ফেলে দ্রুত। কামাল কিন্তু শেখ মুজিবের কাছে গেল না। দূর থেকে পিতার দিকে চেয়ে রইল। ওরা মাত্র আগের দিনই ঢাকা থেকে এসেছে। মুজিবের মা এলেন মুজিবের কাছে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। তারপর একে একে সবাই চলে গেল ঘর থেকে।

ঘরে শুধু রেনু। তিনি কাঁদতে লাগলেন। 'তোমার চিঠি এল। তুমি লিখেছ, অনশন করবা। বিদায়-আদায় নিয়েছ। তাতেই আমার মনে হলো, তুমি একটা কিছু করে ফেলবা। আমি তোমাকে দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কাকে বলব নিয়ে যেতে। আব্বাকে বলতে পারি না লজ্জায়। নাসের ভাই বাড়ি নাই। যখন খবর পেলাম, খবরের কাগজে লিখল তুমি অনশন শুরু করে দিয়েছ, তখন লজ্জাশরম ভুলে গিয়ে আব্বাকে বললাম। আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সোজা রওনা হয়ে গেলাম ঢাকার উদ্দেশে। আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে। কেন তুমি অনশন করতে গেছলা? এদের কি দয়ামায়া কিছু আছে? আমাদের কারও কথাও তোমাদের মনে ছিল না? কিছু একটা হলে কী

হতো? আমি এই দুইটা দুধের বাচ্চা নিয়ে কীভাবে বাঁচতাম? হাসিনা-কামালের কী অবস্থা হতো? তুমি বলবা, খাওয়া-পরার তো কোনো অসুবিধা হতো না। মানুষ কি শুধু খাওয়া-পরা নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? আর মরে গেলে দেশের কাজই বা কী করে করতা?'

বাইরে ঝিঁঝির ডাক। দূরে হোগলা বনে শেয়াল ডাকছে। তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকছে কুকুর। লণ্ঠনের আলো পড়েছে বিছানায় শায়িত ও ঘুমন্ত দুই শিশু হাসিনা আর কামালের মুখে। হারিকেনের আলোয় রেনুর চোখের অশ্রু দুটো আলোর ফোঁটার মতো লাগছে।

শেখ মুজিব কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, 'উপায় ছিল না, রেনু।'

রেনু এমনিতে খুব চাপা স্বভাবের। আজকে তিনি কথা বলছেন। যেন তার মনের রুদ্ধ কবাট আজ খুলে গেছে। বলছে, বলুক। মনের ভার তাতে কিছুটা কমবে।

আজ সাতাশ-আটাশ মাস পর এই ঘরে তিনি শুয়েছেন। সেই পরিচিত বাড়ি, পুরোনো কামরা, পুরোনো বিছানা। কারাগারের কথা মনে পড়ছে। মুজিব বাইরে এলেন, আর তাঁর সহকর্মীরা প্রায় সবাই এখন জেলে। শুধু তাজউদ্দীন বোধ হয় গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন।

কুহু কুহু একটা কোকিল ডেকে উঠল। রাতের বেলা কোকিলের ডাক।

মুজিব ধীরে ধীরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়লেন।

৬.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমের ডালে বসে ব্যাঙ্গমা মুখ খুলল, 'ওদিকে শেখ মুজিব কী কী করলেন, খেয়াল করলা?'

'কী কী?' ব্যাঙ্গমি মাথা উঁচু করে শুধায়।

'তিনটা জিনিস তিনি করলেন। খেয়াল করো'—ব্যাঙ্গমা বলল।

'তিনটা জিনিস, কী কী?' ব্যাঙ্গমি জানতে চায়।

ব্যাঙ্গমা পায়ের আঙুলে গুনতে গুনতে বলল, 'এক : শেখ মুজিব ফরিদপুর জেলে অনশন করার সময় কইলেন, মানুষ যখন মরতে শেখে, তখনই তাকে

আর দাবায়া রাখা যায় না! এই কথাটা তিনি আরেকবার বলবেন আজ থাইকা ১৯ বছর পর... দুই : আর এই যে মরণরে ভয় না পাওয়া, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়া নিজের মরণরে তুচ্ছ ভাবা, এইটাই কিন্তু ওনারে শেখ মুজিব থাইকা বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থাইকা জাতির জনক কইরা তুলব। মুজিব বারবার মৃত্যুর মুখে পড়বেন, কিন্তু মরণের ভয়ডরের উর্ধ্বে উঠবেন, এইটাই তাঁরে আগায়া নিতে থাকব...'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'দুইটা হইল। আর তিন নম্বরটা?'

'আর তিনটা নম্বরটা হইল'—ব্যাঙ্গমা বলল, 'তুমি খেয়াল করো, মুজিবররে যখন ঢাকা জেলখানা থাইকা হঠাৎ কইরা ফরিদপুরে নিতাছে, তখন কিন্তু সরকার খুব গোপনে কাজটা করছে। তাঁর আব্বা শেখ লুৎফর রহমান সাহেব ঢাকা জেলখানার গেটে গিয়া দুই দিন বইসা থাইকাও খবর পাইতেছিলেন না, মুজিবররে কই নিছে। কিন্তু মুজিব ঠিকই তাঁর লোকজনরে খবরটা পৌছাইতে পারলেন যে, তাঁরে ফরিদপুরে লওয়া হইতেছে আর উনি অনশন করতে যাইতেছেন।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'হ, খেয়াল করলাম। উনি ইচ্ছা কইরা ঢাকা জেলে বই মেইলা, কাপড় মেইলা দেরি কইরা নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ফেইল করাইলেন, থানায় গিয়া একজন পরিচিত লোক পাইয়া পার্টির লোকদের খবর দিলেন...সকলে জাইনা গেল তিনি ফরিদপুর যাইতেছেন আর অনশন করতেছেন...কিন্তু এই ঘটনার গুরুত্ব কী?'

'এই ঘটনার গুরুত্ব হইল, তিনি এইভাবে পার্টির কর্মীর কাছে কৌশলে খবর পাঠানোর কায়দাটাই আজ থাইকা ১৯ বছর পর ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাইতে প্রয়োগ করবেন।'

'মানে?'

'ওই রাইতে যখন পাকিস্তানি মিলিটারি ট্যাংক কামান নিয়া আক্রমণ করল, তখন তিনি তাঁর অর্ডারটা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামে পৌছাইতে পারছিলেন।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'হ হ, তা-ই হইব। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ভাষণে মুজিব সেই কথাটা আবার স্মরণ করবেন।' 'তারা অতর্কিতে ২৫ মার্চ তারিখে আক্রমণ করল। তখন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আমি ওয়্যারলেসে চট্টগ্রাম জানালাম বাংলাদেশ আজ থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই খবর প্রত্যেককে পৌছিয়ে দেওয়া হোক, যাতে প্রতিটি থানায়, মহকুমায়, জেলায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে পারে।'

৭.

হঠাৎ তাজউদ্দীন তাকিয়ে দেখলেন, ট্রেনের কামরায় কয়েকজন পুলিশ।

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ট্রেনে উঠেছেন তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি যাবেন শ্রীপুর। কয়লার ইঞ্জিন ধুকধুক করে ধোঁয়া ছাড়ছে। স্টেশনের আকাশ সেই ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে। পুঁ করে ট্রেনের বাঁশি বেজে উঠল।

তাজউদ্দীন আহমদ একটা কাঠের বেঞ্চে বসে আছেন। ফাল্গুন মাস। মনোরম আবহাওয়া। শীত কমে এসেছে। দখিনা বাতাসও বইতে শুরু করেছে। আকাশ পরিষ্কার। মাজা কাঁসার বাসনের মতো ঝকঝক করছে রোদ। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দুপুরবেলার উজ্জ্বল রোদ পড়ে আছে পাশের রেললাইনের ওপর।

তাজউদ্দীন আহমদের মনটা নানা কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আছে। নানা ধরনের চিন্তা, গত কয়েক দিনে দ্রুত ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার স্মৃতি তাঁর মনটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি, বাইশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্র-জনতার মিছিল, গুলি, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, শহীদ হলো কতজন, আহত হয়ে কাতরাচ্ছে কতজন, কতজনকে যে গ্রেপ্তার করা হলো, তবু রাজপথ দখল করে রাখল মানুষেরা। ধর্মঘট হলো সারা দেশে। ট্রেন বন্ধ, গাড়িঘোড়া সব বন্ধ। সেন্ট্রাল কমিটি অব অ্যাকশন আর সিভিল লিবার্টিজ কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সভা হলো মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে। তিনি যোগ দিলেন সেসব সভায়। এক সভায় সারা দেশে দুই দিন হরতাল আহ্বান করার সিদ্ধান্ত হলো। হরতাল পালিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। বাস চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। নবাবপুর ও ইসলামপুরের অবাঙালিরা ছাড়া বাকি সবাই দোকানপাট বন্ধ রেখেছিল। মিছিল করার কোনো কর্মসূচি ছিল না। তাজউদ্দীন আহমদ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছিলেন, ১৪৪ ধারা ভেঙে পড়ল, যেন তাসের ঘর। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় মিছিল করছে। প্রায় ১০ হাজার লোকের মিছিল রাস্তা প্রদক্ষিণ করছে। রাস্তায় মিলিটারি নামানো হয়েছিল। তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। জনতাও শান্তিপূর্ণ। তারা ভাঙচুর-জ্বালাও-পোড়াও করছে না। শুধু গভর্নর নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে। পুরো রাজপথ এখন সম্পূর্ণ

জনতার নিয়ন্ত্রণে। রাতে ছিল কারফিউ। চলছে গ্রেপ্তার অভিযান আবুল হাশিম, একুশে ফেব্রুয়ারিতে যিনি তাঁর এমএলএ পদ ত্যাগ করেছেন, সেই আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ আর মনোরঞ্জন ধর প্রমুখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর পুলিশ হামলা করল ফজলুল হক হলে। ভোরবেলা। মাইক কেড়ে নিল। জগন্নাথ কলেজ ছাত্রাবাসেও ঢুকে পড়ল পুলিশ। তারা এসএম হলে ঢুকে পড়ল মাইক কেড়ে নিতে। প্রভোস্ট বাধা দিলেন। বিকেলে এই হল থেকে হাউসটিউটর-সমেত ২৩ জন ছাত্রকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হলো, শহীদ শফিউরের পিতা এবং আবুল কালাম শামসুদ্দীন সেটার উদ্বোধনও করলেন। রাতে পুলিশ এসে সেই স্তম্ভে হামলা চালাল। তারা একটা একটা করে ইট খুলে ফেলল। শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ দিল ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে।

সরকার এই আন্দোলনকে হিন্দুস্তানের চক্রান্ত বলছে, এটাকে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে। সরকারের মতে, এটা ভারতের অনুচর আর কমিউনিস্টদের কাজ। তার বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি লিখেছেন তাজউদ্দীন। আতাউর রহমান খান বলেছেন আর তিনি লিখে নিয়েছেন। সেই বিবৃতি সংবাদপত্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এসএম হলে সভা হলো। সেখানেও হাজির তিনি। প্রস্তাব তুললেন, সরকারের অপপ্রচারের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। তাজউদ্দীনের সেই প্রস্তাব সভায় গৃহীত পর্যন্ত হলো। এদিকে মন্ত্রী আফজাল সাহেব একটা আপস ফর্মুলা পাঠিয়েছেন। তাজউদ্দীন কামরুদ্দীন আহমদসহ নেতাদের সঙ্গে সেই ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এক দুপুরে মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে পুলিশ তল্লাশি চালাল। তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটা কক্ষ সার্চ করা হলো।

এখন আপাতত হরতাল কর্মসূচি নেই। যে শ্রমজীবী মানুষ হরতালে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা বলাবলি করছেন, হরতাল স্থগিত করায় তাঁদের একটু সুবিধাই হয়েছে। তাঁদের খুব কষ্ট হচ্ছিল।

ট্রেনের কামরায় জানালার ধারে বসে আছেন তাজউদ্দীন। দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি তাঁর মনের মধ্যে চলচ্চিত্রের মতো একটার পর একটা ছবি হয়ে দেখা দিচ্ছে, আবার মিলিয়েও যাচ্ছে। ফেরিওয়ালার 'ডিম ডিম' 'রুটি রুটি' 'কলা কলা' চিৎকার তাঁর কানেই যাচ্ছে না।

হঠাৎ তাজউদ্দীন তাকিয়ে দেখলেন, ট্রেনের কামরায় কয়েকজন পুলিশ। তাদের পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে খাকি শার্ট। তাদের মধ্যে একজন হাবিলদার। খুব ধরপাকড় হচ্ছে চারদিকে। ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শিক্ষকদেরও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগের তো প্রায় সবাই

হয় কারাগারে, নয়তো মাথায় হুলিয়া নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি-বাইশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে দমন করার জন্য সরকার মরিয়া। তারা নানা রকমের দমন-পীড়ন অভিযান চালাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি চালাচ্ছে অবশ্য মুখ। বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন পূর্ব বাংলার মানুষ করেনি, করেছে হিন্দুস্তান থেকে আসা হিন্দুরা, কলকাতা থেকে হিন্দু ছাত্ররা দলে দলে এসেছে, ধুতি খুলে তারা লুঙ্গি পরেছে, তারপর তারা যোগ দিয়েছে ভাষাসংগ্রামে, আর পুরো ব্যাপারটার পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছে কমিউনিস্টরা—এই হলো মুসলিম লীগ সরকারের নেতাদের কথা এসব কথা শুনলে কার না মাথা গরম হয়ে যায়!

এখন চলন্ত ট্রেনের কামরায় পুলিশ দেখে তাজউদ্দীন প্রথমে কিছুটা শঙ্কিত বোধ করলেন। কাকে গ্রেপ্তার করার জন্য বেরিয়েছে এই পুলিশের দল?

তাজউদ্দীন ভাবতে লাগলেন, পুলিশ যদি তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই রওনা হয়ে থাকে, তাহলে তো গ্রেপ্তার এড়ানোর আর কোনোই উপায় নাই। কিন্তু তাদের মধ্যে সে রকম কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বাঙালি পুলিশ এরা। বাংলা ভাষার প্রতি তাদের মমত্ববোধ কারও চেয়ে কম হওয়ার কোনোই কারণ নাই। কাজেই এই পুলিশদের উদ্দেশেই তিনি কথা বলবেন বলে ঠিক করলেন। কথা বলবেন, রাষ্ট্রভাষা কেন বাংলা হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে।

ঝিকির ঝিক ঝিকির ঝিক করে ট্রেন চলছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুই পাশের ভবন, নোংরা বস্তি, গাছপালা, খালবিল। সব পিছিয়ে পড়ছে। আজকের দিনটায় এত আনন্দ যে শত্রুকেও বন্ধু বলে আলিঙ্গন করা যায়।

তাজউদ্দীনের সঙ্গে উঠেছেন তাঁর এক পরিচিত যুবক, পাবুরের নেওয়াজ আলী। তিনি যাবেন রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত। ট্রেনেই সাধারণত তাঁর সঙ্গে দেখা হয়।

যেন তিনি নেওয়াজ আলীকে বোঝাচ্ছেন, এইভাবে কথা বলা শুরু করলেন। বললেন, 'বলেন তো নেওয়াজ আলী, পাকিস্তানের কতজন লোক উর্দু বলে, কতজন লোক বাংলা বলে?'

'বেশির ভাগ লোকই বাংলা বলে।'

'তাহলে আমরা তো দাবি করতে পারতাম, বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা হোক। আর পশ্চিম পাকিস্তানের স্কুলগুলোতে বাংলা শেখানোর ক্লাস শুরু করা হোক। আমরা কি সেই দাবি করেছি?'

'না, আমরা করিনি।'

'আচ্ছা, তিন দিন আগে ঢাকার রাস্তায় হাজার হাজার লোক মিছিল করেছে না? ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হয়েছে না?'

'জি, হয়েছে।'

'রাস্তায় মিলিটারিও তো ছিল। ছিল না?'

'ছিল।'

'গুলি হয়েছে?'

'না, হয়নি।'

'রাস্তায় কেউ কোনো গাড়ি ভেঙেছে, কেউ পুলিশ বা আর্মির ওপরে ঢিল ছুড়েছে?'

'না, ছোড়েনি।'

'তাহলে একুশে ফেব্রুয়ারি ছেলেরা মিছিল করবে, এটাতে বাধা দেওয়া হলো কেন? গুলি করা হলো কেন?'

'বুঝতেছি না তাজউদ্দীন ভাই।'

'আর সরকার যে বলছে, সব হিন্দু পায়জামা পরে কলকাতা থেকে এসে আন্দোলন করছে, সেটা কি সত্য? আপনি কি কলকাতার? আমি কি কলকাতার? যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁরা সবাই মুসলমান কি না!'

'জি, মুসলমান।'

'তাহলে?'

তাজউদ্দীন আহমদের কথায় যেন পুলিশের হাবিলদারের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। তিনি উঠে এই দিকেই আসছেন। সবাই স্তব্ধ। কী হয় না হয়।

ট্রেন টঙ্গী স্টেশনে থেমেছে।

হাবিলদার জানালা দিয়ে খেজুরের রস কিনলেন এক হাঁড়ি। গেলাসে ঢেলে প্রথমেই এলেন তাজউদ্দীনের কাছে। বললেন, 'ভাই, এক গেলাস খেজুরের রস খান। আপনি খেলে খুব খুশি হব।'

তাজউদ্দীন খেজুরের রসের গেলাস হাতে নিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আমরা দুজনে মিলে খাচ্ছি।'

হাবিলদার বললেন, 'আপনি খান। ওনাকেও দেব।'

তাজউদ্দীন বুঝলেন, পুলিশের হাবিলদারও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। এতক্ষণ তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন, সেসব এই হাবিলদারের মনে ধরেছে। তারই পুরস্কার এই খেজুরের রস।

তাজউদ্দীন খেজুরের রসে চুমুক দিতে লাগলেন। দুপুরবেলার রস গেঁজে যাওয়ার কথা। কিন্তু মাটির কলসিতে থাকায় রসটা ভালোই আছে বলতে হবে। ট্রেন চলতে শুরু করলে একটুখানি রস ছলকে পড়ল তাজউদ্দীনের হাঁটুতে।

ট্রেন রাজেন্দ্রপুর পৌঁছালে হাবিলদার ও তার পুলিশ দল নেমে গেল। যাওয়ার আগে হাবিলদার তাজউদ্দীনের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

তাজউদ্দীন বললেন, 'বুঝলেন নেওয়াজ, নুরুল আমিন সরকার কত বড় ভুল করছে। তাঁর কর্মচারীরাই তো বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। আর উনি কোন বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন!'

৮.

মমতাজ তাকিয়ে রইলেন ভিজিটরস রুমের দেয়ালের দিকে। দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে অদ্ভুত সব দাগ পড়েছে। সেই দাগের মধ্যে তিনি কল্পনা করতে পারলেন একটা নারীমুখ। সেই নারীমুখের আরেকটু ওপরে একটা মাকড়সা নিজের বানানো সরু সুতা বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

মন্নাফ সাহেব বললেন, 'এটাই কি তোমার শেষ কথা?'

মমতাজ বললেন, 'শেষ কথা কেন হবে, আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলি। খুকু কেমন আছে। ও কি তিনের ঘরের নামতা শিখেছে?'

মন্নাফ বললেন, 'কথা ঘুরিয়ো না। তুমি বন্ড সই দেবে না?'

মমতাজ বললেন, 'বন্ড সই দিয়ে কেন আমাকে মুক্তি পেতে হবে? রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, এই কথা কি ভুল? যদি ভুল না হয়, তাহলে আমি বারবার বলব। এখন ওরা যদি আমাকে বলে, বন্ড দাও, লেখো, তুমি আর কোনো দিন রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বলবে না, এটা আমি কী করে দেব। সেটা তো মিথ্যা বলা হবে।'

মন্নাফ বললেন, 'তুমি একটা বেয়াদব মহিলা। আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার কথা শুনছ না। তোমার একটা পাঁচ বছরের মেয়ে আছে। তার জন্যও তোমার কোনো মায়া হচ্ছে না। আমি তো সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। তার ওপরে আমি সরকারি চাকরি করি। তোমার জন্য আমার চাকরিটাও চলে যাচ্ছে। এখন তুমি বন্ড সই দিলে আমি বলতে পারি, ও বন্ড দিয়েছে, আর কোনো দিন অ্যান্টি স্টেট অ্যাকটিভিটিজ করবে না। তাহলে তোমারও চাকরি থাকে, আমারও চাকরি থাকে। তা না হলে তোমারও চাকরি যায়, আমারও চাকরি যায়।'

মমতাজ বললেন, 'তুমি শুধু চাকরি-চাকরি করছ কেন?'

মন্নাফের কপালে ভাঁজ। চোখে-মুখে রাগ-দুঃখ-হতাশা। ভদ্রলোক দেখতে ছোটখাটো। সাদা রঙের একটা শার্ট পরে এসেছেন, যেমন তিনি সচরাচর পরে থাকেন। তিনি হাতের আঙুল ফোটাতে ফোটাতে বললেন, 'দেখো, তোমাকে আমি লাস্ট কথা বলছি। আর কথাটা খুবই সিরিয়াস। তুমি যদি বন্ড সই না দাও, আমি তোমাকে তালাক দেব।'

মমতাজ দেয়ালের দিকে তাকালেন আবার। মাকড়সাটা অনেক ওপরে উঠে গেছে। আর একটু আগে শ্যাওলার যে দাগটাকে তার নারীমুখ বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে একটা বিড়াল। নিচের দিকে লেজা ঝুলে আছে।

তিনি দেয়াল থেকে মুখ সরিয়ে তাঁর স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর স্বামীর চোখ দুটো টিকটিকির চোখের মতো লাগছে।

এই লোকটাকে ভালোবেসে তিনি তাঁর পূর্বজনম ছেড়ে নতুন জনমে চলে এসেছেন। এখন এই লোকটাই তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইছে।

রাগ তো তাঁরও হতে পারে। তারও তো অভিমান হতে পারে। যে লোকটা তাঁকে এত সহজেই তালাক দেওয়ার কথা বলতে পারে, মমতাজেরও তো মনে হতে পারে, তাঁকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত।

একটা মুহূর্ত শুধু তিনি দম নিলেন, তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যদি আমাকে তালাক দিতে চাও, দাও, তবু আমি বন্ড সই দিয়ে মুক্তি চাই না।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মন্নাফ, 'তুমি তো তা-ই বলবে, আমি জানতাম, বাজে মহিলা কোথাকার। আমি জানতাম। ঠিক আছে, তালাকই দেব।'

আশপাশের ভিজিটর, প্রহরী, কারাকর্মী, পুলিশ—সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। আরও অনেক ভিজিটরই এসেছে তাঁদের কারাবন্দী আত্মীয়স্বজনকে দেখতে। তাঁদের সবার কথা এক মুহূর্ত থেমে গেল মন্নাফের চিৎকারে।

মমতাজ চাপা গলায় বললেন, 'গলা নামিয়ে কথা বলো।'

মন্নাফও নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বললেন, 'তুমি রেগে আছ। আমিও রেগে গেছি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ডোন্ট গিভ আ প্রমিজ হোয়েন ইউ আর ইন লাভ, অ্যান্ড ডোন্ট টেক আ ডিসিশন হোয়েন ইউ আর অ্যাংরি। আমি সোমবারে আবার আসব। ওই দিন আমি তোমার কাছে ফাইনাল কথা শুনতে চাই। মনে রেখো, তুমি যদি বন্ড সই দিয়ে মুক্তি না নাও, আমি তোমাকে তালাক দেব। আমার বাড়ির সবারই সেই মত। পাড়াপড়শির গঞ্জনা আর সইতে পারছি না।'

ততক্ষণে তাঁর 'দেখা' বা ভিজিটরস আওয়ারও শেষ হয়ে গেছে। মেট্রন তাঁর হাত ধরে বললেন, 'চলেন। টাইম শেষ।'

মমতাজ শক্ত মুখ করে ফিরে চললেন কারাগারে।

কেন্দ্রীয় কারাগার, ঢাকা। মহিলা ওয়ার্ড। পুরোনো ভবন। সূর্যের আলো কোনো দিনও এই মহিলা ওয়ার্ডে এসে ঢোকে না। অসূর্যম্পশ্যা। মেঝে স্যাঁতসেঁতে। দেয়াল নোনা ধরা। ছাদের গা থেকে চুনবালু খসে পড়ছে, যেকোনো সময় ছাদ ভেঙে নিচের বন্দী কয়েদিদের ওপরে পড়তে পারে।

দুটো কক্ষ। তারই মধ্যে গাদাগাদি করে ৪০-৫০ জন মহিলা আসামি আর মহিলাকে থাকতে হয়। জায়গা এত কম যে কেউ ঠিকমতো শুতে পায় না। রাতে এ নিয়ে ঝগড়া-কাজিয়া লেগে যায়। তখন জমাদারনি উঠে এসে কয়েক ঘা লাগিয়ে দেয় যাঁকে খুশি তাঁকে। নানা ধরনের নারী আছেন এই ওয়ার্ডে। কেউ বা বিষ দিয়ে খুন করেছেন নিকটজনকে, কেউ বা ঘোরতর মানসিক রোগী। কেউ বা ধরা পড়েছেন অবৈধভাবে সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে। কেউ বা দেহপসারিণী। একজন আছেন যক্ষ্মা রোগিণী। কেউ তাঁর সঙ্গে শুতে চায় না। পালিয়ে বিয়ে করতে গিয়ে ধরা পড়া তরুণী আছেন। লকআপের সময় এই ফিমেইল ওয়ার্ডের অবস্থা হয় নারকীয়।

এরই মধ্যে এসে পড়েন মমতাজ।

তাঁকে দেখামাত্রই কি কয়েদি, কি আসামি, কি জমাদারনি, কি মেট্রন—সবাই সমীহই করে। তাঁর কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য ফালতুদের কোনো আপত্তি নাই, বরং আগ্রহ আছে।

একে তো তিনি দেখতে অপরূপা। সুন্দরী বললে তাঁকে কম বলা হয়। ২৯ বছর বয়সের এই ভদ্রমহিলা কথায়-বার্তায়, চালচলনে যারপরনাই আকর্ষণীয়। তাঁর ওপর সবার শ্রদ্ধা, সমীহ ও ভালোবাসা তিনি একবারেই আকর্ষণ করেন, যখন সবাই শুনতে পায়, তিনি ভাষাসংগ্রামী। তাঁকে ধরা হয়েছে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।

দুপুরবেলা মহিলা ওয়ার্ডের আঙিনায় বসে আছেন মমতাজ। একজন সহবন্দিনী—তাঁর নাম আসফিয়া, যিনি কিনা বন্দী হয়েছেন তাঁর সতিনকে বিষ প্রয়োগে খুন করার দায়ে—মমতাজের মাথায় তেল বসিয়ে দিয়ে চিরুনি চালাচ্ছিলেন। মমতাজকে তিনি নিজের জীবনের গল্প বলছিলেন। 'আপা, আপনে যদি দেখতেন, আমার জামাইটা কিন্তু ছয় ফুটের মতো লম্বা। আপা, আমি তো খাটো। আমারে তাঁর পাশে মানাইত না, কী কন...'

মমতাজের কানে আসফিয়ার কোনো কথাই ঢুকছে না।

মন্নাফ—তাঁর স্বামী, যাঁকে ভালোবেসে তিনি কলকাতা শহর, তাঁর এত দিনের পালিত ধর্ম, সংস্কৃতি, পশ্চিম বাংলা, আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা, ভাইবোন,

সবকিছু ছেড়ে চলে এসেছেন পূর্ব বাংলায়—সেই মন্নাফ বলতে পারল তাঁকে তালাকের কথা?

কে যেন তাঁকে ডাকছে, 'মিনু মিনু...মা।' সকালবেলা পুজো সেরে গরদের শাড়ি পরে দোতলা থেকে মা নামছেন। তাঁর ভেজা চুল থেকে জল ঝরছে টুপটাপ। মুখে প্রসন্ন হাসি, তিনি বলছেন, 'মিনু, প্রসাদ নিয়ে যা।'

মিনু—যার ভালো নাম কল্যাণী রায় চৌধুরী, ছিপছিপে এক কিশোরী, যে এক লাফে সিঁড়ির তিনটা ধাপ পেরুতে থাকে—দৌড়েই চলে যায় মায়ের কাছে।

কত দিন মাকে দেখি না। মমতাজ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মন্নাফের সঙ্গে প্রথম দেখার দিনটাও কি কোনো দিন ভুলতে পারবেন মিনু ওরফে কল্যাণী ওরফে মমতাজ বেগম।

তখন মিনুর বয়স ২০ বছরের মতো। তিনি চাকরি করেন কলকাতা স্টেট অব ব্যাংক ইন্ডিয়ায়। খুব বড় ঘরের মেয়ে। জমিদার বংশ। রায় চৌধুরী পদবি। তাঁর মা শিক্ষকতা করেন। তাঁর মামা প্রমথনাথ বিশী বিখ্যাত সাহিত্যিক-নাট্যকার। বাবা জেলা জজ। বাবা রক্ষণশীল ছিলেন। মেয়েকে স্কুলে না দিয়ে প্রাইভেটে পড়ান। সেভাবেই মমতাজ ম্যাট্রিক পাস করেন। কিন্তু এর পরই তিনি বিদ্রোহ করে বসেন। কলেজে পড়বেনই। মামা প্রমথনাথ বিশী এগিয়ে আসেন ভাগনি উদ্ধারে। মিনু কলেজে ভর্তি হন। সেকালের কলেজ। যাতায়াত করা হতো কাপড় দিয়ে আবৃত গাড়িতে। বেথুন কলেজ থেকে বিএ পাস করেন মিনু। তারপর যোগ দেন ব্যাংকের চাকরিতে।

একদিন তাঁর টেবিলের সামনে এসে বসেন এক ভদ্রলোক। ছোটখাটো মানুষ, সাদামাটা চেহারা। আলাদা কিছু বলে মনেই হয়নি মিনুর।

মিনু বললেন, 'আপনাকে কীভাবে হেল্প করতে পারি।'

তিনি বললেন, 'আমার একটা চেক বই দরকার।' লোকটা সরাসরি তাকিয়ে আছে তাঁর চোখের দিকে। এই ব্যাপারটা বিশেষভাবে পছন্দ হয় মিনুর। ব্যাংকে একজন নারীকে কাজ করতে দেখে পুরুষগুলো সব আড়চোখে তাকায়। প্রথমে তো এমন ভঙ্গি করে যেন ভূত দেখছে। সেই তুলনায় এই ভদ্রলোক তাকাচ্ছেন সরাসরি। দেখার ইচ্ছা থাকলে পূর্ণ চোখেই দেখো।

মিনু বললেন, 'আপনার আগের চেক বইটা এনেছেন।'

তিনি বললেন, 'জি, এনেছি।' তিনি একটা চেক বই বের করলেন।

মিনু সেটা হাতে নিয়ে মলাট উল্টে বললেন, সেকি, আপনার চেক বইয়ে তো এখনো অনেক পাতা আছে।

মিনু চেক বইয়ে এই অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের নামটা দেখে নিলেন, আবদুল মন্নাফ। মুসলিম নাম, বুঝতে পারলেন মিনু ওরফে কল্যাণী।

'তাহলে টাকা তুলি।'

'তাহলে টাকা তুলি মানে? টাকা লাগলে তুলবেন।'

'আচ্ছা, তুলি কিছু টাকা।' চেক বইয়ের পাতায় এক হাজার টাকা লিখে তিনি সই করলেন।

৯

পরে মন্নাফের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে মিনুর। মন্নাফ আসলে কল্যাণী রায় চৌধুরী নামের এই অত্যন্ত সুন্দরী ব্যাংকারের সামনে খানিকক্ষণ বসতে চেয়েছিলেন।

আর সেটা বুঝতে পেরেছিলেন মিনু। সামনে সুন্দরী নারী থাকায় সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে মন্নাফের।

মন্নাফের অ্যাকাউন্টে তখন টাকাও ছিল অনেক। কারণ তিনি চাকরি করতেন কলকাতার সিভিল সাপ্লাই অফিসে।

ব্যাংকে তাঁর কাজ থাকত প্রায়ই, কিন্তু এখন মিনুকে দেখে মন্নাফ আসা-যাওয়ার হারটা দিলেন বাড়িয়ে।

মিনুর (ওরফে কল্যাণীর ওরফে মমতাজের) সেসব দিনের কথা মনে পড়ছে। মন্নাফের জন্য তিনি স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার টেবিলে বসে কী অধীর আগ্রহেই না অপেক্ষা করতেন! তখন এই লোকটাকে দেখতে তাঁর কাছে মনে হতো দেবদূতের মতো।

তিনি এসেই তাঁর সামনে হাতের মুঠো মেলে ধরতেন, সেখানে থাকত ছোট্ট একটা চকলেট। বলতেন, 'এটা নিন। আমার কাছে থাকলে গলে যাবে। যা গরম কলকাতায়।'

একদিন মিনু অফিস থেকে বেরোচ্ছেন। ছুটির পর। সে ছিল এক শীতের সন্ধ্যা। সেদিন কুয়াশাও পড়েছিল খুব। মিনু অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রাম ধরবেন বলে হাঁটছিলেন। ঠিক তখনই একটা অ্যামব্যাসেডর গাড়ি এসে থামল তাঁর

পাশে। মন্নাফ মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'মিস কল্যাণী, আপনি হাঁটছেন কেন? উঠুন। আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।' এভাবে চলল কিছুদিন। তারপর রোববারে সিনেমা দেখতে যাওয়া। মিলনায়তন অন্ধকার হয়ে গেলে হাত ধরা, একটু আসনের পেছনে হাত রাখার ছলে কাঁধ স্পর্শ করা। তখন তাঁরা বুঝে ফেললেন, দুজন দুজনকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছেন

অফিসে কথা হতে লাগল। ব্যাংকের ক্লায়েন্টের সঙ্গে এসব কী করছে এক লেডি অফিসার। বাড়িতে উড়ো চিঠি গেল। মন্নাফের নৈহাটির অফিসেও চিঠি আসতে ভুল করল না। মিনুর বাবা ভীষণ কড়া। একেবারে গোঁড়া বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তা-ই। তিনি বললেন মিনুকে, 'তোমার আর চাকরি করার দরকার নেই। তুমি আজ থেকে আর বাইরে যেতে পারবে না। কত টাকা মায়না পাও। আমার কাছ থেকে প্রতি মাসের ১ তারিখে নিয়ে নিয়ো।'

মিনু বুঝলেন, এখন রাস্তা খোলা আছে একটাই।

মন্নাফকে বিয়ে করে ফেলা। অন্য ধর্মের কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু হতে পারে না। কাজেই তাকেই স্বধর্ম ত্যাগ করতে হবে। আর ধর্ম ত্যাগ করা মানে নিজের বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন—সবাইকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করা। তাঁর এক দিকে মন্নাফ, আরেক দিকে পুরো পৃথিবী। তবু তিনি মন্নাফকেই বেছে নিলেন। কলকাতা শহরের নাখুদা মসজিদের ইমামের কাছে কলেমা পড়লেন তিনি। কল্যাণী রায় চৌধুরীর নতুন নাম হলো মমতাজ বেগম।

দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ। এখন সবাইকে লকআপে ঢোকানো হবে। ৪০-৫০ জনকে ঢোকানো হবে একটা ছোট্ট ঘরে। গায়ে গা লাগিয়ে শুতে হবে সবাইকে। পা মেলে শোয়াও মুশকিল। কারণ এর পা লাগবে ওর মাথায়। মহা হইচই শুরু হয়ে গেল।

মমতাজ ঢুকলেন লকআপে। তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে রইলেন। রাজবন্দীর মর্যাদাও তাঁকে দেওয়া হয়নি। কারণ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে মরগান কলেজের তহবিল তছরুপের। একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস উপলক্ষে তিনি যে আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, সেই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়নি। কিন্তু নারায়ণগঞ্জবাসী ঠিকই বুঝে নিয়েছে সব। তারা মমতাজ বেগমকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আন্দোলন করেছে।

নারায়ণগঞ্জের সবাই তাঁর পাশে আছে, শুধু একজন ছাড়া। তিনি হলেন তাঁর স্বামী মন্নাফ। তাঁর জন্য তিনি কী ত্যাগ করেননি! ১৯৪৭ সালে যখন দেশ

ভাগ হলো, তখন প্রশ্ন দেখা দিল, মন্নাফ কী করবেন! কলকাতা থাকবেন, নাকি চলে আসবেন পূর্ব বাংলায়?

মন্নাফ বললেন, 'কলকাতায় আমার কে আছে? আমি তো পূর্ব বাংলাতেই যাব।'

আবদুল মন্নাফের বাবা চাকরি করতেন ময়মনসিংহে, রেল বিভাগে। রেল কলোনিতে থাকতেন তাঁরা। মন্নাফ মমতাজকে নিয়ে চলে এলেন ময়মনসিংহে। মমতাজ জানেন, এই যাওয়া মানে তাঁর শৈশবের, তাঁর কৈশোরের, তাঁর যৌবনের কলকাতা ছেড়ে চিরদিনের জন্য যাওয়া। কিন্তু তিনি একবাক্যে রাজি। তাঁর কেউ না থাকুক, মন্নাফ আছে। আর তত দিনে তাঁদের সন্তান খুকু জন্ম নিয়েছে। কয়েক মাস বয়সী খুকুকে নিয়ে তাঁরা চলে আসেন পূর্ব বাংলায়। প্রথমে ওঠেন ময়মনসিংহ রেল কলোনিতে, শ্বশুরবাড়িতে। তখন ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী কলেজে তিনি শিক্ষকতার চাকরি নেন। তারপর আসেন ঢাকায়। এ সময় মন্নাফ *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রুফ রিডারের কাজ করতেন। পত্রিকা চলে না। কাগজ কেনার টাকা নেই। মানিক মিয়া অতি কষ্টে পত্রিকা চালান। শেখ মুজিব নানা কায়দায় টাকাপয়সা জোগাড় করে দেন জেলে বসেই। ফলে আবদুল মন্নাফের আয়-রোজগার কিছু ছিল না বললেই চলে। পরে ভারত থেকে কাগজপত্র আসে। তিনি আবার সিভিল সাপ্লাই বিভাগে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত হন। [illegible]দায় তার পোস্টিং হয়।

গত বছর মমতাজের চাকরি হয় নারায়ণগঞ্জ মর্গান হাইস্কুলে, প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে।

'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আমি যোগ দিয়েছি প্রাণের তাগিদে।' মমতাজ বেগম কারাগারের দেয়ালে পিঠ রেখে বিড়বিড় করেন। 'কেউ তো আমাকে বলেনি এতে যোগ দিতে। আমার স্বামী চায়নি। কিন্তু আমার তো বিবেক আছে।' তিনি ২১ ফেব্রুয়ারিতে মিছিলে নেতৃত্ব দেন নারায়ণগঞ্জে তারপর খবর এল, ঢাকায় গুলি হয়েছে। পরের দিন চাষাঢ়া মাঠে বিশাল প্রতিবাদ সভায় তাঁর পা আপন-আপনি তাঁকে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে যোগ দেয় স্কুলের মেয়েরা। যে শহরে প্রতিটি রিকশা, প্রতিটি ঘোড়ার গাড়ি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়ে তাঁর ভেতরে মেয়েরা বসে থাকে, সেই শহরে মেয়েরা মিছিলে যোগ দিয়েছে। পুরুষেরাও তখন যোগ দেয় মিছিলে, জনসভায়।

'আমি আরেকটা কাজ করেছি', মমতাজ বিড়বিড় করেন। 'আমি আদমজীর শ্রমিকদের বুঝিয়েছি, বাংলা ভাষা না থাকলে তুমি-আমি কেউ থাকব না।' মমতাজের কথা শুনে শ্রমিকেরা বুঝ মানে। আদমজীর শ্রমিকেরা

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যোগ দিলে আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে

মিছিলে যখন যোগ দিতেন, মমতাজের মনে হতো, তাঁর হাতটা আকাশ স্পর্শ করবে। মনে হতো, মানুষের সম্মিলিত শক্তির কাছে সবই তুচ্ছ।

নারায়ণগঞ্জের আপামর সাধারণ মানুষ তাঁর জন্য যা করেছে, সে কথা ভাবতেই গর্বে বুকটা ভরে ওঠে মমতাজের।

দৈনিক আজাদ পত্রিকার কাটিংটা তিনি রেখেছেন তাঁর কাছে। সেটা মেলে ধরেন মমতাজ। এটা তিনি সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যান জেলখানার লাইব্রেরিতে সেখান থেকে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে আসেন তিনি।

আজাদ লিখেছে :

> সকালবেলা স্থানীয় পুলিশ নারায়ণগঞ্জ মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিসেস মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করে। সংবাদ পাইয়া একদল ছাত্র ও নাগরিক আদালতের সামনে হাজির হয়, বিনা শর্তে তাঁহার মুক্তি দাবি করিয়া 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকে। মহকুমা হাকিম ইমতিয়াজী তখন বাহিরে আসিয়া বলেন, মমতাজ বেগমকে স্কুলের তহবিল তছরুপের দায়ে গ্রেফতার করা হইয়াছে, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার গ্রেফতারের সম্পর্ক নাই। কিন্তু জনতা তাহা বিশ্বাস করে না, বলিতে থাকে, মমতাজ বেগম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান কর্মী বলিয়াই পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়াছে সুতরাং তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি না দিলে তাহারা আদালত প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া যাইবে না। পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করিয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে।
>
> বৈকালে পুলিশ মোটরযোগে মমতাজ বেগমকে লইয়া ঢাকা রওনা হইলে চাষাঢ়া স্টেশনের কাছে জনতা বাধা দেয়। তাহাতে পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ফলে উভয় পক্ষে ৪৫ জন আহত হয়।

জনতা সেদিন বটগাছ কেটে কেটে এনে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছিল, যাতে মমতাজ বেগমকে ঢাকায় নিতে না পারে। জনতার আক্রমণে নাকাল পুলিশ তাঁকে নিয়ে পুলিশ ফাঁড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে বসেই তিনি এসব তথ্য জানছিলেন। দীর্ঘ ছয় মাইল রাস্তায় নাকি শত শত গাছ কেটে ফেলে রাখা হয়েছিল। মানুষ তাঁর মুক্তির জন্য যে আন্দোলন করেছে, তাঁর জন্য আহত হয়েছে, গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের অসম্মান করে তিনি কি বন্ডসই দিয়ে মুক্তি লাভ করতে পারেন?

পুলিশ শুধু তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে তা নয়, তার কয়েকজন ছাত্রীকেও গ্রেপ্তার করেছে।

মমতাজের মামলা জামিনযোগ্য।

মমতাজকে তো ছাড়া হবে না। কারণ, তাঁর জন্ম হাওড়ায়, তাঁর আদি নাম কল্যাণী রায় চৌধুরী। মুসলিম লীগ তো এটাই প্রমাণ করতে চায় যে ভাষা আন্দোলন করেছে হিন্দুরা, কলকাতা থেকে এসে।

১০.

খুকুর কথা মনে পড়ছে মমতাজের। নিজের গর্ভে যাকে তিনি ধারণ করেছেন। বাচ্চাটার পাঁচ বছর হলো এই ২১ ফেব্রুয়ারিতেই। একুশে ফেব্রুয়ারিতে তার জন্মদিনে কেক কাটার জন্য তিনি বিশেষ কেকের অর্ডার দিয়ে রেখেছিলেন। মেয়েটার জন্য নতুন জামা কিনে এনে রেখেছিলেন। বেলুন কেনা হয়েছিল। পাঁচটা মোমবাতিও কেনা ছিল। বিকেলে ওর দু-চারজন বন্ধুও এসেছিল। কিন্তু মমতাজ বেগম বাড়ি ফিরেছিলেন গভীর রাতে। সারা দিন তাঁরা মিছিল করেছেন। সভা করেছেন। রাতেও তাঁর বৈঠক ছিল নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকদের সঙ্গে কাজেই মেয়েটা অনেক রাত পর্যন্ত মায়ের জন্য জেগে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল সেদিন। গভীর রাতে বাড়ি ফিরে মন্নাফের কথার খোঁটা উপেক্ষা করে মমতাজ মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকায় গুলি হয়েছে, ছাত্ররা শহীদ হয়েছে, এ খবর পেয়ে তিনি কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলেন না।

এখন তাঁর খুকুর কাছে যেতে ইচ্ছা করছে। খুকুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করছে। খুকুকে ভাত মেখে খাওয়াতে ইচ্ছা করছে।

খুকু এসেছিল জেলখানায়। দেখা করেছে তাঁর সঙ্গে। আবার কবে আসবে খুকু?

খুকু আসে সোমবার। তার বাবার সঙ্গে। খুকুকে দেখে বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে মমতাজের। বেচারি! মুখটা কী রকম শুকিয়ে আছে। মন্নাফ বলেন, 'এই যে তোমার মেয়ে।' 'খুকু, মাকে বলো আমাদের সাথে বাড়ি ফিরতে।'

খুকু বলে, 'মা, আমাদের সাথে বাড়ি চলো।'

মমতাজ বলেন, 'যাব মা। যাব। তোর মা মাথা উঁচু করে বের হয়ে আসবে জেল থেকে। তোর বাবার মতো কাপুরুষের মতো চাকরি বাঁচানোর চেষ্টা করবে না।'

মন্নাফ বলেন, 'এই কি তোমার শেষ কথা?'

মমতাজ বলেন, 'আমি তো বলেছি, আমি বন্ডে সাইন করব না।'

মন্নাফ বলেন, 'তাহলে মনে রেখো, তালাকই তুমি বেছে নিচ্ছ।'

মমতাজ বলে, 'দুটোকে এক কোরো না।'

মন্নাফ বলে, 'তালাক না দিলে তো আমার চাকরি থাকবে না। কাগজে-কলমে হলেও তোমাকে তালাক আমাকে দিতেই হবে।'

মমতাজ বলে, 'তুমি যাও। কোনো কাপুরুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

মমতাজ রাগে মেঝেতে জোরে জোরে পা ফেলে ওয়ার্ডে ফিরে এলেন। যেন সব রাগ তার এই কারাগারের মেঝের ওপর।

মন্নাফ তাঁর মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন।

রাতের বেলা। নারকীয় লকআপে গাদাগাদি শুয়ে আছেন মমতাজ। একজনের মাথা আরেকজনের পায়ের গুঁতোয় কাহিল। এ-কাত থেকে ও-কাত হলেই একজনের হাত-পা পড়ছে অন্যের গায়ে। মধ্যরাতে এই নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি লেগেই থাকে। ঘুমভাঙা চোখ রগড়াতে রগড়াতে জমাদারনি এসে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিয়ে সব ঠান্ডা করতে প্রয়াসী হয়। সেখানে এক ভোরে মমতাজ বেগম স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ছোট্ট মেয়েটি, খুকু, একটা সাদা রঙের ফ্রক পরেছে। মাথায় দুই বেণি। আর একটা সাদা ফিতা। মমতাজ বেগম কেবল মর্গান স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছেন। মেয়েটি এসে তাঁর হাত ধরে বলল, 'মা, আমি সাদা পরি। আমি আর এই দেশে থাকব না। পরিদের দেশে মেঘের ওপরে চলে যাব।'

'কেন মা? তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছ কেন?' মমতাজ বেগম হাতের ব্যাগটা টেবিলের এক কোণে রেখে মেয়েকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন।

পাঁচ বছরের খুকু বলল, 'তুমি ভালো না। আমি এই বাড়িতে তোমাকে ছাড়া থাকি। বাবা সারা দিন বাইরে বাইরে থাকে। আমাকে কেউ ভালোবাসে না। সারা রাত আমি ঘুমাই না। মা মা বলে কাঁদি। কিন্তু তবু তুমি আমার কাছে আসো না।'

ঠিক তখনই মমতাজের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'মা মা, তুমি কোথায়?' তাঁর মনে হলো, তিনি কলকাতার হাওড়ার বাড়িতে, মা শাঁখ বাজাচ্ছেন। তারপর চোখ মেলে দেখলেন, তিনি ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের ফিমেইল ওয়ার্ডের লকআপের ভেতরে দুজন বন্দিনীর শরীরের চাপে পিষ্ট হয়ে শুয়ে আছেন।

১১.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমগাছে বসে ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি এই মমতাজ বেগমকে নিয়ে কথা বলছে।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'ও ব্যাঙ্গমি, হুনছ। মমতাজ বেগম তাঁর স্বামীরে কইলেনটা কী?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'তুমিও যদি কাপুরুষের মতন আচরণ করো, তোমারও লগে আমার একই কথা। আমি কোনো কাপুরুষের লগে কথা কমু না।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়া একজন নারী দুই রকম জুলুম ভোগ করতে বাধ্য হইলেন। একটা হইল সরকারের জুলুম। আরেকটা হইল পুরুষগো জুলুম। মমতাজ বেগম বন্ড দিবেন না। মুক্তি ভিক্ষা কইরা লইবেন না। অনশন করবেন। আর অনশন করলে একই অত্যাচার করব হ্যার উপরেও, যেমন করছিল মুজিবের উপরে। নল দিয়া ফোর্স ফিডিং। অনেক কষ্ট পাইবেন মহিলা। কিন্তু মাথা নত করবেন না। বছর দেড়েক পরে মুক্তি পাইবেন। তত দিনে তাঁর স্বামীর মন উইঠা গেছে। শ্বশুরবাড়িও তাঁর ওপরে নাখোশ। শাশুড়ি গঞ্জনা দেন। ননদেরা নানা কথা কয়। শেষতক মহিলা আলাদা হইয়া যাইবেন। আর স্বামীও আরেকটা বিয়া কইরা সুখে সংসার করবেন। ভাষা আন্দোলন করতে গিয়া অনেকে অনেক কিছু ত্যাগ করছেন। কিন্তু নিজের সংসারজীবন তছনছ হইয়া গেছে, এই খবর তুমি আর পাইছ?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'খুব খারাপ লাগে, যখন মহিলার কথা ভাবি। তিনি তো তাঁর বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, ধর্ম-দেশ সব ছাইড়া আইছিলেন তাঁর প্রেমিকের কাছে। সেই প্রেমিক তাঁরে ছাইড়া ভবিষ্যতে আরেকটা বিয়া করবেন মহিলা থাকবেন কী নিয়া?'

'কী নিয়া থাকবেন, কও তো?'

ব্যাঙ্গমি বলল :

সব কিছু হারাইলেও হারান নাই মান।
রাষ্ট্রভাষা তরে নারী করে আত্মদান ॥

একূল-ওকূল তার সব কূল যায়।
সব হারিয়েও নারী মাথা তুলে চায় ॥
কারণ মায়ের ভাষা হারান না তিনি।
বাংলাদেশ বাংলা ভাষা তার কাছে ঋণী ॥

১২.

বাহাদুর শাহ পার্কের কাছেই নাসিরউদ্দিন লেন। ১০১ নম্বর বাড়ির দোতলায় মহিউদ্দিন আহমদ শুয়ে আছেন পালঙ্কে। অনশন ধর্মঘট তাঁর শরীরে ধ্বংসচিহ্ন রেখে গেছে। তাঁর ওজন গেছে কমে। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে। চোয়াল বসা। এটা তাঁর ভাইয়ের বাসা। ভাবি তাঁকে নানা কিছু খাইয়ে তাঁর হৃত স্বাস্থ্য ও ওজন ফেরানোর চেষ্টা করছেন। প্রথম দিন অবশ্য মহিউদ্দিন ঘোল ছাড়া কিছুই খাননি। তারপর গলা ভাত, নরম সবজি। ভাবি এখন তাঁর সামনে ধরেছেন মুরগির স্যুপের বাটি। এটা তাঁকে খেতে হবে।

কোত্থেকে কোথায় এলেন। মহিউদ্দিনের মনে পড়ে গেল ফরিদপুর কারাগারে অনশনের দিনগুলো। মুজিব আর তিনি, দুজনেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। আহা, কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মুজিব তাঁকে ধরে কী কান্নাটাই না কেঁদেছিলেন! মুজিব এখন টুঙ্গিপাড়ায়, তাঁর গ্রামের বাড়িতে।

সামনে একটা বড় বাড়ি। সেখানে লোকজন আসা-যাওয়া করছে। পালঙ্কে আধা শয়ান মহিউদ্দিন সব দেখতে পাচ্ছেন। একটুখানি স্যুপ মুখে তুলে নিয়ে গামছায় মুখ মুছে মহিউদ্দিন বললেন, 'ভাবি, ওই বাড়িটা কার। সারাক্ষণ দেখি লোকজন আসা-যাওয়া করছেই।'

ভাবি বললেন, 'ওটা ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়ি।'

ইয়ার মোহাম্মদ খান আওয়ামী লীগের নেতা। মুজিবের বড় পৃষ্ঠপোষক। কারাগারে এসে মুজিবের সঙ্গে দেখা করতেন। ভাইয়ের কাছ থেকে মহিউদ্দিন জানতে পারলেন, বাড়িতে মওলানা ভাসানী এসে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যই মানুষ ভিড় করে আসছে এই বাড়িতে।

মহিউদ্দিন বললেন, 'মওলানা ভাসানী না আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি, আর ভাষাসংগ্রাম কমিটিরও সভাপতি। তাঁকে তো পুলিশ খুঁজছে। যেখানে পারছে বিরোধী নেতা-কর্মীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে ফেলছে। আর মওলানা আন্ডারগ্রাউন্ডে না গিয়ে এই বাড়িতে বসে লোকজনকে দেখা দিচ্ছেন। আজব তো!'

মহিউদ্দিন আহমদ আস্তে আস্তে দোতলা থেকে নামলেন। রাস্তায় রিকশা, ঘোড়াগাড়ি, মানুষের ভিড়। ভিস্তিওয়ালা পানি নিয়ে যাচ্ছে। বসন্তের সকাল। রৌদ্রোজ্জ্বল পথঘাট। আকাশ নীল। কুলফিওয়ালা 'কুলফি চাই, কুলফি' বলে চিৎকার করছে। মহিউদ্দিন ধীর পায়ে হেঁটে মওলানা ভাসানীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

মওলানা ভাসানী বসে আছেন দোতলার ঘরে। যথারীতি তাঁর মাথায় তালের আঁশ দিয়ে বানানো টুপি, তিনি বসে আছেন একটা সাদা হাফ হাতা ঢোলা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে। মহিউদ্দিন বললেন, 'হুজুর, আমি মহিউদ্দিন। শেখ মুজিবরের সাথে এক সেলে ছিলাম ঢাকায়। ফরিদপুরে একসাথে অনশন করেছি।'

ভাসানী বললেন, 'তুমি ঢাকায় আইছ? মজিবর তো গোপালগঞ্জেই। নাকি?'

'জি, হুজুর।'

'শরীলটা এখন কেমুন?'

'আমার শরীর! আছে আর কি। অনশনে ছিলাম বোঝেনই তো। আপনার শরীরটা কেমন?'

'আল্লায় রাখছে। খাজা নাজিম উদ্দিন আর নুরুল আমিনের পাকিস্তানে কেমন থাকন যায়, বুঝোই তো! ৬৭ বছর বয়স! আল্লায় রাখছে আর কি! দ্যাহো না, এই যে পলায়া আছি।'

'পলায়ে আছেন কেন?'

ভাসানী কাশি দিলেন, তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার হওন ঠিক হইব না। আন্দোলন করব কেডা? সব তো জেলে তাই পলায়া আছি।'

মহিউদ্দিন বললেন, 'হুজুর, এটা আপনার কেমন পালানো! আওয়ামী মুসলিম লীগের সব নেতাকে ধরেছে, ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্র, মেডিকেলেব ছাত্র—যাকে পাচ্ছে তাকেই অ্যারেস্ট করছে, আপনাকেও তো ধরবে আপনি তো প্রকাশ্যেই আছেন। আপনার সাথে দেখা করার জন্য লোকে লাইন দিচ্ছে। এইটা হুজুর আপনার কেমন আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা?'

মওলানা ভাসানীর পালানোর ব্যবস্থা হলো। পাশেই বুড়িগঙ্গা নদী। তিনি সেই নদীতে একটা নৌকা ভাড়া করে উঠে পড়লেন। সেই নৌকায় থাকা-খাওয়া, বাথরুম করারও ব্যবস্থা আছে। মাঝেমধ্যে নৌকা ঘাটে ভেড়ে। চাল-ডাল-নুন-তেল যা লাগে মাঝি কিনে আনে। রাজনৈতিক কর্মীরাও ওই নৌকাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তারপর আবার নৌকা ভাসানো হয়।

পুলিশ তাঁর সন্ধান পাচ্ছে না। হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন, আওয়ামী লীগ একটা নিয়মতান্ত্রিক দল। তার নেতারা পালিয়ে থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতি করবে না। মওলানা ভাসানীকে আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

মওলানা ভাসানী পার্টির আদেশ মেনে নিলেন। তিনি জেলা প্রশাসক অফিসে গিয়ে দস্তুরমাফিক আত্মসমর্পণ করলেন। অতঃপর তাঁর জায়গা হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

১৩.

শেখ মুজিবকে সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে হচ্ছে। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, মুজিবকে যেন বিছানা ছেড়ে উঠতে দেওয়া না হয়। আব্বাই ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। তারপর সিভিল সার্জনের দেওয়া প্রেসক্রিপশন তো আছেই।

টুঙ্গিপাড়ায় পৈতৃক বাড়ির নিজের ঘরে মুজিব শুয়েই থাকেন সারাক্ষণ। রেনু পাশে বসেন একটা হাতপাখা নিয়ে। দক্ষিণের জানালাটা খোলা। সেটা দিয়ে আমের মুকুলের গন্ধ আর কোকিলের কুহুতান আসে। টুপটাপ মুকুল ঝরে পড়লে টিনের চালে তার শব্দও হয়।

সকালের নাশতা বিছানায় বসেই সেরে নিয়েছেন মুজিব। রেনু এখন তাঁর পানের কৌটা নিয়ে বসেছেন। পান সাজাবেন। হাসু আর কামালও বিছানায় আব্বার শরীর ধরে পড়ে আছে।

কামালটা হয়েছে শুকনো-পটকা। সবাই বলে মুজিবের মুখটাই নাকি তার মুখে বসানো। সে প্রথম প্রথম তার আব্বার কাছে আসতে সংকোচ বোধ করত। সে তো বলেই ফেলেছিল হাসিনাকে, 'হাসু আপা, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আব্বা বলে ডাকি।' মুজিব ছেলেটাকে কাছে টেনে নেন। কামাল আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে বুক লাগিয়ে পড়ে রইল। আড়াই বছরের কামালের চুলে মুজিব হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সাড়ে চার বছরের হাসিনা মাথার লাল ফিতা খুলে আঙুলে পেঁচাচ্ছে। এবার সে তার আব্বার হাতের আঙুল নিয়ে ফিতায় পেঁচাতে শুরু করল।

রেনু বললেন, 'খবরের কাগজে নাকি লিখেছে, সোহরাওয়ার্দী সাহেব বাংলা চান না। উনি নাকি বাঙালিদের উর্দু শিখতে বইলে দিয়েছেন?'

মুজিব বললেন, 'আমিও শুনছি। আমার মনে হয় না লিডারের মতো যুক্তিবাদী লোক এই রকম কথা বলতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তানে বসে কী বলেছেন, না বলেছেন, আর কাগজে কী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, কে জানে! আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া দরকার। এসব কথা তাঁর ক্ষতি করবে। আর তাতে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরও বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। ঢাকায় ছাত্ররা রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার জন্য শহীদ হয়েছে। সেই খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ফরিদপুরে কত বড় বড় মিছিল হয়েছে আমি জেলে বসেই শুনেছি। মেয়েরা পর্যন্ত মিছিল করেছে। মানুষ জেগে উঠেছে। আর পারবে না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। আর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রও সুবিধা করতে পারবে না।'

মুজিব বলছেন আর ভাবছেন সোহরাওয়ার্দীর কথা। এই মানুষটাকে তিনি খুবই ভালোবাসেন, খুবই মান্য করেন। জীবনে তিনি একবারই সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করেছেন। কিন্তু এবার মনে হয়, একটা প্রশ্নে লিডারের অবাধ্য তাঁকে হতেই হচ্ছে। তা হলো রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে। বাঙালিরা উর্দু শিখবে, এই কথাটা তিনি বলতে পারলেন?

শেখ মুজিবের মনে পড়ল আট বছর আগের একটা দিনের কথা। কলকাতায় থিয়েটার রোডের ৪০ নম্বর বাড়ি। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তাঁদের ডেকেছেন তাঁদের বাড়িতে। মুসলিম ছাত্রলীগের কলকাতার কর্মীদের কয়েকজন সমবেত হয়েছেন সেখানে। সামনে কুষ্টিয়ায় ছাত্রলীগের সম্মেলন। কুষ্টিয়ায় ডাকা হয়েছে, কারণ শাহ আজিজের বাড়ি কুষ্টিয়া। শেখ মুজিব ও

তাঁর সহকর্মীরা সবাই আবুল হাশিমপন্থী। সোহরাওয়ার্দীকেও তাঁরা খুব পছন্দ করেন। আরেকটা দল আছে, শাহ আজিজের, যাদের নেতা আনোয়ার, যিনি কিনা হাশিম সাহেবকে দেখতেই পারেন না। যদিও আনোয়ারও সোহরাওয়ার্দীর অনুগত। তাঁরা বসে আছেন নিচতলার বৈঠকখানায়। লাল রঙের মেঝে। ছাদ অনেক উঁচুতে। বড় বড় সোফা সব এই ঘরে। সোহরাওয়ার্দী এই দুই দলের মধ্যে একটা সমঝোতার চেষ্টা করছেন। তিনি বললেন, 'আনোয়ারকে তোমরা একটা পদ দাও।'

মুজিব বললেন, 'কখনোই হতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোটারি করেছে, ভালো কর্মীদের সে জায়গা দেয় না। কোনো হিসাবনিকাশও সে কোনো দিন দাখিল করেনি। তাকে কেন আমরা পদ দেব?'

সোহরাওয়ার্দীর পরনে সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, তিনি মুজিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হু আর ইউ। ইউ আর নোবডি।'

মুজিব পরে আছেন একটা হাফ হাতা শার্ট, চোখে যথারীতি মোটা কালো ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা, হঠাৎই রেগে গেলেন, চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ইফ আই এম নোবডি, দেন হোয়াই হ্যাভ ইউ ইনভাইটেড মি? ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনসাল্ট মি। আই উইল প্রুভ দ্যাট আই এম সামবডি। থ্যাংক ইউ স্যার। আই উইল নেভার কাম টু ইউ অ্যাগেইন।' মুজিব উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। হনহন করে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পেরিয়ে নেমে পড়লেন লনে। তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তাঁর বন্ধু-সহকর্মীরা।

সোহরাওয়ার্দী তখন তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী কর্মী মাহমুদ নুরুল হুদাকে বললেন, ওকে ধরে আনো। মুজিব হাঁটছেন হনহন করে। রাগে তাঁর দুই চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। হুদা ভাই দৌড়ে এসে মুজিবকে ধরে ফেললেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবও দোতলার বারান্দা থেকে ডাকছেন, 'মুজিব, মুজিব, শোনো, শুনে যাও।'

বন্ধুবান্ধবেরা মুজিবকে বলতে লাগলেন, 'শহীদ সাহেব ডাকছেন, বেয়াদবি করাটা উচিত হবে না। চলো ফিরে যাই।'

মুজিব এবং বন্ধুবান্ধবেরা দোতলায় উঠলেন। সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা ইলেকশন করো, যে জিতবে, সেই কমিটিতে আসবে, আমার কোনো আপত্তি নেই। শুধু গোলমাল কোরো না। মুজিব, তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

শেখ মুজিবকে তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ভেতরের ঘরে। মুজিবের মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'তোমাকে আমি বেশি স্নেহ করি, তুমি তো

বোকা। তোমাকে আদর করি বলেই তোমাকে আমি এই কথা বলেছিলাম। অন্য কাউকে তো বলি নাই।' মুজিবের রাগ পড়ে এল। তার পর থেকে এত দিন, প্রায় আট বছর, মুজিব সব সময়ই সোহরাওয়ার্দী সাহেবের স্নেহ পেয়ে আসছেন।

মুজিব সব সময়ই সোহরাওয়ার্দীর আদেশ-নিষেধ শুনে আসছেন। বিপদে-আপদে তাঁকেই চিঠি লেখেন, তাঁরই শরণাপন্ন হন। কিন্তু এই একটা ব্যাপারে গুরু-শিষ্যের মতদ্বৈধতা দেখা দিল। রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা হবে কি হবে না। মুজিব ভাবেন, বাঙালিদের দাবি তো অত্যন্ত যৌক্তিক। পাকিস্তানে বাঙালিরাই সংখ্যাগুরু। তবু তারা দাবি করেছে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। উর্দুও রাষ্ট্রভাষা হবে, বাংলাও হবে। এই সোজা কথাটা খাজা নাজিম উদ্দিন আর নুরুল আমিন বুঝল না। এরা দেশ চালাবে কী করে? আজ বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান। মানুষ বুঝতে পেরেছে, মুসলিম লীগ সরকার একটা জালিম সরকার। পশ্চিমারা পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসনের নামে শোষণ করতে চায়। আজকে তাই মুজিবকে তাঁর নেতার মতের বাইরেই যেতে হবে।

কামাল মুজিবের পেটের ওপরে উঠে পড়েছে। রেনু বললেন, 'কামাল, নামো। আব্বার শরীরটা ভালো না।'

মুজিব বললেন, 'থাকুক। ওর তো কোনো ওজনই নেই।'

হাসিনা কামালকে দুই হাতে ধরে নামিয়ে নিল তাঁর পায়ের ওপর থেকে। বলল, 'আসো ঘুঘু ঘুঘু খেলি।' কামালকে পায়ের ওপরে বসিয়ে সে একবার তোলে, আরেকবার নামায় ঢেঁকির মতো। 'ঘুঘু ঘুঘু, ছেলের ফুপু, ছেলে কই, মাছে গেছে, মাছ কই, চিলে নিয়ে গেছে, চিল কই, আড়াত বসেছে, আড়া কই, পুড়ে গেছে, ছাই কই, উড়ে গেছে...'

রেনু পান চিবোচ্ছেন। পানের গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

মুজিব বললেন, 'রেনু, শোনো ফরিদপুর জেলখানায় কার সাথে দেখা হয়েছিল!'

'কার সাথে?' রেনু পানের পিক পিকদানিতে ফেলে বললেন।

'রহিম চোরের সাথে। সে কী বলে, জানো? সেই যে অনেক আগে আমাদের বাড়িতে চুরি হয়েছিল, তখন তো তুমি ছোট? তোমার মনে আছে?'

'আছে।' হাতের চুন দেয়ালে মুছতে মুছতে রেনু বললেন।

'কে চুরি করেছিল মনে আছে?'

'রহিম চোরা! বাড়ি খালি কইরে নিয়ে গিয়েছিল। মনে হয়, এক শ দেড় শ ভরি শুধু সোনাই নিয়েছিল!'

'হ্যাঁ। সেই রহিম চোরের সাথে দেখা ফরিদপুর জেলে। হাসপাতালে থাকি। হাসপাতালটা দোতলা। আমি সকালবেলা উঠে প্রথমে খানিক হাঁটাহাঁটি করলাম। তারপর বারান্দায় বসে চা খাচ্ছি। এমন সময় একজন আধা বুড়া কয়েদি আসলেন। তিনিও হাসপাতালে আছেন। এসেই মেঝেতে বসে পড়লেন আমার পাশেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার বাড়ি কোথায়?" "বাড়ি গোপালগঞ্জ থানায়, ভেন্নাবাড়ি গ্রামে। নাম রহিম।" আমি বললাম, "আপনার নামই রহিম মিয়া?" সে মাথা নাড়ে। আমি বললাম, "রহিম মিয়া, আপনিই না আমাদের বাড়ি চুরি করেছিলেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ করছিলাম।" "আপনি সাহস করলেন কী করে? আমাদের বাড়িতে বন্দুক আছে। অনেক শরিকদের বাড়িতে বন্দুক আছে। এত বড় বাড়ি। কত লোক।" তিনি কী বললেন জানো, বললেন, "গ্রামের লোক সাথে ছিল। আপনার বাড়ির লোকও সাথে ছিল।"

রেনু বললেন, 'কে একজন দুদিন পরে আইসে স্বীকার করেছিল না সে নৌকোয় করে চোর নিয়ে এসেছিল?'

মুজিব বললেন, 'আমাদেরই তো এক প্রজা, কেরায়া নৌকা চালাত। দুদিন পরে এসে নিজেই বলল, সে নৌকায় করে রহিম আর তার দলকে নিয়ে আসে। আব্বা থানাপুলিশ করলেন। চুরির মাল কিছুই ধরা পড়ল না। কেস দুর্বল হয়ে গেল। সে-ও এক দারোগার জন্য। রহিম মিয়াকে না ধরলে কি আর সোনা-দানা পাওয়া যায়? আব্বা অবশ্য ওই দারোগার বিরুদ্ধে কমপ্লেইন করেছিলেন। রহিমের ইতিহাস শোনো। তিনি বললেন, "আপনাদের বাড়িতে চুরি করে যখন আমার কোনো ক্ষতি হলো না, তখন ঘোষণা দিয়ে দিলাম, লোকে বলে চোরের বাড়িতে দালান উঠে না। আমি আমার বাড়িতে দালান দিয়ে দেব। কিছুদিন পরে আরেকটা ডাকাতি করতে গেলাম বাগেরহাট। সেইখেনে গিয়ে ধরা পইড়ে গেলাম। অনেক টাকাপয়সা খরচ করে জামিন নিয়ে এলাম। তারপর উলপুর গ্রামের রায় চৌধুরীদের বাড়িতে ডাকাতি করে ফেরার পথে পুলিশ ধরে ফেলল। পুলিশ জানত, আমি ওই পথে ফিরব। তাই ওত পেতে ছিল। ফির জামিন নিলাম। তারপর আবার ডাকাতি কইরে ধরা পড়লাম। আর জামিন দিল না। সব মিইলে ১৫/১৬ বছর জেল হয়েছে। আগে আমি কোনো দিনও ধরা পড়ি নাই। আপনেদের বাড়িতে চুরি করার পর থেকেই সব জায়গায় ধরা পইড়ে গেলাম। আপনাদের বাড়ি তো আমাদের জইন্যে পুণ্যস্থান ছিল। সেইখানে হাত দিয়ে হাত জ্বইলে গেছে। আপনার মার কাছে মাফ চাইতে পারলে বোধ হয় খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হতো!' আমি বললাম,

"রহিম মিয়া, আমার মা আর আব্বা দুঃখ পেয়েছিলেন বেশি। কারণ আমার বিধবা বোনের গহনাই ছিল বেশি। একটা ছোট ছেলে আর একটা ছোট মেয়ে নিয়ে বোনটা আমার ১৯ বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল।" রহিম বললেন, "আর জীবনে চুরি করব না। আপনার কিছু দরকাল হলে বলবেন। আমার গলার মাঝে খোকর আছে। তাতে সোনার গিনি রাখা আছে।" আমি বললাম, "আমার কোনো কিছুর প্রয়োজন নাই।" মনে মনে বললাম, সোনার গিনি থাকবে না। আমাদের বাড়ি থেকেই তো নিয়েছ সোয়া শত ভরি।'

বাইরে লোকজন এসে গেছে। মা এসে বললেন, 'খোকা, তোমার সাথে দেখা করার লাইগে লোকজন এসে ভরে গেছে।'

মুজিব বললেন, 'মা, তোমার কথাই হচ্ছিল। রহিম মিয়া, ওই যে আমাদের বাড়িতে চুরি করেছিল, তার সাথে দেখা জেলখানায়। তোমার কাছে মাফ চাইতে নাকি আসবে।'

মা বললেন, 'আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। বিধবা মেয়েটার গয়না। তারে আমি মাফ করব কী করে?'

রেনু তাড়াতাড়ি উঠে মাথায় কাপড় দিয়ে বাইরে গেলেন। হাসু আর কামালও ছুটে গেল বাইরে।

সাবের মাতবর এসেছেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক। তাঁরা ঘরে ঢুকলেন। সাবের মাতবরকে মুজিব বললেন, 'চাচা, উঠতে তো পারব না। শুয়ে শুয়ে সালাম দিই। বেয়াদবি নিয়েন না।'

ঘরে চেয়ার কতগুলো এনেওয়াই ছিল। সাবের মাতবর বসলেন। বললেন, 'না বাবা, তোমাকে এক নজর দেখতে এসেছি। বাপ রে, তুমি তো বাপ শুকোয়ে কাঠি হয়ে গেছ। আমি তো রাতের বেলা তোমারে দেখলে ভূত ভেবে জ্ঞান হারাতাম। এত শুকোলে কেমন করে?'

'বোঝেনই তো, খাজা নাজিম উদ্দিনের মেহমান হয়ে ছিলাম আড়াই বছর। কেমন থাকতে পারি!' মুজিব বললেন।

সাবের মাতবর তাঁর গালের দাড়ি নাড়তে নাড়তে বললেন, 'কত কথা বইলেছিলে দেশ ভাগের আগে। বললে, পাকিস্তান হলে কত উন্নতি হবে। জনগণ সুখে থাকবে। অত্যাচার-জুলুম থাকবে না। কয়েক বছর হইয়ে গেল, দুঃখ তো জনগণের আরও বাড়ল। চালের দাম বেশি। কমার তো কোনো লক্ষণ নেই। তুমি করলে পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন, এখন তোমাকে জেলে নেয় কেন?'

মুজিব কী করে বোঝাবেন এঁদের?

তিনি নীরব হয়ে রইলেন। কথা বলতে তাঁর ইচ্ছা করছে না। সাবের মাতব্বর বললেন, 'এখন নাকি আবার সবাইরে উর্দু শিখতি হবে। বাপ-দাদার ভাষা ছাইড়ে আবার উর্দু কই কেমনে? এইটা কেমন দেশ তোমরা আনলা?'

আস্তে আস্তে দর্শনার্থীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল থেকে লোকজন আসছে শেখ মুজিবকে দেখবে বলে। রেনু ব্যস্ত হয়ে পড়েন দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষগুলোকে আপ্যায়ন করানোর আয়োজন নিয়ে। পানের পসরা চলে আসে ঘরে। তাঁর রান্নাঘরের চুলায় ভাত ওঠে। ধামায় খই-মুড়ি-গুড়।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মুজিব জানালার পর্দা সরিয়ে দিলেন। আলো আসুক। মুজিব মানিক ভাইকে একটা চিঠি লিখলেন। এরপর তিনি একটা চিঠি লিখবেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে। সারা দিন এত দর্শনার্থী আসে যে চিঠিপত্র লেখার বা পড়াশোনা করার সময় পাওয়া যায় না।

টুঙ্গিপাড়া
পাটগাতী, ফরিদপুর।
২৮-০৩-৫২

আমার প্রিয় মানিক ভাই,

আপনাকে আমার আন্তরিক সালাম। আমি এইমাত্র আপনার পোস্টকার্ড পেলাম। আমি সত্যি আপনার অসুবিধা অনুধাবন করতে পারছি। আমি যখন ঢাকা রওনা হওয়ার কথা ভাবছিলাম, ঠিক তখনই আমাকে আমাশয় আক্রমণ করে বসল। আমি এখন আল্লাহর রহমতে অনেকটাই ভালো। আমার শরীরটা একটা রোগগৃহ। যা-ই হোক না কেন, আমি ১৬ তারিখে বা তার আগে অবশ্য অবশ্যই ঢাকা পৌঁছাব। আমার একটা সার্বিক চিকিৎসা দরকার। আমার জন্য একটা থাকার ব্যবস্থা করবেন। যেভাবেই হোক না কেন, দয়া করে আমি না এসে পৌঁছানো পর্যন্ত কাগজটা চালিয়ে যাবেন। আমাকে অনুগ্রহ করে চিঠি লিখবেন। আতাউর রহমান সাহেবকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।

আমি ওয়াদুদের অবস্থা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন, যে কিনা গ্রেপ্তারের সময় অসুস্থ ছিল। আপনি কেমন আছেন?

আপনার স্নেহের
মুজিব

চোখে চশমাটা পরে নিয়ে এরপর তিনি ইংরেজিতে লিখলেন :

টুঙ্গিপাড়া,
ডাকঘর : পাটগাতী
জেলা : ফরিদপুর
তারিখ : ২৮/৩/৫২

জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেব,

কারাগার থেকে মুক্তির পর আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর পাই নাই। আমার শরীর এখনও দুর্বল। আমি রক্ত আমাশায় ভুগছি। আমার একটা সার্বিক চিকিৎসা প্রয়োজন। এ জন্য আমি ১৬ এপ্রিল বা তার আগে ঢাকা রওনা হব। আপনি পূর্ব বাংলার অবস্থা জানেন। ক্ষমতাসীন লোকেরা জনগণকে সাংবিধানিকভাবে কাজ করতে দেবে না। তারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি অধীর হয়ে আছি। আড়াই বছরের কারাবাস আমার স্বাস্থ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। দয়া করে আমাকে মানিক ভাইয়ের ঠিকানা ৯ হাটখোলা রোড ঢাকা বরাবর চিঠি লিখবেন। অনুগ্রহ করে বন্ধু ও সহকর্মীদের আমার সালাম পৌঁছে দেবেন।

আপনার অনুরক্ত মুজিবুর

ডাকপিয়ন এল বাড়িতে। তাঁর গায়ে খাকি রঙের শার্ট, পরনে লুঙ্গি, পিঠে ঝোলা। 'খোকা ভাইয়ের চিঠি এয়েছে, চিঠি' বলে দীর্ঘ লয়ে হাঁক পাড়ছেন। হাসু দৌড়ে গেল, চিঠি এসেছে, চিঠি। পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল কামাল, হাতে একটা গাছের ডাল, এটা তার গাড়ি, সে ছুটছে ভোঁ শব্দ করে। আপার সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠল না, গাড়িসমেত ড্রাইভার নরম মাটিতে একটা ডিগবাজি খেল। পাশে একটা মুরগি, তার হলুদ ছানা কয়েকটা নিয়ে কককক করে ডেকে উঠল। মুরগির ছানাগুলোর সঙ্গেই কয়েকটা হাঁসের ছানা। মুরগি-মা হাঁস ও মুরগির ডিমে তা দিয়ে মুরগির ছানা আর হাঁসের ছানা উভয় সন্তানদের মা হয়ে সব কটাকেই সামলাচ্ছে।

হাসু চিঠি নিল পিয়নের হাত থেকে। ডাকপিয়ন বললেন, 'ভাইজান এয়েছে শুনছি, তাঁর সাথে একটু দেখা না কইরে যাই কেমনে!' তিনি মুজিবের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। সেখানে গিয়ে ভিড়ের পাশে দাঁড়ালেন, শেখ মুজিব তাকে দেখেই 'আতর আলী নাকি কেমন আছ, তোমার বাবার শরীলটা কেমন আছে' বলে হাঁক পাড়লেন। চৈত্র মাস, রোদে আতর আলী পিয়নের সমস্ত গা

ঘর্মাক্ত, খাকি শার্ট ভিজে উঠেছে।

আতর আলী পিয়ন পানির গেলাসের দিকে হাত বাড়ালে মুজিব বললেন, 'খালি পেটে পানি খাইয়ো না, একটু গুড়-মুড়ি মুখে দিয়া তার পরে খাও '

ততক্ষণে হাসু চিঠি নিয়ে চলে এসেছে আব্বার কাছে। 'আব্বা, আব্বা, চিঠি এয়েছে, চিঠি'—পিয়নের সুর নকল করে সে বলল।

ইংরেজিতে নাম-ঠিকানা লেখা।

টু
মি. শেখ মুজিবুর রহমান, বি.এ.
ভিল. টুঙ্গিপাড়া,
পো. অ. পাটগাতী,
ডিট. ফরিদপুর।

ফ্রম
টি. হোসেন
৯, হাটখোলা রোড
পো.অ. ওয়ারী, ডেকা।

হলুদ খাম। তাতে উর্দুতে লেখা সরকারি খামের নকশা। মানিক ভাইয়ের চিঠি। মুজিব খাম ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। চশমাটা চোখে দিলেন। ইংরেজিতে লেখা চিঠি। মানিক ভাই লিখেছেন :

৯, হাটখোলা রোড
পো.অ. ওয়ারী, ডেকা।
২৯.৩.৫২

ডিয়ার ব্রাদার,

তোমার চিঠির জন্য অনেক ধন্যবাদ। ঢাকার পরিস্থিতি এখনো অনিশ্চিত। গ্রেপ্তার চলছেই। শামসুল হক ১৯ তারিখে আত্মসমর্পণ করেছেন। খালেক নেওয়াজ আর আজিজ আহমেদ ২৭ ও ২৮ তারিখে আত্মসমর্পণ করেছেন।

মওলানা সাহেবের কোনো খবর নেই। বহু আগে তাঁর কাছ থেকে আমরা খবর পেয়েছিলাম যে তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন।

আমরা সবাই তোমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। প্রত্যেকে তোমাকে চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দিচ্ছে। কেবল চিকিৎসা নেওয়ার জন্যই তোমার ঢাকা আসা উচিত। আমরা এই ব্যাপারে সব ব্যবস্থা নিয়ে রাখব।

আমি গভর্নর ভবনের ঠিক পূর্ব পাশে কমলাপুর বাজারে বাস করছি। এখানে তুমি সব সময়ই স্বাগত।

আমরা কোনোরকমে চালিয়ে যাচ্ছি। সাক্ষাতে কথা হবে। তোমার আব্বা-আম্মাকে আমার সালাম।

প্রীতিসহ
টি. হোসেন
২৯.৩.৫২

মুজিব চিঠিটা পড়লেন।

তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এর আগেও তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁকে ঢাকা আসতে বলেছেন। বলেছেন, চিকিৎসার জন্যই ঢাকা আসতে হবে। ঢাকায় শেখ মুজিব যদি বসেও থাকেন, তাতেও কাজ হবে।

আজও একই কথা। চিঠিটা আব্বাকে দেখানো দরকার। এটা দেখালে কাজ হতে পারে। লুৎফর রহমান চান না, অসুস্থ ছেলে ঢাকায় যাক। ছেলের হৃৎপিণ্ডে সমস্যা, নাকের ভেতরে ক্ষত। তার ওপর হলো আমাশা। ছেলের শরীরে কখানা হাড় ছাড়া কিছুই ছিল না। তালপাতার সেপাইয়ের মতো দেখাত তাকে। কয়েক দিন বাড়িতে থেকে শরীর কিছুটা ফিরেছে। এখনই তার ঢাকা যাওয়ার দরকার নাই, লুৎফর রহমান সাহেবের অভিমত।

এখন এ চিঠিটা দেখালে যদি আব্বার সদয় হন।

মুজিব ঘর থেকে বের হলেন। হাসিনা তার এক হাতের আঙুল ধরে আছে, কামাল এসে ধরল হাসিনার আঙুল। তিনজন ঘর ছেড়ে এসে উঠোনে দাঁড়ালেন। শেখ লুৎফর রহমান সাহেব কাঁঠালগাছের নিচে টঙের ওপরে বসে আছেন।

বসন্তের বাতাস বইছে। আজকের দিনটা মনোরম।

একটা সুপারিগাছ থেকে একটা পাতা খসে পড়ল সশব্দে। হাসিনা আর কামাল সেই পাতাটা কুড়ানোর জন্য ছুটে চলে গেল। মুজিব গিয়ে তাঁর পিতার পাশে দাঁড়ালেন।

কাঁঠালপাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে লুৎফর রহমানের মুখে পড়ে আলো-ছায়ার এক অপূর্ব আলপনা এঁকেছে। পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে মুজিব যেন অভয় পেলেন। আব্বার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা মায়া, শাসন, প্রশ্রয় আর পৃষ্ঠপোষকতার রসায়ন দিয়ে গড়া। পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালোবাসেন। আবার মুজিব একটু সমীহও করেন আব্বাকে। তাঁর কাছ থেকে এখনো নিয়মিত টাকা নেন তিনি। কখনো তাঁর কথার অবাধ্য হন না।

লুৎফর রহমানও তাঁর এই ছেলেটিকে গভীরভাবে ভালোবাসেন।

বছর চার-পাঁচ আগের একটা ঘটনা জীবনেও ভুলবেন না মুজিব। পাকিস্তান হওয়ার পর একবার কলকাতা গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে এলেন ঢাকায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বরিশালে জনসভা করবেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে। হিন্দুরা যাতে পূর্ব বাংলা ছেড়ে না যান, সেই আবেদন জানানোর জন্য। মুজিব তাঁর সঙ্গে স্টিমারে চললেন বরিশাল। বরিশালে জনসভা আরম্ভ হয়েছে। মুজিব বসে আছেন বক্তৃতার মঞ্চে, ঠিক সোহরাওয়ার্দীর পাশেই। তাঁকেও বক্তৃতা করতে হবে। রাত আটটার মতো বাজে। এই সময়ে একটা চিরকুট তাঁর হাতে এল। মুজিব চিরকুটটা খুললেন। মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাতের হাতের লেখা। তিনি লিখেছেন, 'মিয়াভাই, আব্বার অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি ভীষণ অসুস্থ। তোমার জন্য নানা জায়গায় টেলিফোন করা হয়েছে। যদি দেখতে হয়, রাতেই রওনা করতে হবে। হেলেন তোমাদের বাড়িতে চলে গিয়েছে।' মুজিব চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর চিঠিটা পড়ে শোনালেন সোহরাওয়ার্দীকে। তিনি বললেন, 'তুমি রওনা হয়ে যাও।'

সোহরাওয়ার্দী ভালোভাবেই চিনতেন লুৎফর রহমান সাহেবকে। গোপালগঞ্জে গিয়ে তিনি মুজিবদের বাড়িতে অবশ্যই ঢুঁ মারতেন। লুৎফর রহমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেন। একবার নির্বাচনের আগে গোপালগঞ্জ থেকে কাকে মনোনয়ন দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে লুৎফর রহমান সাহেবের পরামর্শও নিয়েছিলেন। পিতার অসুখের খবর শুনে মুজিব যে এই মুহূর্ত থেকেই বিচলিত বোধ করতে শুরু করেছেন, সেটা বুঝতে সোহরাওয়ার্দীরও বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। তিনি বললেন, 'মুজিব, তুমি এক্ষুনি রওনা হয়ে যাও।'

মুজিব মঞ্চ থেকে নামলেন। দেখা হয়ে গেল আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সঙ্গে। মুজিব তাঁকে বললেন, 'কখন খবর পেয়েছ?'

রব সাহেব বললেন, 'গতকাল খবর পেয়েছি। খবর শোনামাত্রই হেলেন রওনা হয়েছে। আমি ভেবে দেখলাম, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জনসভা

যেহেতু, কাজেই তুমি আসবেই। তাই তোমার জন্য এইখানে খোঁজ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হলো।'

মুজিব বললেন, 'চলো চলো। আর দেরি করা যাবে না। স্টিমার ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। এই রাতের স্টিমার ধরতে না পারলে পুরা একদিন পিছায়ে যাব।' মালপত্র নিয়ে তাঁরা চড়ে বসলেন বরিশাল-ঢাকার স্টিমারে। সারা রাত ঘুম এল না মুজিবের দুই চোখে। তিনি বসে রইলেন। আবদুর রব এলেন। বললেন, 'এত কী ভাবো, মুজিবর?'

মুজিব বললেন, 'আব্বার কথা ভাবি। কত স্নেহ পেয়েছি আব্বার কাছ থেকে। দুই বাপ-বেটা একসঙ্গে থেকেছি গোপালগঞ্জে, মাদারীপুরে। এখনো আব্বার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নেই, আমার কোনো সংকোচ লাগে না। আর আমি তো সংসারের কোনো খোঁজখবরই রাখি না। কত আঘাত এই জীবনে দিয়েছি আব্বাকে।'

স্টিমার চলছে। বিকট শব্দ হচ্ছে ইঞ্জিনের। স্টিমারের সার্চলাইট দূরের গ্রামগুলোর ওপর, নদীর অগাধ জলের ওপর পড়ছে, আবার সরে যাচ্ছে। অন্ধকার চিরে কোথায় চলেছে এই জাহাজ। ওই আকাশে ওই একটা তারা দেখা যাচ্ছে, ধ্রুবতারা। মুজিব মনে মনে বললেন, 'আব্বা, আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি। খুব।

ভোরবেলা পাটগাতী ঘাটে এসে জাহাজ থামল। আবদুর রব আর মুজিব নামলেন স্টিমার থেকে। ঘুমন্ত ঘাট জেগে উঠল। কয়েকজন যাত্রী উঠল জাহাজে, কয়েকজন নামল। দু-চারজন কুলি-জাতীয় লোক তৎপরতা শুরু করেছে। স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন ঘাটে।

মুজিব তাঁর কাছে গেলেন। বললেন, 'আমাদের বাড়ির কোনো খবর জানেন? আব্বা কেমন আছে, জানেন কিছু?' লোকেরাও ভিড় করে ঘিরে ধরল মুজিবকে। তারা সবাই বলল, 'আপনার আব্বার খুব অসুখ শুনেছি। তবে তিনি কেমন আছেন, সেটা জানি না।'

পাটগাতী থেকে টুঙ্গিপাড়ার আড়াই মাইল পথ। নদীপথে যেতে অনেক সময় লাগবে। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হবে যদি হেঁটে যাওয়া যায়। মালপত্র সব রাখা হলো স্টেশনমাস্টারের কাছেই। ঝাড়া হাত-পা নিয়ে মুজিব রওনা হলেন বাড়ির দিকে। চষা জমি মাড়িয়ে, মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছেন তাঁরা। মধুমতী নদী পার হলেন নৌকায়। তারপর আবার হাঁটা। খেতখামার ডিঙিয়ে তাঁরা পৌঁছালেন বাড়ির উঠানে।

তখন সকাল হচ্ছে। সূর্য কেবল উঠি উঠি। মুজিব ও আবদুর রবের ছায়া

লম্বা হয়ে পড়েছে উঠানে। তাঁরা বারান্দায় উঠলেন। আব্বার শয়নঘরে উঁকি দিলেন। এরই মধ্যে রেনু, মা ঘুম থেকে উঠেছেন। রেনু বললেন, 'এসেছ। যাও। ভেতরে যাও। আব্বাকে দেখো।'

'কী হয়েছে আব্বার?'

'কলেরা,' রেনু বললেন। শুনেই মুজিবের বুকটা ধক করে উঠল।

ডাক্তার বাবু লুৎফর রহমানের কবজি ধরে বসে আছেন। দেখা হওয়ামাত্র বললেন, 'নাড়ির অবস্থা ভালো না। বারবার পায়খানা হয়ে পেশাব বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সারা রাত এখানেই বসে আছি। বাকিটা ভগবানের কৃপা। আমি তো কোনো আশা দেখি না।'

মুজিব আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। পিতার বুকে মাথা রেখে বললেন, 'আব্বা।' লুৎফর রহমান চোখ মেলে তাকালেন। আবার চোখ বন্ধ করলেন। মুজিব কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অশ্রুতে আব্বার জামা ভিজে যেতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, 'আশ্চর্য তো, নাড়ি ঠিক হয়ে যাচ্ছে।'

লুৎফর রহমান সাহেবের পেশাব হলো।

ডাক্তার বললেন, 'আর ভয় নাই। পেশাব হয়েছে।'

দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই লুৎফর রহমান সাহেবের চেহারার মধ্যেও একটা সজীবতা ফিরে এল। ডাক্তার বাবু বললেন, 'এবার আমি যেতে পারি। সারা রাত ছিলাম।'

মুজিবের সঙ্গে তার আব্বার এমনি একটা অনির্বচনীয় যোগাযোগ আছে।

এখন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার চিঠি হাতে মুজিব দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর পিতার পাশে।

'আব্বা?' মুজিব বিনম্র স্বরে ডাকলেন।

'কী?' লুৎফর রহমান মুখ তুললেন।

'মানিক ভাইয়ের চিঠি। পড়েন।' মুজিব হাত বাড়িয়ে চিঠিটা দিলেন।

লুৎফর রহমান সাহেব চিঠিটা পড়লেন। তিনি চুপ করে রইলেন। কাঁঠালগাছ থেকে পাতা ঝরছে। মুজিব সেই শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। অবশেষে লুৎফর রহমান সাহেব মুখ খুললেন, 'যেতে চাও, যেতে পারো।'

মুজিবের বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল। তিনি কাঁঠালছায়া থেকে সরে এলেন। রোদ এসে লাগল গায়ে।

মুজিব কাঁঠালতলা থেকে এগিয়ে এলেন উঠোনের দিকে, 'হাসুর মা,

এদিকে আসো, মানিক ভাই চিঠি দিয়েছেন, চিকিৎসার জন্য ঢাকা যেতে বলেছেন, তুমি কী বলো?'

রেনু বললেন, 'ঢাকা গেলে তো তোমার শরীর আবার খারাপ করবে। তুমি খাবা না, বিশ্রাম নিবা না, খালি কাজ করবা, আর তোমার শরীর খারাপ করবে। হার্টের ব্যারাম, তার ওপর আবার আমাশা। আরও কয়েক দিন থেকে তার পরে যাও।'

'তা কয়েক দিন থাকি। এপ্রিলের মাঝামাঝি যাব। দুই সপ্তাহ থাকি।'

'আচ্ছা, তাহলে আপত্তি নাই।' রেনু বললেন।

মুজিব ঢাকা যাবেন। এবার আর ১৫০ মোগলটুলিতে ওয়ার্কার্স ক্যাম্পে উঠতে চান না তিনি। ওখানে এত লোক আসা-যাওয়া করে যে প্রাইভেসি বলতে কিছুই থাকে না। সবাই মিলে ওইভাবে বসবাস করারও একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, কিন্তু একটু বসে বই পড়ার, চিঠি লেখার, একটু জিরোনোর জন্যও তো খানিকটা পরিসর দরকার হয়।

আবদুল হামিদ চৌধুরী আর মোল্লা জালাল উদ্দিন মিলে তাঁতীবাজারে একটা বাসা ভাড়া নিয়েছেন। তাঁরা মুজিবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই নতুন বাসায় এসে উঠতে। মুজিব ঠিক করেছেন ওখানেই উঠবেন। যদিও মানিক ভাইও তাঁর ওখানে ওঠার জন্য চিঠিতে আহ্বান জানিয়ে রেখেছেন।

কারাগারে যাওয়ার আগে, আড়াই বছর আগে, মুজিবের বিছানা-বালিশ সব ছিল মোগলটুলির বাসায়। সেসব এখন কোথায় আছে, কে ব্যবহার করছে, কে জানে। আর বাসায় উঠতে গেলে খাট, বিছানা-বালিশ, টেবিল-চেয়ার কত কী লাগবে! কয়েক মাসের খরচও সঙ্গে রাখা দরকার। আর দরকার চিকিৎসা। সে জন্যও তো টাকা লাগবে। একটাই উপায়। আব্বার কাছে চাওয়া।

মুজিব আবার দাঁড়ালেন তাঁর আব্বার সামনে। বললেন, 'আব্বা, টাকা দরকার। সবকিছু নতুন করে কিনতে হবে, বিছানা-বালিশ-খাট। চিকিৎসার জন্যেও তো টাকা দরকার।'

আব্বা বললেন, 'আচ্ছা, নিয়ো।'

রেনু বলল, 'হাসুর আব্বা, নাও।'

তিনি আঁচলের গিঁট খুলছেন।

মুজিব জানেন রেনু কী দেবেন। তবু বললেন, 'কী?'

রেনু হাসিমুখে ভাঁজ করা কতগুলো টাকা মুঠো করে তুলে দিলেন মুজিবের

হাতে। মুজিব হেসে বললেন, 'রেনু, আমার উচিত তোমাকে টাকা দেওয়া উল্টা আমি তোমার কাছ থেকে নেই।'

রেনু বললেন, 'ও মা, আমি বুঝি তোমার পর। আমি তো চাকরি করি না। বাড়ির এখান থেকে ওখান থেকে টাকাটা জোগাড় করি। ধান বিক্রি করি। পাট বিক্রি করি। সরিষা বিক্রি করলাম। এসব তো তোমারই টাকা। তুমি চিকিৎসা করাও। সুস্থ হও। ভালো থাকো। এইটুকুই আমার চাওয়া। এর বেশি কিছু আমার চাওয়া নাই।'

হাসু জোরে জোরে কাঁদছে। বলছে, 'আব্বা, তুমি যাবা না।' তাই শুনে কামালও কান্না জুড়ে দিল, 'আব্বা, যাবা না। আব্বা, যাবা না।'

মুজিব হাসুকে কোলে নিয়েছেন। কামালও তার হাঁটু ধরে টানছে। মুজিব আরেক কোলে কামালকেও উঠিয়ে নিলেন। রেনু বললেন, 'হাসুকে আমার কোলে দাও। তোমার রোগা শরীরে তুমি দুজনকে একসাথে নিতে পারো নাকি?' তিনি হাত বাড়িয়ে হাসুকে নিতে গেলেন। সে হাত সরিয়ে নিল। আব্বার কোল থেকে সে কিছুতেই নামবে না। রেনু অগত্যা একরকম জোর করেই কামালকে নিজের কোলে টেনে নিলেন।

বাড়ির সামনে খালপাড়। খালে নিজেদের নৌকা বাঁধা। মুজিব সেই নৌকায় গিয়ে উঠলেন। তাঁর আব্বা ও আম্মা খালপাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রেনু কামালকে কোলে করে ঘাটে নামলেন মাটির সিঁড়ি বেয়ে। হাসিনা এখনো মুজিবের কোলে। সে কিছুতেই নামবে না। তার এক কথা, 'আব্বা, যাবা না।'

এবার হেলেন, মুজিবের বোন, নেমে এলেন ঘাটে। হাসিনাকে বললেন, 'মা, নাম তো। দেখ, তোর জন্য কী এনেছি। একটা লাল রঙের পাখি। চল তো, চল তো।'

হাসিনা একটু বিভ্রান্ত হলো। হেলেন তাকে কোলে করে নিয়ে খালপাড়ের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

এই সুযোগে নৌকা ছেড়ে দিল।

জোয়ার এসেছে। নৌকা ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। পানি চিরে নৌকা চলল। লগি ঠেলতে লাগল মাঝি। ঘাট পেছনে ফেলে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে।

মুজিব আপন মনেই আবৃত্তি করতে থাকলেন, 'যেতে নাহি দেব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, হায় তবু চলে যায়...'

রেনু খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নৌকা চলে গেছে। পানিতে ঢেউ উঠেছিল। সেই দাগও মিলিয়ে গেল। এখন ওই জায়গাটা ফাঁকা।

রেনুর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠছে। তিনি চোখ মুছে বাড়ির দিকে গেলেন। কেউ তাঁর চোখের জল দেখে ফেললে সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে।

মুজিব বসে আছেন আওয়ামী লীগের নতুন অফিসে। নবাবপুরে এই অফিস। এই বাড়ির দুটো কামরায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া থেকেছেন কিছুদিন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আওয়ামী লীগ অফিসে একটা টেবিল, গোটা তিনেক চেয়ার, একটা লম্বা টুল। সেইসব চেয়ারের একটায় বসে আছেন মুজিব। আর আছেন কামরুজ্জামান সাহেব। বিকেলবেলা। অফিস তবু ফাঁকা। পিয়ন আব্বাস আলী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এই অফিসে ইদানীং কেউ আসতে চায় না। নেতারা বেশির ভাগই কারাগারে। ধরপাকড় এখনো চলছে।

মুজিবের মাথা থেকে কিছুতেই এই দুশ্চিন্তা যায় না যে, তাঁর লিডার উর্দুর পক্ষে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন। ঢাকায় এসে সরকার-সমর্থক কাগজগুলোয় প্রকাশিত লিডারের সেই বিবৃতি তিনি নিজের চোখেই দেখতে পেলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কোনো পরামর্শই মুজিব অমান্য করেন না। মুজিবের কাছে পিতার মতোই প্রিয় হলেন সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু এবার আর উপায় নাই। শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দীর মতের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে। লিডার আসলেই বাংলার মানুষের মনমানসিকতা ধরতে পারছেন না। তিনি কী বলছেন? বাঙালিকে উর্দু শিখতে হবে। কোন দুনিয়ায় যে আছেন তিনি!

কামরুজ্জামান সাহেব বলেন, 'কী হয়েছে, মুজিব ভাই? কোনো খারাপ খবর?'

মুজিব বলেন, 'না, খবর খারাপ না। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। কী বলেন?'

কামরুজ্জামান বলেন, 'না করলে শাসকেরা নিজেরাই ঠকবে।'

'হ্যাঁ, আমিও তা-ই বলি। সারা দেশে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা জেগেছে। আর বাঙালিকে দাবায়া রাখতে পারবে না।'

খুব বৃষ্টি হচ্ছে। বৈশাখের এই দিনে এত বৃষ্টি! বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সমবেত হয়েছেন চার-পাঁচ শ মানুষ। কামরুদ্দীন আহমদ, আতাউর রহমান খানসহ অনেকেই উপস্থিত আছেন। রাষ্ট্রভাষা পরিষদের উদ্যোগে সর্বদলীয় কর্মী পরিষদের একটা সভা হচ্ছে। সভায় কে কী বলেন, তারই নোট নিতে এসেছেন একজন গোয়েন্দা। তিনিও কর্মী সেজে স্লোগান ধরছেন, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। আর কাগজ বের করে মাঝেমধ্যে নোট নিচ্ছেন

কে কী বলছেন। তাঁর একটা সমস্যা হচ্ছে। পথে তাঁর নোট বই ভিজে গেছে। ভেজা কাগজে পেনসিল দিয়ে নোট নিতে হচ্ছে। কলম চালানো যাচ্ছে না।

আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি বললেন, 'এবার ভাষণ দেবেন সদ্য কারামুক্ত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা শেখ মুজিবের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আতাউর রহমান খান বললেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব সবার শেষে ভাষণ দেবেন। তা না হলে আপনারা আর কারও বক্তৃতা শুনবেন বলে মনে হচ্ছে না।'

আতাউর রহমান খান তার লিখিত ভাষণ পাঠ শুরু করলেন। অর্ধেকটা পড়া হয়েছে এই সময় প্রচণ্ড গরমে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। ধপাস শব্দ করে তিনি পড়ে গেলেন চেয়ার থেকে। সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের আরেকটা ঘরে। সেখানে তাঁর মাথায় আর চোখেমুখে পানি দেওয়া হতে লাগল। মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরছে। তা সত্ত্বেও দুজন দুটো ফাইল দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

কামরুদ্দীন সাহেব ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি সভাপতির লিখিত ভাষণের বাকিটা পাঠ করে শোনালেন।

সভাপতির ভাষণের পরে এল শেখ মুজিবের বক্তব্য দেওয়ার পালা।

তিনি বললেন, 'দীর্ঘ আড়াই বছর কারাবাসের পর আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা যখন ভাষাসংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, আমি তখন কারাগারে অনশনরত। আমি যখন জেলে অনশন করছিলাম, তখন আমার ছাত্রবন্ধুদের ওপরে গুলি চালানোর খবর পাই। ছাত্রদের এ ত্যাগ বৃথা যাবে না। আপনারা সংঘবদ্ধ হোন। মুসলিম লীগের মুখোশ খুলে ফেলুন। এই মুসলিম লীগের অনুগ্রহে মওলানা ভাসানী, অন্ধ আবুল হাশিম ও অন্য কর্মীরা আজ কারাগারে। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না। বাঁচতে চাই, লেখাপড়া করতে চাই। ভাষা চাই। মুসলিম লীগ সরকার আর *মর্নিং নিউজ* গোষ্ঠী ছাড়া সবাই বাংলা ভাষা চাই।

গুড়ুম করে আওয়াজ হলো। বজ্রপাত হলো কোথাও। সবাই স্লোগান ধরল, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই'।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক তাঁর রিপোর্টে লিখলেন:

'শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদা দেওয়ার সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব বাতিল করে দেন, তাদের প্রধান দাবি হলো, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।'

ইংরেজিতে লেখা এই প্রতিবেদন গোয়েন্দা ভদ্রলোক তাঁর অফিসে পেশ করেন।

শেখ মুজিবের বক্তৃতা শেষ। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে সভাও সমাপ্ত হয়ে গেল সারা দেশ থেকে আসা কর্মীরা ছেঁকে ধরল তাঁকে। তিনি সবার সঙ্গে কথা বলছেন। অনেকেরই নাম তিনি জানেন, কে কোত্থেকে এসেছে, তাঁর মুখস্থ, তিনি তাদের ব্যক্তিগত কুশল জিগ্যেস করলেন। অন্য বক্তারা চলে গেলেও বেশ খানিকক্ষণ কর্মী-পরিবেষ্টিত অবস্থায় রইলেন তিনি। তারপর বেরিয়ে এলেন হল থেকে। তিনি আতাউর রহমান সাহেবের খোঁজ করলেন। জানা গেল, তিনি সুস্থ বোধ করায় তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

কর্মীরাই একটা ঘোড়ার গাড়ি ধরে আনল। 'মুজিব ভাই, ওঠেন।' তিনি উঠলেন। যাবেন তাঁতীবাজার। তাঁর সঙ্গে আছেন মোল্লা জালালউদ্দিন। বৃষ্টি হচ্ছে প্রচণ্ড। টমটমের ছাদ বৃষ্টির ছাট আটকাতে পারছে না। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে টমটমে উঠে বসা মুজিবের স্যান্ডেল। বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে তাঁর চোখেমুখে। তিনি হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ছুঁতে লাগলেন। ভেজা হাত মুখে বোলালেন। ঘোড়া ছুটে চলেছে ঠকঠক শব্দ তুলে। বাতাস এসে লাগছে মুজিবের চোখেমুখে।

তাঁর খুব আরাম বোধ হচ্ছে।

সোহরাওয়ার্দীর বাংলা ভাষাবিরোধী অবস্থানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার পর মুজিবের নিজেকে খানিকটা হালকা বলে মনে হয়। আহ্, কী একটা পাষাণভারই না তাঁর মনের ওপর এই কটা দিন চেপে বসেছিল।

পরের দিন, ২৮ এপ্রিল ১৯৫২, আওয়ামী মুসলিম লীগের এক সভায় শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ভার দেওয়া হলো। কারণ, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক কারাগারে। এই সভায়ও আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করলেন।

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পর শেখ মুজিব একটা সাংবাদ সম্মেলন ডাকলেন।

তাতে তিনি বললেন, 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে। সব রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদ পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং যারা অন্যায়ভাবে বাংলার মানুষের ওপরে জুলুম করেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার বলছে, বিদেশি রাষ্ট্রের উসকানিতে আন্দোলন হয়েছে। সরকারকে এই কথা প্রমাণ করতে হবে। হিন্দু ছাত্ররা কলকাতা থেকে

পায়জামা পরে এসেছে, এসে আন্দোলন করেছে, এই কথা বলতেও আপনাদের বাধে নাই। আমি সরকারকে জিগ্যেস করি, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সবাই মুসলমান কি না! যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের ৯৯ শতাংশই মুসলমান কি না! এত ছাত্র কলকাতা থেকে এল, হাজার হাজার ছাত্র, তাদের একজনকেও যে সরকার ধরতে পারে নাই, তাদের ক্ষমতায় থাকার কোনোই অধিকার নাই।'

এর কয়েক দিনের মধ্যেই শেখ মুজিবের হাতে এসে পৌঁছাল একটা চিঠি।

চিঠিটা লিখেছেন সোহরাওয়ার্দী সাহেব। ইংরেজিতে লেখা চিঠি।

৫৬, ক্লিফটন
করাচি
২২.৪.৫২

আমার প্রিয় মুজিবুর,

ওপরওয়ালাকে ধন্যবাদ যে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তুমি অসুস্থ জেনে আমি দুঃখিত। তুমি যদি করাচি আসতে চাও, যে উপায়েই হোক না কেন, চলে এসো। এতে তোমার স্বাস্থ্যের উপকার হতে পারে। খুবই ভয়ংকর কথা যে তারা সব জায়গার আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে অথচ আমরা কিছু করতে পারছি না। আর কতকাল আমাদের জনগণকে এই দুঃখকষ্ট সইতে হবে? আল্লাহ সবই দেখছেন নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবেন। আমি মনে করি, রাষ্ট্রভাষা-বিতর্ক অর্থহীন এবং বাস্তবে পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে, যদি না তারা ব্যাপারটাকে বাদ দিতে পারে। খুব খারাপ হলেও আমরা যেটা করতে পারি, আমরা আঞ্চলিক রাষ্ট্রভাষা পেতে পারি, বাংলার জন্য বাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য উর্দু, আর ইংরেজিকে কিছু দিন চালিয়ে নিতে পারি আন্তপ্রাদেশিক ভাষা হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে। কিন্তু আমি পরামর্শ দেব, বাংলার মুসলিমদের বাধ্যতামূলকভাবে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে উর্দু শিখতে হবে। আমি যদি ভুল বলে না থাকি, তাদের ঠিকভাবে বোঝানো গেলে তারা আপত্তি করবে না।

তোমারই শহীদ সোহরাওয়ার্দী

চিঠি পেয়ে মুজিব বুঝলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিবৃতি বিকৃত করে পত্রিকায় ছাপানো হয় নাই। পূর্ব বাংলার মানুষকে উর্দু শিখতে হবে, এটাই

তাঁর মনের কথা। তাঁর মতো একজন বিবেকবান মানুষ এই রকম কথা বলতে পারলেন! তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কত বড় ভুল তিনি ভাবছেন, ব্যাপারটা তাঁকে বোঝানো দরকার।

১৪

মওলানা ভাসানীর কাছে আজকে একটা বিচার এসেছে।

বিচারপ্রার্থী স্বয়ং জেলার মাখলুকুর রহমান।

মওলানা ভাসানী থাকেন কারাগারের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে। তাঁর এলাকাটা পর্দাঘেরা। বর্ষীয়ান এই নেতা আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি, বুজুর্গ ব্যক্তি, যার কিনা অনেক মুরিদ আছে, যারা তাঁর কাছ থেকে পানি-পড়া নেয়, এই রকম একজন মানুষকে আলাদা সম্মান দেওয়াটাকে জেল কর্তৃপক্ষ কর্তব্য বলেই মনে করেছে।

মওলানা ভাসানী কারাগারের সবার ভালো-মন্দের খোঁজখবর নিয়ে থাকেন। কারাগার এখন ভর্তি ভাষাসংগ্রামীদের দিয়ে। মওলানা ভাসানী তো আছেনই, আছেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আবুল হাশিম, শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, খালেক নেওয়াজ খান। নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত পরিবারের প্রধান কর্তা খান সাহেব ওসমান। তাঁকে সবাই ডাকে চাচা বলে। কারণ, তাঁর ছেলে শামসুজ্জোহা যুবলীগের সহসভাপতি। যুবলীগের আরেকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট তোয়াহা আর সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদও কারাগারে। তাঁরা সারাক্ষণ ওসমান সাহেবকে চাচা বলে ডাকেন, কাজেই তিনি এখন কারাগারের সবার চাচা। খয়রাত হোসেন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। তিনি থাকেন চাচার পাশের খাটে।

খয়রাত হোসেন এক কাণ্ড করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম থাকেন মহিলা ওয়ার্ডে। এরই মধ্যে তিনি রাজবন্দী ও ভাষাসংগ্রামী হিসেবে ডিভিশন পেয়েছেন। তবে, তিনি একাই রাজবন্দী বলে ওই ওয়ার্ডে কোনো সংবাদপত্র যায় না। আইন

হলো, তিনজন রাজবন্দীর জন্য একটা করে কাগজ। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে *আজাদ, সংবাদ* ও *স্টেটসম্যান*—তিনটা দৈনিক পত্রিকা আসে। কারণ, এই ওয়ার্ডে রাজবন্দী অনেক। কারা কর্তৃপক্ষের কাছে মমতাজ বেগম পত্রিকা দাবি করলেন তখন ঠিক করা হলো, ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে *স্টেটসম্যান* পত্রিকাটি এক দিন পর মহিলা ওয়ার্ডে মমতাজ বেগমের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তিনি আবার সেটা পড়া হয়ে গেলে তার পরের দিন ফেরত দেবেন। উত্তম ব্যবস্থা।

চাচা একদিন লক্ষ করলেন, খয়রাত সাহেবের *স্টেটসম্যান* পত্রিকাটা মমতাজ বেগমকে পাঠানোর ব্যাপারে খুবই উৎসাহ। ব্যাপার কী?

জমাদার পত্রিকাটা নিয়ে যাচ্ছে মহিলা ওয়ার্ডে পাঠাবে বলে। চাচা বললেন, 'এই, আনো তো দেখি পত্রিকাটা।' তিনি দেখলেন, পত্রিকার পাতায় খয়রাত সাহেব লিখে রেখেছেন, 'সুইট হার্ট'।

চাচা কিছু বললেন না।

কিন্তু পরের দিন যখন এই পত্রিকা ফেরত এল, তিনি দেখলেন, ওপাশ থেকে উত্তর এসেছে, 'সুইট লাভ'।

চাচা দেখছেন, খয়রাত সাহেবের উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। কাগজ পড়া হওয়ার আগেই মহিলা ওয়ার্ডে পাঠানোর জন্য তিনি উশখুশ করছেন।

ব্যাপারটা লক্ষ করে তিনি একটা কৌতুক করার আয়োজন করলেন। খয়রাতের সঙ্গে তাঁর রসিকতার সম্পর্ক। পরস্পরকে তাঁরা ডাকেন বিয়াই বলে। এইটাই সুযোগ। চাচা একটা চিঠি লিখলেন খয়রাত সাহেবের স্ত্রীর উদ্দেশে। তাঁকে বেয়াইন বলে সম্বোধন করে লিখলেন :

> বেয়াইন সাহেব,
>
> সালাম নিবেন। আশা করি ভালো আছেন। আমরাও এখানে জেলখানায় খুব ভালো আছি। আপনার স্বামী খয়রাত হোসেন জেলখানায় দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। পাত্রী খুবই সুন্দরী ও শিক্ষিত। তিনিও জেলখানার রাজবন্দী। জেলখানায় এইরূপ আইন আছে যে এক রাজবন্দী আরেক রাজবন্দীকে বিবাহ করিতে পারে। যাই হোক, এই বিবাহে আপনিও আমন্ত্রণ পাইতে পারেন। তবে, আপনার বেয়াই হিসাবে আমার দুশ্চিন্তা, বিবাহের পরে পুত্রকন্যা লইয়া আপনার কী অবস্থা হইবে। তবে, জেলার সাহেব ইচ্ছা করিলে এই বিবাহ বন্ধ করিতে পারেন।
>
> ইতি, খান সাহেব ওসমান আলী

এই চিঠি চলে গেল খয়রাত সাহেবের রংপুরের বাড়িতে।

এই চিঠি পেয়ে মিসেস খয়রাতের তো মাথাখারাপ অবস্থা। তিনি কান্নাকাটি করতে লাগলেন। তাঁর দুলাভাই বিশিষ্ট আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা দবির উদ্দিন। দবির উদ্দিন শ্যালিকার কান্নাকাটি দেখে চিঠি লিখলেন জেলার সাহেবকে। বললেন, এই বিয়ে যেমন করে হোক বন্ধ করতে হবে। আর যদি জেলার সাহেব বিয়ে বন্ধ করতে না পারেন, তবে মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে বিচার দেওয়া হবে।

জেলার মাখলুকুর রহমান ছোটখাটো মানুষ। ভাসানীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘামছেন। তিনি বললেন, 'হুজুর, নুরুল আমিন সাহেবের কাছে বিচার গেলে আমার চাকরি আপনা-আপনি চলে যাবে। কারণ, জেলের চিঠি বাইরে যাচ্ছে, এই কথা জানাজানি হওয়ার পরে আর আমার চাকরি থাকে না।'

তিনি করুণ মুখে এই কথা বললেন।

ভাসানী ডাকলেন চাচাকে। ডাকলেন খয়রাত ভাইকে। আরও কয়েকজন বন্দীও একটা উত্তেজনাকর কিছু ঘটছে আঁচ করে ভিড় করেছে।

প্রথমে তো সবাই হাসাহাসি করতে লাগল।

কারণ, খয়রাতও কোনো দিন মমতাজকে দেখেননি।

মমতাজও কোনো দিন খয়রাতকে দেখেননি। তা ছাড়া মহিলা ওয়ার্ডে মমতাজের কয়েকজন ছাত্রীও বন্দী হয়ে আছে। তারাও শিক্ষিত। *স্টেটসম্যান* পড়তে পারে। তাদের যে কেউই এইসব 'সুইট হার্ট'-জাতীয় কথা লিখতে পারে।

কিন্তু যেই না জেলার সাব কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতে লাগলেন 'হুজুর, আমার চাকরি বাঁচান', তখন সবাই এ ব্যাপারটা যে গুরুতর, সেটা বুঝতে পেরে চুপ মেরে গেল।

খয়রাত সাহেব তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। একটা কথাও বলছেন না।

ভাসানী মুখ খুললেন, 'এই মিয়া ওসমান, ইয়ারকি-ফাজলামো তো ভালোই করছ। অহন ঠেলা সামলাও। লও, আর একখান চিঠি লিখো তোমার বেয়াইনরে। সব খুইলা কও। কও যে বেয়াইনের লগে একটু ইয়ারকি-ফাইজলামো করছ। এই রকম কিছুই ঘটে নাই। আর জানায়া দেও, জেলখানায় বন্দী-বন্দিনীর মইধ্যে শাদি হওনের নিয়ম নাই।'

ওসমান চাচা বললেন, 'আচ্ছা, এখনই চিঠি লিখতাছি।'

ভাসানী বললেন, 'খালি চিঠি লিখলেই হইব না। তোমার জরিমানা হইল ২৫ টাকা।'

ওসমান সাহেব বড়লোক মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে ২৫ টাকা হস্তান্তর করলেন।

সেটা জেলারের হাতে তুলে দিয়ে ভাসানী বললেন, 'মিঠাই লইয়া আহেন মিয়া, যান। শুনেন, সীতারাম ভান্ডার থাইকা মিষ্টি আনবেন।'

মিষ্টি এল। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সবাই মিলে সেই মিষ্টি খেলেন।

জেলার সাহেব খয়রাত সাহেবকে দেওয়ানি ওয়ার্ডে বদলি করলেন। ওইটা রীতিমতো যেন বেহেশতখানা। ওটা আসলে বন্দী রাখার জন্য তৈরি হয়নি। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে বন্দীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় কিছুসংখ্যক ভাষাসংগ্রামীকে ওখানে রাখা হয়েছে। ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় যেন এটা। সামনের বাগানে থরে থরে গোলাপ, লিলি, বেলি ফুল ফুটে আছে। আমগাছের নিচে সিমেন্টের প্রশস্ত বেঞ্চ।

ভাষাসংগ্রামীদের জেলের সবাই শ্রদ্ধা করে। ভালো রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু খুবই করুণ হালে রাখা হয়েছে কমিউনিস্টদের। তাদের রাখা হয় গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি করে। তাদের না দেওয়া হয় সংবাদপত্র, না দেওয়া হয় নিজস্ব কাপড়চোপড় পরার সুযোগ। তারা জেলে বানানো মোটা কাপড় পরে। না খেয়ে না দেয়ে শুকিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যেন।

এবার ওসমান সাহেবের পাশে সিট হলো আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের। তিনি নানা ধরনের কাণ্ড করছেন। সারা রাত জিকির করেন।

একদিনের ঘটনা। অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সবাই যে যাঁর বিছানায় শুয়ে গল্প করছেন।

হঠাৎ চিৎকার। আওয়ামী মুসলিম লীগেরই শওকত একটা বিশাল ডাব মাথার ওপরে দুই হাতে ধরে আছেন, ছুড়ে মারবেন শামসুল হকের মাথায়। শামসুল হকের কোনো ভাবান্তর নেই। দুজনের মধ্যিখানে অলি আহাদ। শওকত বলে চলেছেন, 'তরে আইজ মাইরাই ফালামু। তর জন্য কী না করছি। পাইছস কী?'

এই শওকত আলী ৫০ মোগলটুলীর ওয়ার্কার্স ক্যাম্পের রক্ষক। এখানেই কামরুদ্দীন, তাজউদ্দীনরা বামপন্থী মুসলিম লীগ সংগঠিত করেছিলেন। শামসুল হক এই বাড়িতেই থাকতেন বিয়ের আগে পর্যন্ত। শেখ মুজিবও কলকাতা থেকে এসে এই বাড়িতেই উঠতেন। শওকত মুজিবকে খাতিরও করেছেন খুব। তাঁর জন্য আলাদা রুমের ব্যবস্থা করেছেন সেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরেই। মুসলিম লীগের গুন্ডারা ও সরকার এই বাড়িটা দখল করার চেষ্টা করেছে অনেকবার, শওকতের জন্যই পারেনি।

ঘটনা কী?

ঘটনা হলো, শামসুল হক সাহেবের মাথায় গন্ডগোল দেখা দিয়েছে। এর আগে শেখ মুজিবও জেলখানায় তাঁর পাশে থাকতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, সারা রাত তিনি বিকট শব্দে জিকির করেন বলে। তাঁর স্ত্রী আফিয়া খাতুন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, শেখ মুজিব তাঁর জন্য জেলের বাগানের ফুল তুলে মালা গেঁথে দিতেন শামসুল হকের হাতে। কিন্তু শামসুল হক ব্যবহার করতেন অস্বাভাবিক। তিনি দেখা করতে যেতে চাইতেন না। গেলেও কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতেন। ইদানীং তাঁর মাথায় এসেছে যে তাঁর কাছে ফেরেশতা আসে। তারা তাঁকে নানা বাণী দিয়ে যায়। একদিনের ঘটনা। ওসমান চাচা ও শামসুল হক পাশাপাশি বিছানায় থাকেন। ওসমান চাচার একটা পোষা বিড়াল ছিল। কয়েক দিন ধরে সেটা আসছিল না। হঠাৎই বিড়ালটা তাঁর বিছানার ওপর একদিন লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শামসুল হক চিৎকার করে উঠলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...'

ওসমান সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কী হয়েছে?'

শামসুল হক বললেন, 'আল্লাহর ফেরেশতা এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন না?'

ওসমান চাচা হো হো করে হেসে ফেললেন।

শামসুল হক ঘন্টার পর ঘন্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা চলে যায়, তিনি বিরামহীনভাবে দণ্ডায়মান। সমস্ত গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, তার খেয়াল নেই। গেঞ্জি-পায়জামা ভিজে জবজবে হয়ে যায়। কেউ কিছু বললে তিনি জবাব দেন না। তাঁর কাছে নাকি ফেরেশতারা আসে। তিনি আল্লাহর দিদার লাভ করেন। এই রকমই একটা সময় শওকত গেছেন তাঁর কাছে, 'আপনি কি ডাব খাবেন?'

শামসুল হক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত এক ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছেন।

শওকত সাহেব তাই রেগে গেছেন। ওই ডাব তিনি শামসুল হকের মাথায় ভাঙবেন। অলি আহাদ অনেক কষ্টে শওকতকে নিবৃত্ত করলেন।

আফিয়া খাতুন আবার এসেছেন। শামসুল হককে ডাকতে জেলগেট থেকে এসেছে একজন সেপাই। শামসুল হক পাঞ্জাবি টেনে নিলেন। একটা হাত পাঞ্জাবিতে ঢুকিয়ে মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেপাই তাঁকে তাড়া দিল। তখন তিনি আরেকটা হাত ঢোকালেন এবং আরও ১০ মিনিট পার করলেন। ৪০ মিনিট পরে প্রায় জোর করেই তাঁকে জেলগেটে নেওয়া হলো। তিনি আফিয়া খাতুনের হাত ধরলেন এবং নীরব হয়ে গেলেন। একটা কথাও বললেন না।

এর পর থেকে আফিয়া খাতুন আর আসেননি জেলগেটে।

আফিয়া খাতুন ধরলেন আতাউর রহমান খান ও কামরুদ্দীন আহমদকে। 'আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন সাহেবের কাছে যাই। শামসুল হককে মুক্তি দিক। ও তো অসুস্থ। ওর চিকিৎসা দরকার।' আতাউর রহমান খান লম্বা শেরওয়ানি আর কামরুদ্দীন সাহেব কোর্ট-প্যান্ট পরে চললেন নুরুল আমিনের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী ফাইল দেখছিলেন। ৪৫ মিনিট ধরে দুজনে বোঝালেন যে শামসুল হকের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটছে। তাঁকে মুক্তি না দিলে তিনি মারা যাবেন।

নুরুল আমিন মাথা না তুলে বললেন, 'আপনাদের কথায় তার মুক্তি হবে না। আইজি প্রিজন্স তো আমাকে কিছু জানায়নি।'

কামরুদ্দীন আহমদ বললেন, 'ওনার পক্ষে তো মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি রিপোর্ট করা সম্ভব না। আপনি আমাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে তার কাছ থেকে রিপোর্ট চান।'

নুরুল আমিন বললেন, 'আপনাদের কথামতো চললে সরকার চালানো যাবে না।'

নুরুল আমিন সরকার আওয়ামী মুসলিম লীগকে ভীষণ ভয় পায়। তারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনকেই অন্তরীণ রাখতে চায়। এবং সাধারণ সম্পাদক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এটা মুসলিম লীগ সরকারের জন্য একটা বিরাট উপশম বলে প্রতিভাত হয়।

১৫.

আনিসুজ্জামানের হাতে একটা *মর্নিং নিউজ*। একটা এক কলাম খবর, বক্স করে ছাপানো। শিরোনাম—'*শেলীজ ওন শপ*'। খবরে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ওরফে শেলী, যিনি ১৯৫১ সালে ইতিহাসে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন, তিনি যোগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে। পুলিশ রিপোর্ট খারাপ হওয়ায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করেছে। প্রতিবাদে তিনি

গলায় ট্রে ঝুলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সিগারেট বিক্রি করছেন। তার সেই ভ্রাম্যমাণ দোকানের নাম দিয়েছেন 'শেলীজ ওন শপ'।

আনিসুজ্জামান বেরিয়ে পড়লেন শেলীজ ওন শপের সন্ধানে। ভ্রাম্যমাণ দোকান। কখন কোথায় যায়, কে জানে। আনিসুজ্জামান একে-ওকে জিগ্যেস করলেন, কেউ শেলী সাহেবের দোকান দেখেছে কি না!

সন্ধ্যার সময় কলাভবনের গেটের বাইরে দেখা মিলল দোকানের, এবং ঝুলন্ত দোকানের মালিক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের। 'আমার নাম আনিসুজ্জামান, জেলখানায় আপনার রুমমেট ছিল যে নেয়ামাল বাসির, সে আমার বিশেষ বন্ধু, ছাড়া পেয়ে সে প্রথম আমাদের বাসায় এসেই উঠেছে।'

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সঙ্গে সঙ্গেই আনিসুজ্জামানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আসুন আসুন, নেয়ামাল বাসির খুব ভালো মানুষ।'

আনিসুজ্জামান বললেন, 'পুলিশ রিপোর্ট খারাপ দেওয়ায় আপনাকে চাকরিচ্যুত করল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অবস্থা নাকি?'

'আপনিও *মর্নিং নিউজ* পড়েছেন নাকি? না না, ওরা ঠিক লেখেনি। আমি যখন জেলখানায়, তখন ডিপার্টমেন্টে বেশ একটা অস্বস্তি তৈরি হয়। সেটা জানার পর আমিই চাকরি ছেড়েছি। আমাকে কেউ চাকরিচ্যুত করেনি। সিগারেট নেবেন?'

'না। আমি তো স্মোক করি না।' আনিসুজ্জামান বললেন।

কলাভবনের সামনের আমগাছের ডালে ব্যাঙমা আর ব্যাঙমি বলাবলি করতে লাগল, 'এই হাবিবুর রহমান একদিন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হইবেন, তারপর সরকারের প্রধানও হইবেন কিছুদিনের লাইগা, কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে।'

১৬.

তাঁতীবাজারে ভাড়া বাসায় থাকেন শেখ মুজিব। তাঁরা থাকেন নিচতলায়। এই বাসায় আরও থাকেন আবদুল হামিদ চৌধুরী, মোল্লা জালালউদ্দিন আর আবুল

হুসেন। তাঁরা সবাই আইনের ছাত্র। কেউ পাস করেছেন, কেউ পড়ছেন রান্নার জন্য লোক রাখা আছে। নিয়মিত রান্না হয়, বন্ধু বা অতিথি কেউ এই বাড়িতে এলে এদের চমৎকার ব্যবহার আর গরম মাছ-ভাতের আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হয়েই তবে ফিরতে পারে।

শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়মিত রুটিন হলো সকালবেলা নবাবপুরে পার্টি অফিসে যাওয়া। সেখানে অফিসের কাজকর্ম সেরে চিঠিপত্র মুসাবিদা করা হলে স্বাক্ষর করে জেলায় জেলায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। কর্মী-সমর্থক কেউ এলে তাদের সময় দেওয়া। এই বাড়িতেই *ইত্তেফাক*-এর কর্ণধার তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াও সপরিবারে থাকেন। *ইত্তেফাক* এখন খুবই জনপ্রিয়। কাগজের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। সেটাও একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে মানিক মিয়ার এবং শেখ মুজিবের। কারণ যত বিক্রি বাড়ছে, তত লোকসান। বিজ্ঞাপন তো পাওয়া যায় না। অতএব শেখ মুজিবকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তিনি সমর্থকদের বাড়ি বা অফিসে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। *ইত্তেফাক*-এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। দুপুর দুটোর দিকে ফিরে আসেন তাঁতীবাজারের বাড়িতে। পুরোনো আদালতের পেছনে এই বাড়ি। মধ্যাহ্নভোজ সেরে ছোটখাটো একটু ঘুম দেন। বিকালবেলা পার্টির কর্মী আর বন্ধুবান্ধব এসে ভিড় করে। এই বাড়ির অন্য বাসিন্দারাও সবাই পার্টির জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করেন। ফলে তাঁদের আড্ডা জমে ভালো। চারটা-পাঁচটার মধ্যেই সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েন পার্টির কার্যালয়ের উদ্দেশে। আটটা-নটা পর্যন্ত পার্টি অফিস জমজমাট থাকে।

পার্টি অফিসে বসে মুজিব চিঠিপত্র লেখেন পার্টির বিভিন্ন জেলা শাখার নেতাদের। তাতে থাকে সাংগঠনিক পরামর্শ।

তিনি একটা চিঠি লিখলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজের মাকে। খালেক নেওয়াজ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী।

খালেক নেওয়াজের মাকে আম্মা সম্বোধন করে তিনি লিখলেন :

আম্মা,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম নিবেন। আপনি আমাকে জানেন না—তবু লিখতে বাধ্য হচ্ছি। আপনার ছেলে খালেক নেওয়াজ আজ জেলখানায়। এতে দুঃখ করার কারণ নাই। আমিও দীর্ঘ আড়াই বৎসর কারাগারে কাটাতে বাধ্য হয়েছি। দেশের ও জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্যই আজ সে জেলখানায়। দুঃখ না করে গৌরব

করাই আজ আপনার কর্তব্য। যদি কোনো কিছুর দরকার হয়, তবে আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আমি আপনার ছেলের মতো। খালেক নেওয়াজ ভালো আছে। জেলখানা থেকেই পরীক্ষা দিচ্ছে। সে মওলানা ভাসানী সাহেবের সাথে আছে।

আপনার স্নেহের
শেখ মুজিবুর রহমান।

আজ দুপুরে একটা দাওয়াত আছে শেখ মুজিবের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকর্মী মোশারফ হোসেন চৌধুরী এমএ পাস করেছে। তাই সে নেমন্তন্ন করেছে মুজিবসহ তাঁর প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষকে। গেন্ডারিয়ায় তাঁর বাড়ি। বাবা-মার সঙ্গে থাকে সে। বেলা একটার দিকে মুজিব মোশারফের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন।

শেখ মুজিবের গায়ে পপলিনের সাদা শার্ট, পরনে সাদা পায়জামা, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। অতিথিদের একজন আরেকজনকে ফিসফিস করে বলল, 'মুজিব ভাই তো অসুখের পরে বেশ ভারিক্কি হয়েছেন।'

এই অতিথিদের মুজিব আগে থেকেই চেনেন। তিনি পুরোনো মানুষদের সঙ্গে এই পুনর্মিলনীতে খুব খুশি। খাওয়াদাওয়া হলো, গল্পগুজব হলো তারও চেয়ে বেশি।

কথায় কথায় মুজিব বলতে লাগলেন বিনা টিকিটে রেলগাড়িতে দিল্লি থেকে কলকাতা ফেরার গল্প, 'আমি তখন ইসলামিয়া কলেজে আইএ পড়ি। বেকার হোস্টেলে থাকি। আমাদের মধ্যে তখন দুটো গ্রুপ। আমার একটা গ্রুপ। আর আনোয়ারের একটা গ্রুপ। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সম্মেলন হবে। আমাকে ডেলিগেট করা হয়েছে আগেই। আর আমার গ্রুপে ডেলিগেট হলো আমার খালাতো বোনের ছেলে মাখন। মাখন ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সেক্রেটারি। আমার সমর্থনে সে জয়লাভ করেছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বরিশালের নুরুদ্দিন। সে আনোয়ারের দলের। সেই কারণেই হেরেছে। আমার দলে থাকলে হারত না। যা-ই হোক, আনোয়াররাও যাবে দিল্লি। আমার তো টাকার সোর্স আব্বা, রেনু। মাঝেমধ্যে মা। মাখনের অবশ্য টাকার অভাব নাই। ওর বাবা-মা দুজনেই যদিও ওর ছোটবেলায় মারা গেছেন, কিন্তু টাকাপয়সা-ধনসম্পত্তি রেখে গেছেন প্রচুর।

'দুই মামা-ভাগনে আমরা উঠে বসলাম ট্রেনে। দুজনের দিল্লিতে কী পরিমাণ টাকা লাগতে পারে, সেই আন্দাজে আমরা টাকা নিয়েছি। আনোয়ারের দলও উঠল একই ট্রেনে। কিন্তু ওরা উঠল আলাদা কামরায়।

দিল্লি পৌঁছুলাম। মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবক দল আমাদের পৌঁছে দিল অ্যাংলো অ্যারাবিয়ান কলেজে। সেখানে কলেজ মাঠে তাঁবুতে থাকতে হবে।

'শরীর আমার খারাপ হয়ে গেল। দিনের বেলা বেজায় গরম, রাতের বেলা ভীষণ ঠান্ডা। সকালে আর বিছানা থেকে উঠতে পারছি না। বুকে, পেটে, সারা শরীরে ভীষণ বেদনা। পায়খানা হয় না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। মাখন আমার পাশে বসে আছে। মামা, কী করব? ডাক্তার ডাকতে হবে, মাখন তো কাউকে চেনে না, আমিও চিনি না। একজন ভলান্টিয়ারকে বলা হলো, সে জবাব দিল, আভি নেহি, থোড়া বাদ। তাকে আর দেখা গেল না। থোড়া বাদ থোড়া বাদই রয়ে গেল। মাখন বলল, মামা, আমি যাই, দেখি, যেখান থেকে পারি, একজন ডাক্তার ধরে আনি। সে যখন বের হতে যাবে, তখনই এসে হাজির হলেন খলিল ভাই। খলিল ভাই আলিয়া মাদ্রাসার আমাদের বড় ভাই এক বছর আগে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাস করে দিল্লি এসেছেন, হেকিমি পড়ছেন। তিনি থাকতেন ইলিয়ট হোস্টেলে। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম, ইডিয়ট হোস্টেল। তিনি মাখনকে বললেন, ডাক্তার ডাকতে হবে না। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি। তিনি বেরিয়ে গেলেন। আধঘণ্টা পরে একজন হেকিম নিয়ে এলেন। হেকিম আমাকে পরীক্ষা করে ওষুধ দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ভয় নাই, ওষুধ খাওয়ার পরে তিনবার পায়খানা হবে রাতে আর কিছু খাবেন না। ভোরে এই ওষুধটা খাবেন। বিকালে আপনি ভালো হয়ে যাবেন। আমি ওষুধ খেলাম। তিনি যা হবে বলেছিলেন, একেবারে তা অক্ষরে অক্ষরে ফলল।

'আমি পরের দিন সুস্থ হয়ে গেলাম।

'খলিল ভাই আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের দিল্লি ঘুরে ঘুরে দেখাবেন।

'এই সময় আনোয়ারের দলের নুরুদ্দিন আমাদের তাঁবুতে এসে হাজির। সে বলল, আনোয়ারের সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। আমি এখানে যদি মরেও যাই, এখানেই থাকব, কিন্তু আনোয়ারের কাছে আর ফিরে যাব না। আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি থাকো আমাদের সাথে।

'নুরুদ্দিন বলল, আমার কাছে কিন্তু কোনো টাকাপয়সা নাই। আনোয়ার সব রেখে দিয়েছে।

'আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। থাকো তো।

'আমরা আরও তিন দিন থাকলাম। খলিল ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে লালকেল্লা, জামে মসজিদ, কুতুবমিনার, নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা সব দেখে ফেললাম। টাকাপয়সা আরও খরচ হয়ে গেল।

'দিল্লি রেলস্টেশনে এসে টাকা গুনে দেখলাম, টাকা যা আছে, তাতে তিনজনের টিকেটের দাম হয় না।

'তিনজনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, একটা টিকেট কাটা হবে। আর সার্ভেন্ট ক্লাসে উঠে পড়ব। ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের চাকরবাকরদের জন্য তাঁদের কামরার পাশে একটা ছোট্ট কামরা থাকে। সাহেবদের ফুট-ফরমাশ খাটা হয়ে গেলে এই ছোট কামরায় বসে থাকে চাকরেরা। আমরা একটা থার্ড ক্লাস টিকেট কাটলাম হাওড়া পর্যন্ত। আর দুটা কিনলাম প্ল্যাটফর্ম টিকেট। এইভাবে তিনজনে স্টেশনের ভেতরে ঢুকলাম। মাখনের চেহারা খুব সুন্দর। কেউ দেখলে কোনো দিনও বিশ্বাস করবে না সে চাকর হতে পারে। নুরুদ্দিন খবর আনল, খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেব একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে যাচ্ছেন। নুরুদ্দিন তাঁকে চিনত. আমরা তাঁর সার্ভেন্টস ক্লাসে উঠে পড়লাম। মাখনকে উপরে বার্থে শুয়ে পড়তে বললাম। কেউ এলে আমরা নুরুদ্দিনকে ঠেলে দেব সামনে, এই হলো প্ল্যান। খান বাহাদুর মোমেন সাহেব রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বার ছিলেন কাজেই আশা, কেউ তাঁর সার্ভেন্টস রুমে আসবে না। একবার এক চেকার এল। জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কোন সাহেবের লোক। নুরুদ্দিন জবাব দিল, মোমেন সাব কা। চেকার চলে গেল।

'ভাত খাওয়ার পয়সা নাই। মাঝেমধ্যে ফলফলাদি কিনে এনে খাওয়া হলো। কোনোরকমে হাওড়া পৌঁছা গেল।

'গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে মাখন নেমে গেল। আমরা দুইজন ময়লা জামাকাপড় পরে আছি। আমার চোখের চশমা লুকিয়ে রেখেছি। কেউ দেখলে বিশ্বাস করবে না চশমা পরা লোক চাকর হতে পারে। মাখন মালপত্র নিয়ে সম্বলমাত্র টিকেট খানি নিয়ে বেরিয়ে গেল। যা-ই হোক, মালপত্র কোনো এক জায়গায় রেখে তিনটা প্ল্যাটফর্ম টিকেট কিনে ফিরে এল। আমরা সেই তিনখানা টিকেট তিনজনের হাতে রেখে বেরিয়ে আসলাম। হাঁটতে পারছি না। ক্ষুধায় কাহিল। হিসাব করে দেখা গেল, আর এক টাকা আছে অবশিষ্ট। বাসে চড়ে চলে আসলাম বেকার হোস্টেলে।'

সেই গল্প শুনে সবার কী হাসি!

দাওয়াত খেয়ে গল্পগুজব করে মোশারফের বাসা থেকে মুজিব বেরিয়ে এলেন যখন, তখন রোদ বেশ মরে এসেছে। বেরিয়েই বারান্দায় তাঁর চোখ পড়ল স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুই সদস্যের ওপর। এরা তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

যখন তিনি রিকশায় বা টমটমে ওঠেন, তখন এরা সাইকেল চালিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যখন তিনি হাঁটেন, তখন সাইকেল ঠেলে নিয়ে এরাও হাঁটে

মুজিব বললেন, 'এই, তোমরা কখন থেকে এখানে এসেছ?'

ওরা কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে।

মুজিব জিগ্যেস করলেন, 'এই, তোমরা দুপুরে খেয়েছ?'

'জি না।'

'খাও নাই কেন?'

'আপনি যে এখানে অনেকক্ষণ থাকবেন, সেটা বুঝতে পারি নাই।'

'একজন একজন করে খেয়ে আসলেও তো পারতা? মিয়ারা, কতক্ষণ না খেয়ে থাকবা? যাও, খেয়ে আসো।'

'আপনি তো এখন চলে যাবেন। আমরা পরে খাব। এখন আপনাকে ফলো করব।'

'মুশকিল হলো তো! মোশারফ। ভাই, আমার যে আরও দুজন অতিথি আছে সঙ্গে। তাদেরকেও যে তোমার খাওয়াতে হয়।'

মোশারফ বলল, 'মুজিব ভাই, এইটা কোনো ব্যাপার নাকি। ভাই, আপনারা আসেন, ভেতরে আসেন।'

মুজিব হেসে বললেন, 'যাও, বাড়ির ভিতরে যাও। আমি আরও খানিকক্ষণ বসতেছি। তোমরা ততক্ষণে খেয়ে যাও। নুরুল আমিন সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের কপালে এই কষ্টই লেখা। শেখ মুজিবররে ফলো করলে কখনো খাওয়া পাবা, কখনো পাবা না। আসো আসো, ভিতরে আসো।'

১৭.

কারাগারে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন মুজিব। আতাউর রহমান খানসহ পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। শেখ মুজিব করাচি যাবেন, এই হলো পার্টির সিদ্ধান্ত। করাচিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। পার্টির নেতাদের প্রায় সবাই কারান্তরালে। শুধু কি পার্টির নেতারা? ছাত্র-শিক্ষকসহ সমাজের নানা ধবনের

মানুষ বিনা বিচারে কারাগারে আটক হয়ে আছেন। শহীদুল্লা কায়সার, মুনীর চৌধুরী, অজিত গুহ, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মতো অধ্যাপকেরা জেলে তাঁকে অবশ্যই রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করতে হবে। কিন্তু আরেকটা কাজ করার জন্য তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে আছে। তিনি একটুও শান্তি পাচ্ছেন না। তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দী কী করে বলেন উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে? তিনি সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সেই কথাটা জিগ্যেস করতে চান।

পাকিস্তানের রাজধানী করাচি। করাচির ভূপ্রকৃতি শেখ মুজিবের একদমই পছন্দ হলো না। এ যে মরুভূমি। চারদিকে পাষাণবালু। তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'আমরা জন্মগ্রহণ করেছি সবুজের দেশে। মরুভূমির এই বালুরাশি আমাদের পছন্দ হবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনেরও একটা সম্বন্ধ আছে। বালুর দেশের মানুষের মন বালুর মতোই উড়ে বেড়ায়। আর পলিমাটির দেশ বাংলার মানুষের মন ওই রকমই নরম, ওই রকমই সবুজ। প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যের মধ্যে আমাদের জন্ম, সেই সৌন্দর্যই আমরা ভালোবাসি।'

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনকে চিঠি দিয়েছেন মুজিব সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানিয়ে। সেই চিঠির উত্তর এসেছে। খাজা নাজিম উদ্দিন মুজিবকে সময় দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গেলেন মুজিব। তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন খাজা সাহেবের ব্যক্তিগত সহকারী মুজিদ আলী। মুজিব তাঁকে চেনেন কলকাতার দিনগুলো থেকে। এই ভদ্রলোক এর আগে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের চিফ মিনিস্টারেরও পিএ ছিলেন। পিএর রুমেই প্রথমে বসলেন মুজিব।

খাজা নিজে এলেন পিএর রুমে। মুজিবকে স্বাগত জানিয়ে নিজের কক্ষে নিয়ে গেলেন। খাতির করে বসালেন।

জিগ্যেস করলেন, 'তোমার শরীরটা এখন কেমন?'

'শরীর তো খুবই খারাপ হয়ে পড়েছিল। ব্লাড ডিসেন্ট্রিতে ভুগেছি। এখন যথেষ্ট ভালো আগের চেয়ে।'

'কত দিন থাকবে করাচিতে?'

'করাচিতে হয়তো বেশি দিন থাকা হবে না। তবে এসেছি যখন, পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু জায়গা দেখে যেতে চাই।'

মুজিবের মনে পড়ে যেতে লাগল কলকাতার দিনগুলো। একই দল ছিল তাঁদের। লক্ষ্যও এক ছিল। মুজিব যে মুসলিম লীগের কত বড় নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন, এটা খাজারও জানা।

মুজিব বললেন, 'মওলানা ভাসানী, শামসুল হক, আবুল হাশিম, মাওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, খান সাহেব ওসমান আলী—সবাই এখন জেলখানায়। আরও আটক আছেন অনেক অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক, ছাত্রকর্মী। ভাষা আন্দোলনের সমস্ত রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আপনি করেন আর একটা জুডিশিয়াল এনকোয়ারি কমিটি করেন, কেন ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হলো?'

খাজা বললেন, 'এটা তো আমার হাতে না। এটা প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আমি কী করতে পারি?'

'আপনি মুসলিম সরকারের প্রধানমন্ত্রী। আর পূর্ব বাংলায়ও মুসলিম লীগ সরকার। আপনি তাদের নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আপনি কি চান যে দেশে বিশৃঙ্খলা হোক। নিশ্চয়ই চান না। আমরাও চাই না। আমি করাচি পর্যন্ত এসেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে; কারণ, আমি জানি, প্রাদেশিক সরকারের কাছে দাবিদাওয়া পেশ করে কোনো লাভ হবে না। তারা অন্যায় করেছে। সেই অন্যায় ঢাকার জন্য তাঁরা একের পর এক অন্যায় করেই চলেছে।'

মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে। একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রও চলছে। মরুভূমির এই দেশ খুবই গরম।

মুজিব বসে আছেন একটা সোফায়। তার পাশে এসে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেক্রেটারিয়েট টেবিলটা কক্ষের অপর পাশে।

চা এসেছে। সেই চা ঠান্ডা হয়েও গেছে। মুজিবের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের সময় বরাদ্দ ছিল ২০ মিনিট। কখন যে এক ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে, দুজনের কেউই টের পাননি।

মুজিব বললেন, 'আপনি স্বীকার করেন কি না যে আওয়ামী লীগ বিরোধী পার্টি? আপনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা আমি জানি। বিরোধী দল না থাকলে তো গণতন্ত্র চলতে পারে না। আপনি বলেন, আপনি স্বীকার করেন কি না আওয়ামী লীগ বিরোধী দল?'

খাজা বললেন, 'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ বিরোধী দল।'

'আপনি যে স্বীকার করে নিলেন আওয়ামী লীগ বিরোধী দল, এই কথাটা আমি খবরের কাগজে দিতে পারি কি না?'

'নিশ্চয়ই দিতে পারো।'

'তাহলে বিরোধী দলকে আপনার কাজ করতে দিতে হবে। তা না হলে গণতন্ত্র থাকে না।'

'আমি প্রদেশের কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করি না। তার পরও আমি চেষ্টা করে দেখব, কত দূর কী করতে পারি।'

শেখ মুজিব উঠে পড়লেন। নাহ্, অনেক বেশি সময় নিয়ে নেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। তিনি তাঁকে সম্মান দেখিয়ে আদাব জানিয়ে বিদায় নিলেন।

দুদিন পর করলেন সাংবাদ সম্মেলন। পাকিস্তানি সাংবাদিকেরা তাঁকে ছেঁকে ধরল মৌমাছির ঝাঁকের মতো।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি নিয়ে তাদের অনেক প্রশ্ন। মুজিব বুঝিয়ে বললেন, জানালেন, বাঙালির দাবি ন্যায্য, কারণ বাঙালিরাই পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আর তা সত্ত্বেও বাঙালিদের দাবি বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা। ওই আন্দোলন হিন্দুদের নয়, ভারত থেকে আসা এজেন্টদের নয়, কমিউনিস্টদের নয়। জানালেন, আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সবাই মুসলমান। বললেন, 'কত নেতা গ্রেপ্তার হয়ে আছেন কারাগারে, তাঁদের সবাই তো পূর্ব বাংলার লোক, অনেকেই আওয়ামী লীগের নেতা, মওলানা ভাসানী সভাপতি, শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক, সবাই এখন কারাগারে।'

তিনি আরও বললেন, 'পূর্ব বাংলায় প্রায় ৩০টি উপনির্বাচন স্থগিত করে রাখা হয়েছে। কারণ আগের উপনির্বাচনে শামসুল হকের কাছে মুসলিম লীগ প্রার্থী হেরে গেছে। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় দল, মুসলিম লীগ জনগণের সমর্থন হারিয়েছে। যেকোনো একটা উপনির্বাচন দিক, মুসলিম লীগ প্রার্থীকে আমরা অবশ্যই শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হব।'

করাচির রাজনৈতিক কর্মীরা আড্ডা দেয় সেখানকার কফি হাউসে। মুজিব গেলেন সেখানে। তাঁর সঙ্গী আমানুল্লাহ। আমানুল্লাহ বাঙালি ছাত্র। করাচিতে থেকে পড়াশোনা করে। শেখ মুজিবের সচিবের ভূমিকা পালন করছে সে। স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে—সবকিছুতেই তার প্রবল উৎসাহ। করাচির কফি হাউস এক বাঙালি আমানুল্লাহ একাই গরম করে রাখে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সে একাই লড়ে, তার যুক্তির কাছে অবাঙালিরা সব কুপোকাত হয়ে যায়।

আর শেখ মুজিবকে সঙ্গ দিচ্ছেন ও নানা কাজে সহায়তা করছেন করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মঞ্জুরুল হক।

এঁরা দুজনে মিলেই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

মঞ্জুরুল জিপ চালাচ্ছেন। তার পাশে সামনের আসনে বসে আছেন মুজিব। জিপ চলছে মরুভূমির বালুময় পথে। লু হাওয়া বইছে যেন। শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে মুজিবের। মুজিবেরা চলেছেন হায়দরাবাদ। মুজিব খানিকটা

উত্তেজিত কারণ, তিনি চলেছেন লিডার সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে। সোহরাওয়ার্দীর মতো ঝানু নেতা কী করে হিসাবে ভুল করেন? কী করে বলতে পারেন বাঙালিদের উচিত উর্দু মেনে নেওয়া। একটা বোঝাপড়া করবেন তিনি লিডারের সঙ্গে।

করাচির বাইরে চলে এল জিপ। এত ঘোরতর মরুভূমি। কোনো বাড়িঘর নাই। মাঝেমধ্যে দু-একটা ছোট বাজারের মতো চোখে পড়ে।

মুজিব বললেন মঞ্জুরুলকে, 'তোমরা এই মরুভূমিতে থাকো কী করে?'

মঞ্জুরুলের এক হাত স্টিয়ারিঙে, এক হাত গিয়ারের হ্যান্ডেলে, দৃষ্টি সম্মুখপানে, তিনি বললেন, 'বাধ্য হয়ে। মোহাজের হয়ে এসেছি। এখন এটাই তো আমাদের বাড়িঘর। এখানেই মরতে হবে আমাদের। দিল্লি তো তুমি দেখেছ। এই রকম মরুভূমি আগে দেখো নাই? প্রথম প্রথম খারাপ লেগেছিল। এখন তো সহ্য হয়ে গেছে। তবে আমরা মোহাজেররা যখন এসেছি, এই মরুভূমিকেই আমরা ফুলে-ফলে ভরে তুলব, একদিন দেখো।'

লিডার সোহরাওয়ার্দী থাকেন ডাকবাংলোয়। সোজা সেখানেই চলে গেলেন। লিডার বাইরে, রাতের আগে ফিরবেন না। তাঁরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন। হাতমুখ ধুলেন। খাওয়াদাওয়া করলেন। গড়িয়ে নিলেন। রাত নয়টায় এলেন সোহরাওয়ার্দীর ডাকবাংলোয়।

তিনি তখনো ফেরেননি।

তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সোহরাওয়ার্দী ফিরলেন রাত ১০টায়। মুজিবকে দেখেই বললেন, 'কী, খুব প্রেস কনফারেন্স করা হচ্ছে?'

মুজিব হেসে বললেন, 'কী আর করব?'

কুশল বিনিময়ের পর মুজিব এলেন আসল কথায়?

'এটা আপনি কী করেছেন?'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'কী করেছি!'

'রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আপনার মত খবরের কাগজে বের হয়েছে।'

'কী বের হয়েছে?'

'কাগজগুলোয় বের হয়েছে, আপনি বলেছেন, বাঙালিদের উচিত উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া।'

সোহরাওয়ার্দীর চোখমুখ লাল হয়ে গেল। তিনি হাত দুটো একত্র করে আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বুকের কাছে নিয়ে নাড়তে নাড়তে রাগী গলায়

বললেন, 'এ কথা তো আমি কোনো কাগজে বলি নাই। উর্দু ও বাংলা—দুইটা হলে আপত্তি কী! তাই বলেছিলাম। ছাত্রদের ওপরে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদ করেছি, পূর্ব বাংলার মানুষদের ওপরে যে অত্যাচার করা করা হচ্ছে, তার নিন্দা জানিয়েছি।'

'সেসব কথা কোনো কাগজে পরিষ্কার করে ছাপা হয় নাই। পূর্ব বাংলার জনগণ আপনার কথা কাগজে যা পড়েছে, তাতে খুবই মর্মাহত হয়েছে।'

অনেক রাত হয়ে গেছে। কথা শেষ হলো না। সেদিন মঞ্জুরুল ও মুজিব ফিরে গেলেন হোটেলে। পরের দিন মঞ্জুরুল করাচি চলে যাবেন। যাওয়ার আগে মুজিবের কাছে রেখে গেলেন মাসুদকে। মাসুদ আগে নিখিল ভারত স্টেট মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। এখন হায়দরাবাদবাসী। সোহরাওয়ার্দীর ভক্ত। সোহরাওয়ার্দী করাচিতে জিন্নাহ আওয়ামী লীগ গঠন করেছেন। মাসুদ সেই পার্টি গঠনে সহায়তা করেছেন।

আওয়ামী লীগের আগে জিন্নাহ শব্দটা বসানোটা আবার মুজিবের পছন্দ নয়। পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ সভায় এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা হয়েছে। তাঁদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত, কোনো ব্যক্তির নামে পার্টির নামকরণ করা যায় না। তাঁরা কিছুতেই নাম পরিবর্তন করবেন না।

মঞ্জুরুল বিদায় নিলেন। মাসুদকে নিয়ে দুপুরবেলা মালপত্রসমেত হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন সোহরাওয়ার্দীর ডাকবাংলোয়।

লিডারের সঙ্গে দেখা হলো। মুজিব খেয়াল করে দেখলেন, সোহরাওয়ার্দী কয়েকটা বিস্কুট আর হরলিক্স খেলেন। এটাই কি তার দুপুরের খাবার?

মাসুদ চলে গেলেন। মুজিব রয়ে গেলেন সোহরাওয়ার্দীর বাংলোয়। অতিথি আরেকজন আছেন। পেশোয়ার থেকে আসা এক অ্যাডভোকেট। রাতের খাওয়ায় মুজিব আর সেই অ্যাডভোকেট সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে শামিল হলেন। বিস্কুট, মাখন আর রুটি। শেখ মুজিব বললেন, 'এভাবে চলে কেমন করে? বাড়িতে তো আর কাউকে দেখিও না। সবকিছু একা একা করেন। এইভাবে চলতে পারে?'

সোহরাওয়ার্দী হেসে বললেন, 'চলে তো যাচ্ছে।'

খাওয়ার পর আবার রাজনীতির কথা শুরু হয়। 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তো আমাদের পার্টির সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশন নেয় নাই। আমি তো তোমাদের কেউ না।'

মুজিব তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'প্রতিষ্ঠান না গড়লে কার কাছ থেকে অ্যাফিলিয়েশন নেব। আপনি তো আমাদের নেতা আছেনই।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তো আপনাকে নেতা মানে, এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণও আপনাকে নেতা মানে। আপনাকে সমর্থন করে। কিন্তু আপনি জিন্নাহ আওয়ামী লীগ করেছেন। আমরা আমাদের পার্টির নাম বদলাতে পারব না। কোনো ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, সেসবের পরিবর্তন সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী ১৯৪৯ সালেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ গঠনের জন্য। তাঁরও কোনো আপত্তি থাকবে না, যদি আপনি আমাদের ম্যানিফেস্টো আর গঠনতন্ত্র মেনে নেন।'

রাত বাড়ছে। অ্যাডভোকেট সাহেব হাই তুলে ঘুমোতে চলে গেলেন। মুজিব আর সোহরাওয়ার্দী কথা বলেই চলেছেন। মুজিবের আজ ভাত খাওয়া হয় নাই। রুটি খেলে কি বাঙালির রাতের খাওয়া হয়। যা-ই হোক, তিনি পার্টির আলাপ নিয়ে এতই মগ্ন যে ভাত না খাওয়ার দুঃখ তিনি ভুলে রইলেন।

সোহরাওয়ার্দী শেষ পর্যন্ত মুজিবের প্রস্তাব মেনে নিলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র, ম্যানিফেস্টো মেনে নিতে রাজি। মুজিব বললেন, 'আপনি নিজের হাতে এই কথা লিখে দেন। আর আপনার নিজের হাতে এ কথাও লিখে দেন যে, আপনি বাংলা ও উর্দু—দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। আর ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের ও বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর সরকারি জুলুম-নির্যাতনের প্রতিবাদ করছেন।'

সোহরাওয়ার্দী কী বলেন, তা শোনার জন্য মুজিব তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

একটুখানি থেমে সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'দাও লিখে দিচ্ছি। এটা তো আমার নীতি ও বিশ্বাস।'

সোহরাওয়ার্দী স্বহস্তে লিখে দিলেন মুজিবের প্রস্তাবমতো। বিবৃতি দুটোর নিচে স্বাক্ষর করলেন। তারিখ দিলেন।

মুজিব কাগজ দুটো নিজের সুটকেসের পকেটে রাখলেন।

তিনি এখন অনেকটাই স্বস্তি বোধ করছেন।

মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে জিগ্যেস করলেন, 'লিডার, পিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা সত্য কি না। আসামিদের কি রক্ষা করতে পারবেন? আর ষড়যন্ত্র করে থাকলে তাঁদের শাস্তি হওয়া উচিত কি না?'

সোহরাওয়ার্দী খেপে গেলেন। তাঁর চোখেমুখে যেন রক্ত উঠে এসেছে। বললেন, 'এই প্রশ্ন কোরো না। কারণ, অ্যাডভোকেট হিসাবে আমাকে শপথ

নিতে হয় মামলার সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষকে কিছু না বলতে। এই শপথ আমি ভঙ্গ করতে পারব না।'

পিন্ডি চক্রান্ত মামলায় সোহরাওয়ার্দী আসামিপক্ষের উকিল। রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। পাঞ্জাবের কেউ আসামিপক্ষের উকিল হতে রাজি নয়। জেনারেল আকবর খানের স্ত্রী নাসিমা খান খুব করে ধরলেন সোহরাওয়ার্দীকে। সোহরাওয়ার্দী রাজি হলেন মামলায় আসামিপক্ষের হয়ে লড়তে।

জেনারেল আকবর খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে পিন্ডিতে মিলিত হয়ে সরকার উৎখাতের ও দেশে রুশ কমিউনিস্ট শক্তিকে ক্ষমতায় বসানোর চক্রান্ত করছেন। আকবর খান তখন ছুটিতে। তিনি পিন্ডিতে সফররত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও সাজ্জাদ জহির বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন নৈশভোজে। ওই সময় ছুটিতে থাকা আরও কিছু সামরিক অফিসার তার বাড়িতে অংশগ্রহণ করে।

আইয়ুব খান সেনাবাহিনীপ্রধান।

তিনি খবর পান, বা এই সুযোগটি কাজে লাগান যে, জেনারেল আকবর দেশের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

আইয়ুব খানকে সেনাপ্রধান করায় সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সেনাবাহিনীর ব্যাপারটা কিছু বুঝতেন না। দেশরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মির্জার পরামর্শে তিনি চলতেন। আইয়ুব খান আর ইস্কান্দার মির্জা মিলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত খানকে বোঝালেন, এরা সরকার উৎখাত করার চক্রান্ত করছে। এদের গ্রেপ্তার করা হোক। এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করা হোক।

লিয়াকত আলী খান কথাটা বিশ্বাস করলেন। কারণ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে আমেরিকা আমন্ত্রণ করেছিল, আর লিয়াকত আলী খানকে উপেক্ষা দেখাচ্ছে, এরই প্রেক্ষাপটে সাজ্জাদ জহির এগিয়ে এসেছিলেন লিয়াকত আলীর উদ্ধারে। তিনি তাঁর পুরোনো সহযোগী, যখন লিয়াকত ভারতের অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন তার বাজেট-বক্তৃতা সাজ্জাদ জহির লিখে দিয়েছিলেন সাজ্জাদ এসে বললেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকা নিমন্ত্রণ করেনি তো কী হয়েছে! আমি আপনাকে রাশিয়া থেকে আমন্ত্রণ এনে দিচ্ছি।' সত্যি সত্যি রাশিয়ার আমন্ত্রণপত্র নিয়ে জহির হাজির হলেন। লিয়াকত বুঝলেন, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ আর সাজ্জাদ জহির আসলেই রাশিয়ার লোক। কাজেই আইয়ুব খান ও ইস্কান্দার মির্জার পরামর্শে জেনারেল আকবর আলী খানসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হলো। এটাই পিন্ডি বা

রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলা বলে এখন বিখ্যাত হয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী সেই মামলায় আসামিপক্ষের উকিল।

জেরার জন্য আইয়ুব খান আদালতে হাজির।

আসামিপক্ষের উকিল সোহরাওয়ার্দী তাঁকে জেরা করছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে এই চক্রান্ত সম্পর্কে প্রথম কে খবর দেন?'

আইয়ুব খান বললেন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহাবুদ্দিন।'

সোহরাওয়ার্দী: 'সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বেশি দক্ষ, নাকি আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বেশি দক্ষ?'

আইয়ুব খান: 'আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বেশি দক্ষ।'

সোহরাওয়ার্দী: 'আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বেশি দক্ষ। তাহলে তো সর্বাগ্রে সেনাবাহিনীপ্রধানের কাছেই খবর আসা উচিত।'

আইয়ুব খান: 'আমার কাছেই সবার আগে খবর এসেছিল। আমি চেক করছিলাম। এমন সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গভর্নর চুন্দ্রিগড় খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খবর দেন।'

সোহরাওয়ার্দী: 'আপনি একটু আগে বলেছেন শাহাবুদ্দিন প্রধানমন্ত্রীকে খবর দিয়েছেন।'

আইয়ুব: 'তারা দুইজনেই খবর দিয়েছেন। তবে কে আগে দিয়েছেন, আমি বলতে পারব না। আমার ঠিক স্মরণে আসছে না।'

সোহরাওয়ার্দী: 'যারা আর্মিতে দ্রুত প্রমোশন পেয়েছেন, তাঁরা মামলাটি সাজিয়েছেন, তাঁদের অবস্থান ও ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্টক করার জন্য।'

আইয়ুব: 'আমি এই ধরনের বাজে প্রশ্নের জবাব দিব না।'

জজ সাহেব বললেন, 'আসামিপক্ষের অ্যাডভোকেটের প্রশ্নের জবাবে আপনি বলতে পারেন—হ্যাঁ; আপনি বলতে পারেন—না; আপনি বলতে পারেন—এটা সত্য নয়; কিন্তু হ্যাঁ বা না আপনাকে একটা কিছু বলতে হবে।'

আইয়ুব তখন তেলে-বেগুনে জ্বলছেন। তিনি বললেন, 'আমি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীপ্রধান। আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করা ধৃষ্টতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।'

জজ সাহেব বললেন, 'এটা উকিলের এখতিয়ার। তিনি এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন।'

আইয়ুব খান বললেন, 'আমি কিছু বলব না।' তিনি কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন।

সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে এসবের কিছুই বললেন না। শুধু বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। ঘুমাতে যাও। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ব্যাঙ্গমা দুই পাখা মেলে শূন্যে ভাসছে। কিন্তু এগোচ্ছে না, একটা জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ব্যাঙ্গমি বলল, 'ওই রকম আমিও পারি।' সে-ও পাখা মেলে ব্যাঙ্গমার পাশে স্থির হয়ে ভাসতে লাগল। একটু একটু করে পাখা তাদের নাড়তে হচ্ছে।

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আইয়ুব খান আর সোহরাওয়ার্দীর এই দড়ি-টানাটানির ঘটনা কিন্তু দুইজনের কেউই ভুলবেন না।'

ব্যাঙ্গমা বলল,

ঠিক কইছ বুড়ি তুমি কথা কইছ খাঁটি।
দুইজনেই মনে রাখব এই ঘটনাটি ॥

ব্যাঙ্গমি বলল, 'এর আগেও দুইজনের বাহাস হইছে। ১৯৪৮ সালে আইয়ুব খানের পোস্টিং হইছিল ঢাকায়। তখন রণদাপ্রসাদ সাহা, ওই যে ভারতেশ্বরী হোমস যিনি প্রতিষ্ঠা করছিলেন, তখনো বিশাল বড়লোক, আইয়ুব খানরে নেমন্তন্ন করছিলেন ঢাকা ক্লাবে। সেদিন সোহরাওয়ার্দীও ঢাকায়। রণদাপ্রসাদ তাঁরেও নেমন্তন্ন করলেন। সোহরাওয়ার্দী সাদা প্যান্ট আর বুশ শার্ট পইরা হাজির হইলেন পার্টিতে। রণদাপ্রসাদ তাঁরে লইয়া গেলেন মেইন টেবিলে, আইয়ুব খানের লগে পরিচয় করায়া দিতে। সোহরাওয়ার্দী কইলেন, নাইস টু মিট ইউ, জেনারেল।

'আইয়ুব খান তাঁরে বেশি পাত্তা দিলেন না। সোহরাওয়ার্দী গান্ধীজির লগে শান্তি মিশন কইরা বেড়াইছেন, এইটা তাঁর পছন্দ না। মন্ত্রীরা সেই আসরে উপস্থিত। হাবিবুল্লাহ বাহার কইলেন, পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ ধরব অসি, আর পূর্ব বাংলার লোকেরা ধরব মসি। পূর্ব বাংলার লোকেরা শান্তিপ্রিয়, তারা যুদ্ধ করন জানে না। কিন্তু বীরের প্রশংসা কইরা গল্প কবিতা লেখবার পারে। আপনেরা আমগো বাঁচায়া রাখবেন আর আমরা আপনাগো সাহিত্যে ইতিহাসে অমর কইরা রাখুম।

'সোহরাওয়ার্দী মুখ খুললেন। কইলেন, মাননীয় মন্ত্রী, আপনের কথা সংশোধন করতে হইব। বাঙালিরা নিজেরা যথেষ্ট সাহসী আর শক্ত তারা নিজেরাই নিজেদের রক্ষা করতে পারে, পশ্চিমাগো লাগে না। আমি যহন প্রাইম মিনিস্টার আছিলাম, তখন শুনি, ঢাকার একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা শিখের লগে মারামারি লাগছে। তখন ওই অসিওয়ালা অসি বাইর করছে।

আর মসিওয়ালা তার অসি কাইড়া নিয়া তারই পেটে ঢুকায়া দিছে। নিরীহ শান্তিবাদী হইতে পারে। বিপদে পড়লে বাঘ হইয়া যায়।

'হাবিবুল্লাহ বাহার চুপসায়া গেলেন। মন্ত্রীরা সবাই চুপ। জেনারেল আইয়ুব খান মহা বিরক্ত।'

ব্যাঙ্গমা পাখা নাড়তে নাড়তে বলল, 'পরে আইয়ুব খানের বই বারাইব ১৯৬৭ সালে। হে কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর এই দিনের আদালতের জেরায় নাজেহাল হওনের কথাটা ভুলেন নাই। আইয়ুব খান লেখবেন, সোহরাওয়ার্দী আছিলেন একটা জটিল চরিত্র। নাইট ক্লাবে যান। খুবই প্রাণশক্তি আর উদ্যম। উনি সাক্ষীদের জেরা করার সময় আর্মি অফিসারগো আক্রমণ কইরা খুব মজা পাইছেন। উনি অনেক বেশি বাড়াবাড়ি করছেন, আর আদালত তাঁরে বাধা দেন নাই। তখন আমার কিছু করনের আছিল না। আদালত অভিযুক্তদের অপরাধী কইলা রায় দিছে আর সাজা দিছে।'

ব্যাঙ্গমি কইল, 'সোহরাওয়ার্দীও পাকিস্তানের মন্ত্রী হইয়া সেই বন্দীদের ছাইড়া দেওনের ব্যবস্থা করছেন।

'আর আইয়ুব খানরে ক্ষমতা থাইকা রুঢ়ভাবে বিদায় নিতে হইছে সোহরাওয়ার্দীর চ্যালা মুজিবের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়া।'

গাড়ি চলছে। বিকালবেলা। হায়দরাবাদ থেকে গাড়ি ছুটছে করাচির দিকে। গাড়ি চালাচ্ছেন সোহরাওয়ার্দী। পাশের আসনে বসে আছেন মুজিব। হায়দরাবাদের প্রকৃতি, ঘরবাড়ি, পরিবেশ দেখে নিচ্ছেন মুজিব।

গাড়ির পেছনের আসনে বসে আছেন কয়েকজন অ্যাডভোকেট। তাঁরা শেখ মুজিবকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, বাংলা ভাষা আন্দোলন তো ভারতের ষড়যন্ত্র, তাই না? এটা তো হিন্দুরা চাইছে। মুসলমানরা তো সব উর্দুর পক্ষে? তাই না?'

মুজিব বললেন, 'জি না। এটা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ—সব বাঙালিরই আন্দোলন। সবাই রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়। তবে মুসলমানরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ, কাজেই আন্দোলন করেছে মূলত পূর্ব বাংলার মুসলমানরাই। এর প্রমাণ হলো, যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সবাই মুসলমান। যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদেরও প্রায় সবাই মুসলমান।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'পূর্ব বাংলার মানুষ প্রায় সবাই বাঙালি। বাংলা ছাড়া তারা আর কোনো ভাষা জানে না। উর্দু তো একেবারেই জানে না। বাংলা খুব উন্নত ভাষা। কাজী নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সাহিত্য খুবই উন্নত।'

একজন অ্যাডভোকেট পেছন থেকে বললেন, 'শেখ সাহেব, তাহলে আপনি কাজী নজরুল ইসলামের একটা কবিতা শোনান না?'

মুজিব গড়গড় করে আবৃত্তি করতে লাগলেন,

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!

সোহরাওয়ার্দী এই কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে লাগলেন

সাম্যবাদী কবিতার পর মুজিব আবৃত্তি করলেন 'নারী' কবিতাটি—

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

সোহরাওয়ার্দী সাহেবের গাড়ি মরুভূমি চিরে এগিয়ে চলেছে করাচির দিকে। মাঝেমধ্যে গিয়ার বদলের ফলে গাড়ির শব্দও বদলে যাচ্ছে।

সেই শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে মুজিবের দরাজ কণ্ঠের কবিতা। মুজিব চার লাইন পর পর বিরতি দিচ্ছেন, আর সোহরাওয়ার্দী সেই পঙ্ক্তিগুলো ইংরেজিতে তরজমা করে শোনাচ্ছেন।

এবার পেছন থেকে এক অ্যাডভোকেটের অনুরোধ এল, 'আপনি কি আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা শোনাতে পারেন?'

মুজিব বললেন, 'নিশ্চয়ই।' তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলীলায় মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।

পেছন থেকে একজন অ্যাডভোকেট বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ আমি পড়েছি।'

আরেকজন বললেন, 'আমিও পড়েছি।'

আস্তে আস্তে সূর্য ডুবে গেল মরুভূমির বুকে। তাঁরাও শহরের কাছাকাছি এসে পড়েছেন। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে শহরের। কিছুক্ষণের মধ্যেই আলোকশোভিত রাজপথে উঠে পড়লেন তাঁরা।

সোহরাওয়ার্দী প্রথমে গাড়ি থামালেন মুজিবের আশ্রয়স্থল ওসমানি সাহেবের বাড়িতে। বললেন, 'সকাল সকাল চলে এসো ১৩ নম্বর কাচারি রোডে।'

মুজিব তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সালাম দিলেন।

সোহরাওয়ার্দীর জিপ শব্দ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে চলে গেল।

সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে বললেন, 'তুমি লাহোর যাও, ওখানেও সাংবাদিক সম্মেলন করো। আমি ওখানকার কন্টাক্টদের টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।'

মুজিব এখন লাহোরে। উঠেছেন জাভেদ মনজিলে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের টেলিগ্রাম পেয়ে প্রাক্তন আইসিএস খাজা আবদুর রহিম নিজের আবাসস্থলেই তাঁকে তুললেন। মুজিবের সমস্ত শরীরে আবেগের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে। কারণ, জাভেদ মনজিল কবি আল্লামা ইকবালের বাড়ি। কবি এখানে বসেই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। আল্লামা ইকবালকে কবি হিসেবে শেখ মুজিবের পছন্দ, তারও চেয়ে পছন্দ দার্শনিক হিসেবে। এই বাড়িতে উঠে হাতমুখ ধুয়ে মুজিব বললেন, 'খাজা সাহেব, আমি কবির মাজারে যাব। মাজার জিয়ারত করব।'

'নিশ্চয়ই।' খাজা আবদুর রহিম সঙ্গে গেলেন। কবির মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে মুজিব খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি মোনাজাত করলেন দুহাত তুলে

অকারণেই তার মনে পড়ে গেল ইকবালের লেখা গীতিকবিতা—

সারা জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা
হাম বুলবুলে হ্যাঁয় ইস কি ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা...

জাভেদ মনজিলে বসেই শেখ মুজিব চিঠি লিখতে বসলেন তফাজ্জল হোসেন মানিক ভাইকে।

জাভেদ মনজিল
মিও রোড, লাহোর।
১৩. ৬. ১৯৫২

মানিক ভাই,

আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম গ্রহণ করিবেন। করাচি হতে আসার সময় আপনার ২ খানা চিঠি জনাব সুরাওয়ার্দি সাহেব আমাকে দেন। চিঠি পেতে দেরি হওয়ার কারণ শহিদ সাহেব ক্লিপটনের বাসা ছেড়ে ১৩ নম্বর কাচারু রোডে আসিয়াছেন। আপনার বিপদের কথা আমি অনুভব করতে পারি। কিন্তু কী করব? আর এক বিপদে পড়িয়াছি। লাহোর

এসেই টিকেট করিতে যাই কিন্তু ২৪ তারিখের আগে কোন টিকেট পাওয়া গেল না। সপ্তাহে মাত্র ২ বার এরোপ্লেন ঢাকা যায়। এত ভিড় যাহা কল্পনাও করা যায় না। ২৪ তারিখ ঈদ আর আমাকে সেদিনই রওনা হতে হবে। কী করব, ভেবেছিলাম বাড়িতে ঈদ করব তাহা আর হল না। যাহা হউক, গরিবের আবার ঈদ কী? জেলখানায় মওলানা ভাসানী ও বন্ধুবান্ধবদের কী অবস্থায় দিন কাটছে বুঝতে পারছি না। দয়া করে আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি দিবেন। নুরুল হুদা করাচি কিংবা লাহোর নাই। ফজলুল হক ও রউফের কোনো খবর পেয়েছেন কি? প্রফেসর সাহেবকে আর রফিককে অফিসে বসে কিছু কাজ করতে বলবেন। আমি জানি আপনার পক্ষে সম্ভব নহে। আতাউর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সকলকে সালাম দিবেন। কাজ কিছু করতে পেরেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকের ভুল অনেকটা ভাঙাতে পেরেছি বলে মনে হয়। দোয়া করবেন, টাকা-পয়সা নাই যে আবার করাচি যেয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছাব। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কিছু পাব। তবে কয়েক দিন দেরি করতে হবে। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। আপনার শরীরের যত্ন নিবেন। মোটেই চিন্তা করবেন না। খোদা হাফেজ।

আপনার ছোট ভাই
মুজিব

মাই অ্যাড্রেস
সি/ও আলহাজ আবদুর রহিম, বার এট ল
জাভেদ মনজিল
মিও রোড, লাহোর

১৮.

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে থাকেন ভাষা আন্দোলনের বন্দী ফজলুল করিম। চৌমুহনী কলেজের আইএ ক্লাসের ছাত্র তিনি। তরুণ বয়স। সারা দিন তাস, ক্যারম, দাবা ইত্যাদি নিয়ে হইচই করছেন। ভাগ্যিস, মওলানা

ভাসানীকে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে রাখা হয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ একটা পর্দা দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন তাঁর বিছানা। ফলে অপর প্রান্তে ফজলুল করিমদের মতো তরুণদের সুবিধাই হয়েছে হইচই করার, বিড়ি-সিগারেট খাওয়ার।

মওলানা ভাসানীকে বন্দীরা যেমন সবাই শ্রদ্ধা করে, তেমনি কারা কর্তৃপক্ষও সব সময় খেয়াল রাখে তাঁর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। ভাষা আন্দোলনের কর্মীদেরও বাঙালি কারা-কর্মচারীরা সমীহের চোখেই দেখত।

মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন অ্যাডিশনাল জেলার। তাঁর পেছন পেছন এসেছেন ডেপুটি জেলার, একজন জমাদার, জনা কয়েক সেপাই।

মওলানা ভাসানী তাঁদের পেয়ে একটা ছোটখাটো ভাষণ দিয়ে দিলেন—

'শোনেন। আমি তখন আসামের বড়দলুই জেলে। আমারে দেখতে আইছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ। তিনি আমারে পুছ করলেন, হুজুর, আপনের কুনো অসুবিধা হইতাছে না তো জেলখানায়? আমি কইলাম, আর কুনো অসুবিধা নাই, খালি একটাই অসুবিধা। গরুর কলিজা খাইতে বড় হাউশ হয়। কিন্তু খাইতে তো পারি না। গোপীনাথ কইলেন, হুজুর, ইন্ডিয়ায় তো জেলখানায় গরুর গোশত নিষিদ্ধ আইনমতে। এইটা তো ব্রিটিশ গো বানাইনা আইন। আচ্ছা, আপনে এক কাজ করেন। আমি বইলা দিতেছি, আপনেরে কেউ বাইরে থাইকা রান্না কইরা কলিজা পাঠাইলে গার্ডরা জিগাইব না হেইডা গরু না পাঁঠা। এই ব্যবস্থা আমি কইরা দিতেছি। গোপীনাথ কথা রাখছিলেন। আমার কাছে রান্না করা গরুর কলিজা আইছিল।'

মওলানা ভাসানী যখন শৌচাগারে যেতেন, তখন মুশকিলে পড়ত ফজলুল করিম। তাড়াতাড়ি করে বিড়ি-সিগারেট লুকোতে হতো। ক্যারম খেলার সময় পাশ দিয়ে হুজুর যাচ্ছেন, হঠাৎ খেলা ছেড়ে তো সরে যাওয়াও যায় না। একদিন দাঁড়িয়ে ফজলুল করিমকে মওলানা ভাসানী বললেন, 'কি মিয়া, সারা দিন খালি খেলাধুলা করলে চইলব? লেখাপড়া কিছু করন লাগব না? পরে যখন পরীক্ষা আইব, আর ফেইল মারবা, তখন তোমার গার্জিয়ানরা কইব, ভাসানীর চ্যালা সাইজা একেরে গোল্লায় গেছে।'

ফজলুল করিম কোথায় মুখ লুকাবেন বুঝতেই পারছিলেন না।

শৌচাগার বলতে টানা খাটা পায়খানা। মাথার ওপরে টিনের চাল আছে। তবে ব্যবস্থা এমন, বসলে যেন ঘাড় থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায়। প্রহরীরা যেন নজর রাখতে পারে।

এই পায়খানা ব্যবহার করা মুশকিল। ফজলুল করিমের কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হয়ে গেল তিনি বেশ কষ্ট পাচ্ছেন।

মাঝেমধ্যে ডাক্তাররা আসেন বন্দীদের খোঁজখবর করতে। একজন তরুণ ডাক্তার এলেন ফজলুল করিমের কাছে। জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?'

ফজলুল করিম বললেন, 'খুব কোষ্ঠকাঠিন্য।'

'হাসপাতালের ডাক্তার কী ওষুধ দিয়েছেন?

ফজলুল করিম ওষুধের নাম বললেন।

'না না, ওই ওষুধে তো হবে না। তোমার লাগবে মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া।'

'উনি তো এই ওষুধই দেন। মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া দেন না।'

'আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো। নেক্সট উইকে আমার নাইট ডিউটি তুমি অসুস্থ হওয়ার ভান করে আমাকে কল দেবে রাত্রিবেলা। আমি এসে তোমাকে মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া দিয়ে যাব।'

পরের সপ্তাহ আসতে আরও তিন দিন বাকি। তিন দিন কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে রাতের বেলা ফজলুল করিম অসুস্থতার অভিনয়পর্ব শুরু করলেন। রাতের খাবারের পর ফজলুল পেটে ব্যথার ভান করে চিৎকার-চেঁচামেচি-গড়াগড়ি করতে লাগলেন পেট ধরে। ডাক্তারকে কল দেওয়া হলো। সেই তরুণ চিকিৎসক এলেন। চারপাশে অন্য বন্দীরা ঘিরে ধরে আছেন। তরুণ চিকিৎসক তিন দিনে সব ভুলে বসে আছেন। তিনি গুরুত্বের সঙ্গে ফজলুল করিমকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন।

চারদিকের বন্দীরা সবাই উৎসুক ও সহানুভূতিময়।

এর মধ্যে ফজলুল করিম কী করে বলেন যে এসবই তো অভিনয়, ডাক্তারের পরামর্শক্রমেই করা।

ডাক্তার পেটে টোকা দিচ্ছেন। বুকে স্টেথোস্কোপ ধরছেন। শেষে বুকের কাছে কান আনতেই ফজলুল করিম বলে বসলেন, 'মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়া।' ডাক্তার এই প্রয়োজনীয় কথাটা শুনলেন না। তিনি এক গাদা ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে ফেললেন।

তাঁর বিদায়ের পর শুরু হলো সহবন্দীদের সহানুভূতি দেখানোর পালা। 'শোনো, আমারও একবার এই রকম হইছিল খাওয়ার পর। নাভির গোড়ায় না ব্যথাটা? এটা হলো ডিসেন্ট্রির লক্ষণ।'

'আরে না। এইটা হইল গ্যাস্ট্রিক আলসার। শোনো, তুমি চুনের পানি খাও। ভালো হইয়া যাবে।'

ফজলুল করিম বলতেই পারলেন না, এসবই ছিল তাঁর অভিনয়। তারপর একজন কম্পাউন্ডারকে ইনজেকশন হাতে আসতে দেখা গেল। পেটের ব্যথার রোগী ফজলুল করিমকে এখন ইনজেকশন দেওয়া হবে।

ফজলুল করিমেরটা ছিল অভিনয়। কিন্তু মওলানা ভাসানীরটা অভিনয় ছিল না।

এক রাতের কথা।

হঠাৎ চিৎকার আর গোঙানি। শব্দটা আসছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই পর্দাঘেরা কক্ষ থেকেই। ফজুলল করিম ছুটে গেলেন। মওলানা ভাসানী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পেটের ব্যথায় তিনি গলাকাটা মুরগির মতো ছটফট করছেন। সব বন্দী ঘিরে আছে তাঁর বিছানা। ফজলুল করিম কেঁদে ফেললেন মওলানা ভাসানীকে তিনি নিজের বাবার মতোই শ্রদ্ধা করেন ও ভালোবাসেন।

পরের দিন মওলানা ভাসানীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হবে। অলি আহাদ বললেন, 'হুজুর, আপনি কিন্তু কেবিন ছাড়া ওয়ার্ডে উঠবেন না। আপনি যদি কেবিন পান, তাহলে ভবিষ্যতে অন্য রাজবন্দীরাও কেবিন পাবে। আর শোনেন, শেখ মুজিব আপনাকে কেবিন খরচ দিয়ে কেবিনে রাখতে চাইবে। আপনি তাতেও রাজি হবেন না। সরকারি হাসপাতাল, সরকার আপনার কেবিন খরচ দিবে।'

বিকালবেলা ভাসানী ফিরে এলেন কারাগারে। তাঁর শরীরে যেসব পরীক্ষা করা দরকার ছিল, তার কিছু কিছু করা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে কেবিনে না রেখে ওয়ার্ডে রাখা হয়। তিনি এতে রাজি হননি। তাই অগত্যা তাঁকে কারাগারেই ফেরত আনা হয়েছে। খবর পেয়ে মুজিব ছুটে এসেছিলেন। অলি আহাদের ধারণাই সঠিক, মুজিব তাঁকে বলেছেন, 'আপনি কেবিনে থাকেন, কেবিনের ভাড়া আমি জোগাড় করে দেব।' ভাসানী তাতেও রাজি হননি।

পরের দিন তাঁকে আবার নেওয়া হলো ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেখ মুজিব খবর পেয়ে আবারও হাজির সেখানে। বললেন, 'আপনি কেবিনে ওঠেন, বাকিটা আমি দেখতেছি। আপনাকে আমাদের লাগবে। আপনি জেলে যেতে পারবেন না। হাসপাতালে থাকলে আমরা এসে আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারব। জেলখানায় তো যখন ইচ্ছা তখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি না।'

শেখ মুজিবের কথার ওপরে কথা চলে না।

মওলানা ভাসানী রয়ে গেলেন কেবিনে।

শেখ মুজিব বললেন বটে, 'আপনি কেবিনে থাকেন, বাকিটা আমি দেখব', কিন্তু কেবিন ভাড়ার পরিমাণ দেখে তিনি একটু ঘাবড়েই গেলেন। প্রতিদিন ১৫০ টাকা ভাড়া। ১০ দিন পর পর টাকা দিতে হবে।

আতাউর রহমান খান সাহেব কিছু সাহায্য করলেন।

আনোয়ারা খাতুন মাঝেমধ্যে টাকাপয়সা দিতে লাগলেন।

শেখ মুজিবের এক বন্ধু আছেন, সরকারি কর্মকর্তা, তিনি কিছু কিছু দিলেন। আর হাজি গিয়াসউদ্দিন নামে শেখ মুজিবের এক ব্যবসায়ী বন্ধু, কুমিল্লা বাড়ি, মুজিবের সাহায্যে সদা উদারহস্ত ছিলেন।

টাকাপয়সা জোগাড় করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হলো, তবে শেষ পর্যন্ত টাকা জোগাড়ও হয়ে গেল। তবে প্রতি ১০ দিন পর ১৫০ টাকা দেওয়া সত্যি একটা কঠিন কাজই ছিল মুজিবের পক্ষে।

মুজিব লাহোর থেকে প্লেনে সম্প্রতি ঢাকা এসেছেন। তাঁর কাছে আছে মহামূল্যবান সম্পদ, সোহরাওয়ার্দীর দুটো বিবৃতি। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকলেন। মওলানা ভাসানীর সঙ্গেও কথা বললেন। সবাই সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশনে রাজি।

সর্বসম্মতিক্রমে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে অ্যাফিলিয়েশনের প্রস্তাব গৃহীত হলো।

মুজিব স্বস্তি পেলেন। রাতের বেলা তাঁতীবাজারের বাসায় আবদুল হামিদ চৌধুরী আর মোল্লা জালাল উদ্দীনের সঙ্গে কথা বললেন এই নিয়ে। মেঝেতে মাদুর পেতে টিনের থালায় ভাত খাচ্ছেন তাঁরা।

মুজিব বললেন, 'আজকা আমি শান্তি নিয়া ঘুমাতে যাব, বুঝলা। লিডারের অ্যাফিলিয়েশনটা হয়ে গেল। আর লিডার যে বাংলা আর উর্দু—দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা চান, সরকারের জুলুম-নির্যাতন-গুলির প্রতিবাদ করেন, এইটাও আজকে পার্টির লোকেরা জানল। মানিক ভাইকে বিবৃতি দিয়া আসলাম *ইত্তেফাক*-এ বার হলে দেশের মানুষও জানবে।'

মোল্লা জালাল বললেন, '*ইত্তেফাক* এখন খুব চলে। যেইখানে যাই সেইখানেই দেখি লোকে *ইত্তেফাক* পড়ে। আরেকটা মাছ লও, মুজিবর।'

মুজিবের পাতে মাছ তুলে দিলেন মোল্লা জালাল।

শেখ মুজিব বললেন, 'দাও আরেকটা। আজকা আমার ক্ষুধাও বেশি। আজকা আমি দুইটা মাছ খেতে পারব।'

১৯.

তাজউদ্দীন ঘুম থেকে উঠেছেন ভোর সাড়ে চারটায়। রোজই তিনি খুব ভোরে ওঠেন তাতে দিনটা বড় হয়। অনেক কাজ করা যায়। বর্ষাকাল। পুরান ঢাকার ভাড়াবাড়ির জানালা দিয়ে তিনি দেখে নিলেন বৃষ্টিস্নাত ভোরে আলোর ফুটে ওঠা। তাজউদ্দীনের শরীর-মন চাঙা হয়ে উঠল। সারাটা দিন খুব গরম থাকে আজকাল। ভোরবেলা বৃষ্টি হলে খানিকটা ঠান্ডা পড়ে। আরাম বোধ হয়।

তাজউদ্দীন তাঁর টাইপ মেশিনটা নিয়ে টাইপ করে চলেছেন। একটা দরখাস্ত তিনি মুসাবিদা করছেন। যুবলীগের নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা আর অলি আহাদ ঢাকা কারাগারে বন্দী। তিনি তাঁদের মুক্তির ব্যাপারে তৎপর হয়েছেন। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিজি আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দরখাস্ত লেখাটা সেই তৎপরতার অংশ।

গতকাল তোয়াহা সাহেবের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন জেলগেটে। ভাবি দেখা করলেন তোয়াহা সাহেবের সঙ্গে। তাজউদ্দীন দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। কারাবাসের প্রধান শাস্তি এটিই যে, তোমার চলাচলের স্বাধীনতা হরণ হয়ে গেল। তুমি চাইলেও আর যেখানে খুশি যেতে পারবে না, নিজের পরিজনের সঙ্গে একত্র হতে পারবে না। দরখাস্ত করে, তারিখ নিয়ে এসে দেখা করতে হয়। তখনো প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো গোপন কথা, পারিবারিক কথা কে কাকে বলবে?

তোয়াহা সাহেব স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ভেতরে চলে যাচ্ছিলেন, তাজউদ্দীন এগিয়ে গেলেন তোয়াহা ভাই বলে। কয়েক মিনিট কথা হলো। তোয়াহা সাহেব বললেন, 'তোমার ভাবির দিকে খেয়াল রেখো। টাকাপয়সা কিছু হাতে নাই বলল।'

শুনে তাজউদ্দীনের বুকটা যেন একটু কেঁপে উঠল।

মোহাম্মদ তোয়াহা জোতদারের ছেলে। তাঁদের জমিজমার পরিমাণ অনেক। কোনোই অভাব তাদের পিতৃপরিবারের নেই। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা ছাত্রজীবন থেকেই সাম্যবাদের আদর্শে দীক্ষিত। ফলে তিনি বাড়ি

থেকে কোনো টাকাপয়সা নেন না। ভাষা আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। কাজেই আজ তাঁর এই কারাবাস। তাঁর স্ত্রী আজ অভাবের মুখে দিশাহারা। সে কথা তিনি বলতেও পারছেন না মুখ খুলে।

কত গুণ মোহাম্মদ তোয়াহার! তিনি খুব ভালো ছবি আঁকেন। শিশুর মতো সরল তাঁর আচার-ব্যবহার। হাসিটি যেন ফুলের মতো। সুদর্শন মানুষ। যুবলীগের কাউন্সিলের দিন তিনি পরেছিলেন ঘিয়ে রঙের গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট, সাদা শার্ট, কালো কার্ডিগান আর টাই। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলেন যুবলীগের অন্যতম সহসভাপতি তিনি।

আবার তাঁর সারল্যের গল্পও ঢাকার রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। একুশে ফেব্রুয়ারির পর সংগ্রাম কমিটির গোপন সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শান্তিনগরের এক বাসায়। পুলিশ এসে পড়লে একসঙ্গে সব নেতাকে পেয়ে যাবে, এই ভয় ছিল। তাড়াতাড়ি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও পরবর্তী কর্তব্য নিয়ে আলোচনা সারা হলো। সভা সমাপ্ত। সবাই সটকে পড়বে পুলিশ আসার আগেই।

ঠিক এই সময় নাকি তোয়াহা সাহেব পকেট থেকে ইয়া বড় এক তোড়া কাগজ বের করে তা পড়তে আরম্ভ করে দিলেন। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য আর মূল্যায়ন নিয়ে রচিত থিসিস। সময় পেরিয়ে যেতে লাগল। তোয়াহা সাহেবের থিসিস পাঠ আর শেষ হয় না। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলল। তাঁদের সভা থেকেই একজন কর্মী আগেভাগে বেরিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত সেই খবর দিয়েছে পুলিশে। পুলিশ তারপর এসেছে। তবু তোয়াহা সাহেবের থিসিস পাঠ শেষ হয়নি। একসঙ্গে অনেকজনকে পেয়ে গেল পুলিশ। যেন একবার জাল ফেলে পেয়ে গেল রাঘববোয়ালদের।

এই রকম সহজ-সরল একটা মানুষকে এইভাবে কারাবরণ করতে হচ্ছে! তাঁর স্ত্রী টাকাপয়সার কষ্টে ভুগছেন!

ফেরার পথে ভাবির সঙ্গে এইসব নিয়েই কথা বলতে লাগলেন তাজউদ্দীন। তাঁরা একটা টমটমে উঠেছেন। মুখোমুখি বসেছেন। ঘোড়ার গাড়ি ছুটছে, ভিড়ভাট্টা এড়িয়ে। সন্ধ্যা নামছে। বাতি জ্বলে উঠছে দোকানে দোকানে। লণ্ঠন জ্বালানো হচ্ছে রিকশার পেছনে। সারা দিন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। এখন বৃষ্টি নাই।

ভাবি বললেন, 'আপনার ভাই তো সরলসোজা মানুষ। বিয়ের পর তাঁর সঙ্গে ট্রেনে ঢাকা ফিরছি। তিনি আমাকে রেখে নেমে পড়লেন ভৈরব জংশনে। বললেন, দাঁড়াও, নাশতা কিনে আনি। সেই যে নামলেন, ট্রেন ছেড়ে দিল, তিনি আর ফিরলেন না। আমি গ্রামের মেয়ে। জীবনে ঢাকা শহর দেখিনি। কী

হবে আমার? আমি কাঁদতে আরম্ভ করে দিলাম। পরে শুনলাম, ট্রেনের হুইসেল শুনে আপনার ভাই দৌড়ে এসেছেন, কিন্তু ট্রেন ধরতে পারেননি। তারপর ভৈরব স্টেশন মাস্টারের কাছে গেছেন। তাঁকে দিয়ে ফোন করিয়েছেন ঢাকার স্টেশন মাস্টারকে। ঢাকার স্টেশন মাস্টারকে বলা হলো, আমাকে যেন ওয়েটিং রুমে বসিয়ে রাখে। আর এখনই যেন খবর পাঠানো হয় ফজলুল হক হলে। তিনি তো ফজলুল হক হলের ভিপি।

'আমি স্টেশনে নেমে কাঁদছি। সবাই যার যার গন্তব্যে চলে গেল। আমি কই যাব? এই সময় স্টেশন মাস্টার নিজে এসে পরিচয় দিলেন। ছাত্রকর্মীরা এল। তারা বলল, চলেন। আমি বললাম, আমি ওয়েটিং রুমেই বসি। উনি কি পরের ট্রেনে আসবেন না?'

তাজউদ্দীন অলি আহাদের মুক্তির জন্যও চেষ্টা করছেন। তিনি অলি আহাদের রাজনৈতিক জীবনের একটা প্রত্যয়নপত্রও টাইপ করলেন। সারা দিন বাসায়ই রইলেন। বৃষ্টি হলো দুপুরের দিকে। বিকালে বেরোলেন। যুবলীগ অফিসে গেলেন। সেখানে শুনতে পেলেন জামালপুরে গ্রেপ্তার অভিযান চলেছে, সেই খবর।

পরের দিন সকাল ১০টার দিকে ছাতা মাথায় তাজউদ্দীন হাজির হলেন ওয়ারী ডাকঘরে। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিআইজি আর স্বরাষ্ট্রসচিবের বরাবরে লেখা দরখাস্তগুলো রেজিস্ট্রি করে ডাকে ধরিয়ে দিলেন। ডা. করিমের চেম্বারে গেলেন। তাজউদ্দীন দুপুরের ট্রেনে শ্রীপুর যাবেন। শ্রীপুরের স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এদিকে অর্থনীতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাও করছেন। রাজনীতি করেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের চেয়েও প্রগতিশীল কোনো রাজনৈতিক দল করা যায় কি না, ইদানীং কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে তা-ই নিয়ে প্রায়ই কথা বলেন। গণতন্ত্রী দল নামে নতুন একটা সংগঠনের কথা বলাবলি হচ্ছে। কামরুদ্দীন আহমদ বলছেন, আমাদের ওয়েট অ্যান্ড সি নীতিতে চলতে হবে। দেখা যাক, আওয়ামী লীগ আরও অসাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে পারে কি না।

ডা. করিম তাজউদ্দীনের সঙ্গে চললেন ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন পর্যন্ত। তাজউদ্দীন বললেন, 'তোয়াহা ভাবিকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করব ভাবছি।'

ডা. করিম বললেন, 'তাহলে আমিও পঞ্চাশ টাকা দেব। আমারটাও কাল সংগ্রহ করে নেবেন।'

ট্রেন ছাড়ল দুপুর ১২টার পর। শ্রীপুর পৌঁছাল তিনটায়।
তাজউদ্দীন ট্রেন থেকে নামলেন।
আজ আর দুপুরে খাওয়া হলো না। গোসলও হয়নি।

২০.

মানিক মিয়া বললেন, 'মুজিব, আর তো পারি না। *ইত্তেফাক* তো বন্ধ করে দিতে হয়!'

ইত্তেফাক অফিসে মানিক ভাইয়ের টেবিলের সামনে বসে আছেন মুজিব।

টেবিলের ওপরে নানা কাগজের স্তূপ। পাশে দৈনিক পত্রিকা ফাইল করে রাখা। প্রুফ দেখছেন মানিক মিয়া। কালির গন্ধে তুঁত মেশানো আঠার গন্ধ।

শেখ মুজিব তাঁর চশমাটা খুললেন। তাঁর কপালেও দুশ্চিন্তার ভাঁজ। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সারা দেশ থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীরা চিঠি লেখেন মুজিবের কাছে, *ইত্তেফাক* পাঠাইয়া দিবেন। মানিক মিয়ার মুসাফিরের কলাম দারুণ জনপ্রিয়। এই অবস্থায় *ইত্তেফাক* বন্ধ হয়ে গেলে খুবই মুশকিল হবে।

মুজিব বললেন, 'আমি তো টাকাপয়সা জোগাড়ের কোনো উপায় করতে না পেরে শেষ ভরসা হিসাবে সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে টেলিগ্রাম করেছিলাম। লিখেছিলাম, অয়্যার টু থাউজান্ড *ইত্তেফাক* স্পেশাল অ্যান্ড অর্গানাইজেশন আদারওয়াইজ আনডান।'

মানিক মিয়া জিগ্যেস করলেন, 'সেই টেলিগ্রামের কোনো জবাব পেয়েছ?'

'জি না। এখনো পাই নাই।'

'তাইলে উপায়। যত সার্কুলেশন বাড়তেছে, তত খরচ বাড়তেছে। নিউজপ্রিন্ট কেনার টাকা নাই। সামনে ঈদ। একটা ঈদ স্পেশাল সাপ্লিমেন্ট বের করা উচিত।'

'নিশ্চয়ই। দেখি, আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে চিঠি লিখতে বসি।'

ইত্তেফাক অফিসে বসেই চিঠি লিখতে বসলেন মুজিব।

ইংরেজিতে লিখতে হয় সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে। তিনি বাংলা পড়তে পারেন না। তবে বাংলায় বক্তৃতা করতে পারেন।

প্রেরক :
শেখ মুজিবুর রহমান
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
৯৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা

প্রতি :
এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী, বার এট ল
১৩, কাচারী রোড, করাচি

জনাব,

আমার দুঃখ বেশ কিছু দিন হলো আমি আপনার কোনো চিঠি পাই নাই। সাংগঠনিক কাজ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে। জনাব আতাউর রহমান খান ও আমি উত্তরবঙ্গে ঝটিকাসফর শেষে গতকাল ঢাকা পৌঁছেছি। জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে।

একটাই প্রতিবন্ধকতা, তা হলো অর্থের অভাব। পাটের দাম কম হওয়ায় সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া যাচ্ছে না।

ইত্তেফাক চলছে। তবে কাগজটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বিশেষ সংখ্যা বের করা দরকার। তার মানে হলো অতিরিক্ত খরচ। স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা বের করা হয়েছিল, কিন্তু সামনে ঈদ, ঈদসংখ্যা বের করতে হবে ৩১ আগস্টে। এটা যদি আমরা বের না করি, তাহলে প্রচারসংখ্যা কমে যাবে, কারণ অন্য পত্রিকাগুলো সবাই ঈদের বিশেষ সংখ্যা করবে। কিন্তু এ জন্য যে অতিরিক্ত টাকা লাগবে, তার কোনো সংস্থান আমাদের কাছে নাই। যদি আপনি আমাদের উদ্ধারে এগিয়ে না আসেন, তাহলে কেবল ঈদসংখ্যা বের করা যাবে না, তা নয়, পুরো পত্রিকাটাই মুখ থুবড়ে পড়বে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটা আমাদের একমাত্র দুর্বল অঙ্গ।

শহীদ সাহেব, আপনি জানেন কখনো ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য আপনার দ্বারস্থ হই নাই, এবং আমরাও আপনার অসুবিধার কথা জানি।

আমি এরই মধ্যে আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি (কপি সংযুক্ত করলাম)। দয়া করে যেভাবেই হোক ব্যবস্থা করুন। না হলে আমাদের সব প্রয়াস জলে যাবে। আমরা হতাশায় নিমজ্জিত হব। আপনি জানেন, একটা বছর কত কষ্ট করে *ইত্তেফাক* বের করা হচ্ছে।

এটা আমার শেষ আবেদন, এটাকে আপনি গুরুত্বের সঙ্গে নিন। আপনি আতাউর রহমান সাহেব অথবা মানিক ভাই বরাবর টাকা পাঠাতে পারেন।

মুজিবুর রহমান

মানিক ভাইকে চিঠিটা দেখালেন তিনি। মানিক ভাই চিঠিটা খামে ভরে দিলেন। মুজিব ওপরে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ঠিকানা লিখলেন।

একজন পিয়নের হাতে চিঠিটা দিলেন মানিক ভাই।

মুজিব পকেট থেকে খুচরা পয়সা বের করে দিয়ে বললেন, 'এখনি ডাক ধরাও।'

২১.

মহিউদ্দিন আহমদ বিস্মিত, চিন্তিত। শেখ মুজিব এটা কী করলেন? কেনই বা করলেন?

মহিউদ্দিনের বাড়িতে এসেছেন মুজিব। তাঁর সঙ্গে দুজন অচেনা লোক। মুজিব বললেন, 'মহিউদ্দিন, তুই কিছু মনে করিস না। তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। এনারা দুইজনই পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক। এই ভদ্রলোক আমার ওপরে নজর রাখেন। আর ওনার ওপরে দায়িত্ব পড়েছে তোর ওপরে নজর রাখার। তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এনেছি। এই দুজনই আমার লোক। এদেরকে অবিশ্বাস করার কিছু নাই। আর আমাদের লুকানোরই বা কী আছে। আমরা কোথায় যাই, কার কাছে যাই, কী বলি, তা সরকারকে রিপোর্ট করে। তাতে একটা লাভ হয়, আমি সরকারের বিরুদ্ধে যা যা বলি, ওরা সব রিপোর্ট করে দেন ওপর মহলে। আমার সরকারবিরোধী

বক্তব্য সরকারের কাছে পৌছে যায়। আমিও তো চাই, আমার কথা সরকারের কান পর্যন্ত পৌছাক।'

মহিউদ্দিন আহমদ খুবই বিব্রত বোধ করছেন। তাঁর মনে শঙ্কা, সন্দেহ ও বিরক্তি। এসবির (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) লোকের কাজ এসবির লোক করবে, আমাদের কাজ আমরা করব। কিন্তু তাই বলে গোয়েন্দা বিভাগের লোককে বাড়ির বৈঠকখানায় বসতে দিতে হবে নাকি।

এসবির লোকটি মহিউদ্দিনকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেন। তাঁর বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করেন। মহিউদ্দিনের খুবই অস্বস্তি লাগে। তিনি এখন কী করবেন।

তিনি এক কাজ করলেন। তক্কে তক্কে থাকলেন, এসবির লোকটা কখন সরে যায়! হাজার হোক, মানুষ তো, স্নানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনে তাকে কখনো না কখনো আড়ালে যেতেই হবে। এমনি এক সুযোগে মহিউদ্দিন সোজা চলে গেলেন সদরঘাট। উঠে পড়লেন বরিশালের জাহাজে।

কয়েক দিন বরিশালে থেকে তিনি ফিরে এলেন ঢাকায়। নিজের বাড়িতে এসে উঠলেন আবার। এসবির ভদ্রলোক সোজা ঢুকে পড়লেন মহিউদ্দিনের বৈঠকখানায়। বললেন, 'আপনি আমাকে না বলে বরিশাল গিয়েছিলেন কেন? আমি তো আপনার বিরুদ্ধে উল্টো রিপোর্ট দিতে পারি?'

মহিউদ্দিন বললেন, 'আমি কোথায় যাব না যাব, তোমাকে বলে যেতে হবে নাকি? তোমার কাজ তুমি করবা, আমার কাজ আমি করব।'

সন্ধ্যাবেলা। বিকালে বৃষ্টি হয়েছে, এখন আকাশ পরিষ্কার। আকাশে মেঘের গায়ে লাল আভা। মহিউদ্দিন বসে আছেন বারান্দায়। শেখ মুজিব এসে হাজির। বললেন, 'চল, মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করে আসি। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।'

'উনি তো বন্দী অবস্থায় হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ। জেলখানায় শরীর খারাপ হয়ে পড়ছিল। মেডিকেল হাসপাতালে নিয়া আসছে। আমি তাঁকে কেবিনে রাখছি। খরচ আমরা চাঁদা তুলে দিই।'

'যাব যে, পেছনে তো ফেউয়ের মতো যাবে দুই এসবির লোক। বন্দীকে হাসপাতালে দেখতে গেলে যদি রিপোর্ট করে দেয়?'

মুজিব বললেন, 'তাতে আমার কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে ওখানে ডিউটিরত পুলিশদের। ওদের শাস্তি হতে পারে।'

'তাহলে কী করবা?'

'দেখা যাক কী করা যায়? একটা কৌশল করতে হবে।'

মুজিব আর মহিউদ্দিন হাঁটছেন। পেছনে পেছনে হাঁটছে দুই এসবির কর্মী। তারা একসময় পান-সিগারেটের দোকানে একটু থামল। মুজিব সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লেন শাঁখারীপট্টির এক সরু গলিতে। মহিউদ্দিনও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

তারপর দুজনে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে গেলেন একটা রিকশা। রিকশায় উঠে মুজিব হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'ভাই আমাদেরকে একটু ঢাকা মেডিকেল হসপিটালে নাও তো।'

হাসপাতালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত নেমে এল। তিনতলার কেবিনে রাখা হয়েছে ভাসানীকে। তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন।

কেবিনের সামনে পুলিশ ও কারারক্ষী। তারা সবাই ঝিমোচ্ছে। মুজিব ও মহিউদ্দিন সন্তর্পণে ঢুকে পড়লেন কেবিনের ভেতরে।

ভাসানী বলে উঠলেন, 'কে, কে?'

মুজিব বললেন, 'আমি শেখ মুজিব।

মহিউদ্দিন বললেন, আমি মহিউদ্দিন।'

ভাসানী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা এসেছ?'

মুজিব বললেন, 'মহিউদ্দিনকে নিয়া আসলাম হুজুর, ওকে তো আওয়ামী লীগের লোকেরা মানতে চায় না। ছাত্রলীগ আমাকে সংবর্ধনা দিল জেলমুক্তি উপলক্ষে, মহিউদ্দিন সেখানে উপস্থিত ছিল, তাকে ছাত্রলীগের ছেলেরা বক্তৃতা করতে দেয় নাই, এই জন্য নিয়া আসলাম, আপনি ওকে বলে দেন ও যেন মন খারাপ না করে।'

ভাসানীর চোখে জল, তিনি বললেন, 'আমি তো মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ, আমার বয়স হইছে, তোমরা তরুণ, ভবিষ্যৎ তোমাগো হাতে। তোমরা একলগে কাজ করবা। এইটাই তো আমি চাই।'

মুজিব আর মহিউদ্দিনের চোখও ছলছল করে উঠল।

মওলানা ভাসানীকে তাঁরা কখনো ভেঙে পড়তে দেখে নাই। আজ এই অসুস্থতা তাঁকে মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। তিনি মৃত্যুর কথা ভাবছেন।

মুজিব বললেন, 'হুজুর, ইনশাল্লাহ, আপনি আরও অনেক দিন বাঁচবেন। বাংলাকে জালিমদের হাত থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আপনার মুক্তি নাই।'

২২.

ফজলে লোহানী খানিক চিন্তিত। তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। গুন্ডা লাগিয়ে মার দেওয়া হবে।

তিনি এক কাপ চা সামনে রেখে কাপের হাতলে পেনসিল দিয়ে বাড়ি দিচ্ছেন। চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, তাঁর খেয়াল নাই।

তাঁর সামনে বসে আছেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। এই তরুণের আগমন দিনাজপুর থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

তরুণ কবি, সাংবাদিক, লেখক ফজলে লোহানী সম্পাদনা করেন একটা পত্রিকা—নাম *অগত্যা*।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এই পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাস লিখছেন, শিরোনাম *ভান্টু উবাচ*।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বললেন, 'মার দিতে যদি চেয়ে থাকে, তারা যে খুব অপ্রত্যাশিত কাজ করেছে, তা তো নয়। মুসলিম লীগ এখন তো গুন্ডানির্ভর দল। আর আমরা যা লিখি, তা তো মার খাওয়ার মতোই '

'তাই বলে মার তো আর খাওয়া যায় না।' ফজলে লোহানী বললেন।

'মার দিতে পারবে না, কারণ আমাদের অফিসটা ১০৫ ইসলামপুর, লায়ন সিনেমার গলিতে। না, কোনো লায়ন এসে গর্জন করে উঠে আমাদের বাঁচাবে, সে আশা করছি না।'

ফজলে লোহানী বললেন, 'বাঘের হুংকার আর সিংহের গর্জন, তাই তো কথাটা? নাকি উল্টাটা? আর হাতির ডাককে বলে...'

মুস্তাফা বললেন, 'বৃংহিত, ঘোড়ার ডাক হ্রেষা। কথা তা নয়। কথা হলো আমরা তো আছি কাদের সরদারের পক্ষপুটে। আমাদেরকে ঘাঁটাতে গুন্ডারা সাহস পাবে না। তবে আমরা যা লিখেছি, প্রহার কিন্তু আমাদের প্রাপ্য।'

মুস্তাফা মৃদু মৃদু হাসেন। 'আমার কি এক কাপ চা জুটবে না?'

অগত্যায় খুব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছাপা হয়, যদিও সাহিত্যও থাকে. লিয়াকত আলীর নাম এই পত্রিকায় ছাপা হয় 'লিয়াকৎ আলী'। কবি গোলাম মোস্তফার পাকিস্তানপ্রীতি উচ্চনিনাদে পর্যবসিত, তাই তার নাম 'গোলমাল মোস্তফা'।

আশরাফ সিদ্দিকী তাই এই পত্রিকায় 'অশ্রাব্য সিদ্দিকী'।

শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আতাউর রহমান, সাইয়ীদ আতীকুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুজ্জামানও এসে জুটেছেন এই *অগত্যার* দলে। প্রথম সংখ্যায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রবন্ধ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। আনিস চৌধুরী, তাসিকুল আলম খাঁ খুবই সক্রিয়।

অগত্যার চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয়েছে :

কার্টুন কাহাকে বলে?

—খাজা নাজিম উদ্দিনের ভালো পোর্ট্রেটকে।

লাইট মোর লাইট বলিয়া কে চেঁচাইয়াছিল?

—ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাইয়ের এক অন্ধ দারোয়ান।

ঢাকার 'ডাম এন্ড ডেফ' স্কুল কি উঠে গেছে?

—না, উঠে ইডেন বিল্ডিং (সচিবালয়) এ গেছে।

মুসলিম লীগে যোগ দিতে হলে কী কী কোয়ালিফিকেশনের দরকার?

—আপনাকে লিয়াকত আলীর মতো সত্য কথা বলতে হবে, ফজলুর রহমানের মতো বাঙালিদেরকে আদর করতে হবে, খুরোর মতো বুদ্ধিমান হতে হবে, খাজা শাহাবুদ্দিনের মতো বিদ্যাদিগ্‌গজ হতে হবে, নুরুল আমিনের মতো ছাত্রদের বন্ধু হতে হবে, আকরম খাঁর মতো পরহেজগার হতে হবে।

'পাগলে কিনা বলে' এ কথা এখন সবচেয়ে কার ওপরে বেশি প্রযোজ্য?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আমেরিকায় লিয়াকত আলী খাঁ ইদানীং কিছুই বলেননি কিন্তু।

আজাদ পাকিস্তানের ট্রেনে এখনো কেন 'আপনা টিকট্ আপনা খরিদো। মালকা উপ্পর নজর রাখ্‌খো; চোর, জুয়াচ্চোর ঔর পাকিটমার নজদিগ হৈ' এই কথাগুলো লেখা থাকে?

—এমএলএ-রা মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন কিনা।

অল ইন্ডিয়া রেডিওর নাম রাখা হয়েছে 'আকাশবাণী'। পাকিস্তান রেডিওর নাম কী রাখা উচিত?

—গায়েবী আওয়াজ।

একজন ভদ্রমহিলা একটা মাসিক পত্রিকা বের করেন। তাকে নিয়ে প্রশ্ন

ছাপা হয়েছে, তার মাসিক অনিয়মিত কেন?

মুস্তাফা পত্রিকার ফাইল ঘেঁটে এইসব পড়ছেন, আর আপন মনেই হেসে উঠছেন।

ফজলে লোহানী বললেন, হাসো কেন?

'মার খেলেও জিনিস আমরা ভালো করছি,' মুস্তাফা বললেন। চা এসে গেছে। চায়ে দুধের সর ভাসছে।

তিনি একুশে ফেব্রুয়ারির পর প্রকাশিত সম্পাদকীয়টা পড়লেন, 'সহস্র বর্ষের ভাব ভাবনায় যে ভাষা পুষ্ট, প্রেম আর সঙ্গীতে যে ভাষা মাধুর্যমণ্ডিত, লোককলা বিকাশে ও সংস্কৃতি বিকাশে যে ভাষা সম্ভারপূর্ণ, কোটি কোটি জাগ্রত মানবসন্তানের সে ভাষা আপন প্রাণ-প্রাচুর্যে অক্ষয়, শাশ্বত। সে জীবন্ত ভাষার মৃত্যু নাই।'

ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমি তাদের আমগাছের শাখা থেকে উড়ে আকাশে পাখা মেলে। তারা গানের সুরে বলতে থাকে, 'বাংলা ভাষার মৃত্যু নাই। বাংলা ভাষার মৃত্যু নাই।'

তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় কয়েকটা শালিক, তিনটা দোয়েল, দুটো ফিঙে আর একঝাঁক চড়ুই।

'বাংলা ভাষার মৃত্যু নাই।'

নিচে বসা হাফপ্যান্ট পরা কয়েকজন পুলিশ সচকিত হয়ে ওঠে। স্লোগান আসছে কোথা থেকে?

২৩.

লুৎফর রহমান সাহেব বললেন, 'আবার টাকা চায়? সে করতিছেটা কী। নাসের তো খুলনা থেকে মাঝেমধ্যে টাকা পাঠায়। আর সে বড় ছেলে। দুটো বাচ্চা আছে। তার কোনো দায়দায়িত্ব নাই? তাকে বললাম, ল পড়ো। অ্যাডভোকেট হও। যারা রাজনীতি করে সবাই তো অ্যাডভোকেট।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব, ফজলুল হক সাহেব, আতাউর রহমান খান সাহেব—সবাই তো উকিল। খোকা তো আমার কথা শুনল না। রাজনীতি কইরে বেড়াচ্ছে। বেড়াক। তাইলে বারবার খালি টাকার জন্য আসে কেন? ওরে কয়ে দাও, এবার আমি টাকা দিতে পারব না।'

সায়রা বেগম বললেন, 'তুমিই তো সব সময় ওকে টাকাপয়সা দিয়ে এসেছ। আজকে হঠাৎ করে এইসব বললে চলবে? নিশ্চয় খোকা বড় ঠেকায় পইড়েছে তা না হলে বরিশাল থেকে এইভাবে ছুইটে আসে?'

শেখ মুজিব বেরিয়েছেন পুরো দেশে সংগঠন গড়ে তোলার অভিযানে। আতাউর রহমান খানকে সঙ্গে নিয়ে সফর করেছেন উত্তরবঙ্গ। প্রতিটা জেলায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কমিটি গঠন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এই সফর। শুধু জেলায় নয়, মহকুমা শহরেও তাঁরা কমিটি দাঁড় করিয়ে দিয়ে এসেছেন। কোথাও বিপুল লোকসমাগম করে সভা হলো, কমিটি হলো, কোথাও আবার লোকসমাগম হয়েছে, কিন্তু মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা নাই, খালি গলায় ভাষণ দিতে হলো মুজিব আর আতাউর রহমান খানকে।

আরেক সহসভাপতি আবদুস সালাম খান একধরনের প্রতিযোগিতায় ভোগেন আতাউর রহমান খানের সঙ্গে। মুজিবকে ডেকে একদিন বললেন, 'আমি হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট, আর আতাউর রহমান খান জজকোর্টের অ্যাডভোকেট, আমি বয়সে তাঁর চেয়ে বড়, তুমি আমাকে সভাপতির কাজ না দিয়ে আতাউর রহমান সাহেবকে কেন দাও?'

মুজিব তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, 'খান সাহেব ঢাকায় আগে থেকে আছেন, আপনি নতুন এসেছেন, আস্তে আস্তে কর্মীরা আপনার পরিচিত হোক, আপনাকেই বেশি বেশি করে সভাপতিত্ব করতে দিব।'

ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাই একবার আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন, আরেকবার করেন আব্দুস সালাম খান। উত্তরবঙ্গে আতাউর রহমান গেছেন, কাজেই দক্ষিণবঙ্গে মুজিবের সফরসঙ্গী হলেন সালাম খান।

বরিশাল সফর শেষে মুজিব চলে এসেছেন টুঙ্গিপাড়ায়।

হাসু তার কোল দখল করে ফেলল। এবার কামালও আব্বাকে চিনতে পারছে। সে-ও আরেক কোলে এসে উঠল।

রেনু বললেন, 'তুমি এসেছ, এটাই আমার কাছে বড় কথা। কিছু টাকা আমি জোগাড় করে রেখেছি। তোমাকে দিব। তুমি চিন্তা কোরো না।'

শেখ মুজিব রেনুর মুখের দিকে তাকালেন। এই মেয়েটি সর্বংসহা হয়ে জন্মেছে। যত দুঃখকষ্ট সব নীরবে মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে।

মুজিব বললেন, 'আমার তো কোনো বাজে খরচ নাই। একটাই বাজে খরচ, সে হলো সিগারেট। তবে এইবার সিগারেটটাও ছেড়ে দিব।'

শেষ পর্যন্ত লুৎফর রহমান সাহেব টাকা দিলেন ছেলের হাতে। বললেন, 'বেশি দিতে পারলাম না।'

মুজিব বললেন, 'যা দিয়েছেন, তাই অনেক, আব্বা।'

লুৎফর রহমান বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না। যা বলি, তোমার ভালোর জন্যই বলি। আমার নিজের কোনো কিছু চাইনে। তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। এখন তো আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালে চলবে না।'

মুজিব বললেন, 'আমি আওয়ামী লীগটা একটু গুছায়ে নেই। মওলানা ভাসানী আর শামসুল হক সাহেব মুক্তি পেয়ে গেলে আমি আর পার্টির পিছনে এত সময় দিব না। তখন একটা কিছু করব।'

লুৎফর রহমান সাহেব হেসে বললেন, 'তুমি কোনো দিনও পার্টির পিছনে সময় না দিয়ে থাকতে পারবা না। ঠিক আছে। যা করতিছ, ভালোভাবে কোরো।'

বিদায়বেলা সব সময়ই করুণ হয়। হাসু ছাড়তে চায় না। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কামাল। এবার সে-ও তার হাত ধরে ঝুলে পড়তে চায়।

মুজিব দুজনকেই কোলে তুলে নিলেন। চুমু দিলেন।

রেনু মুখখানা হাসি হাসি করে বিদায় দিচ্ছেন। কিন্তু তার চাহনিতেই যেন করুণ একটা মিনতি ঝরে পড়ছে।

আব্বা আম্মাকে কদমবুসি করে মুজিব নৌকায় উঠলেন। বাচ্চা দুটোকে ধরে রইলেন রেনু।

মাঝি নৌকার বাঁধন খুলল।

নৌকা চলতে শুরু করল।

মুজিবের মনে হলো, আব্বার সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন তিনি। আব্বার দলের সঙ্গে তাঁর দলের ফুটবল ম্যাচও হয়েছে। আর মনে পড়ল আব্বার অসুস্থতার সেই দিনটার কথা, যেদিন মুজিবের উপস্থিতি মৃত্যুপথযাত্রী আব্বাকে ফিরিয়ে এনেছিল যমের দুয়ার থেকে।

শরতের অপরাহ্ণ। খাল জলে ভরা। এখন জোয়ার। নৌকা চলছে তরতরিয়ে। আকাশ রোদে ঝলমল করছে। আর আকাশে সাদা মেঘ।

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!...

মুজিব বিড়বিড় করতে লাগলেন। বৈঠার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ সেই অনুচ্চ কণ্ঠ আবৃত্তির সঙ্গে যেন তাল মেলাচ্ছে।

২৪.

কবি আহসান হাবীব থাকেন মাহুতটুলীতে। ঠাঁটারীবাজারে ৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোডের বাড়ি থেকে প্রায়ই আনিসুজ্জামান চলে যান কবির বাড়িতে।

আনিসুজ্জামান তাঁকে চেনেন অন্তত ছয় বছর আগে থেকে। তখন হয়তো আনিসুজ্জামানের বয়স ৯। কীভাবে যে তাঁর সঙ্গে কবির পরিচয়, তিনি মনেও করতে পারেন না।

আনিসুজ্জামানরা ছিলেন কলকাতায়। আহসান হাবীবও। তিনি কলকাতা বেতারে কাজ করতেন। ছোটদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। আর *দৈনিক ইত্তেহাদ*-এর তিনি ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। আবার *ইত্তেহাদ*-এর ছোটদের পাতা মিতালী মজলিসের পরিচালক হিসাবে সবাই তাঁকে ডাকত মিতাজি বলে। আনিসুজ্জামানও তা-ই ডাকতেন।

আহসান হাবীব থাকতেন আনিসুজ্জামানদের কলকাতার বাসার পেছনেই একটা বাসায়। ওই বাসায় আরও দুজন সাংবাদিক থাকতেন।

আহসান হাবীবের কলকাতার বাসাতেই অনেক বার গেছেন আনিসুজ্জামান।

আর যেতেন *ইত্তেহাদ* অফিসে। কবি নিজের কবিতা কিশোর আনিসুজ্জামান ও তাঁর সঙ্গী কমলকে পড়ে শোনাতেন। কখনো ডাকে আসা কোনো কবিতা তাঁদের হাতে ধরিয়ে বলতেন, দেখো তো কবিতাটা তোমার কেমন লাগে। কবির কবিতা আর ছড়া শুনে কিশোর দুজন মুগ্ধ হয়ে যেত। কবির বিয়ের বরযাত্রীও হয়েছিল এই দুই কিশোর। হাফপ্যান্ট পরা আনিসুজ্জামান কবিকে বলতেন, 'আপনার 'হকনামভরসা' আর 'একরারনামা' কবিতা দুটো সবচেয়ে ভালো।'

'আর তোমাদের জন্য লেখা "ভেংচি"?'

'ওটাও খুবই ভালো।'

কবি আহসান হাবীব প্রসন্নভাবে হাসতেন। সেই হাসিতে প্রশ্রয় থাকত, থাকত খানিকটা মুগ্ধতাও।

কবির প্রথম কবিতার বই *রাত্রিশেষ* প্রকাশের ঘটনার সাক্ষী আনিসুজ্জামান। আহসান হাবীব বললেন, 'জানো, *রাত্রিশেষ* বইয়ের কভার কে আঁকছেন?'

'কে?'

'জয়নুল আবেদিন।'

তারপর একদিন আহসান হাবীব চলে এলেন বালক আনিসুজ্জামানের বাসায়। হাতে সেই *রাত্রিশেষ*-এর জয়নুল-অঙ্কিত প্রচ্ছদ। আনিসুজ্জামানের মনে হলো, বেশি কালো।

বলেও ফেললেন সেই কথা। কবি মৃদু হাসলেন।

এখন আইএ ক্লাসে পড়েন আনিসুজ্জামান। থাকেন ঢাকায়। কলকাতার দিনগুলোতে দেখা তার শৈশবের সেই নায়ক আহসান হাবীব এখনো তাঁর চোখে নায়কই।

এখন ঢাকায়, মাহুতটুলীতে কবির বাসায় গেছেন ১৫/১৬ বছর বয়সী আনিসুজ্জামান।

কবি বললেন, 'আমার একজন সহকারী দরকার। আমার দ্বিতীয় কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে সে সাহায্য করতে পারবে। নকলনবিশিই প্রধান কাজ। তবে এর বাইরেও টুকটাক কাজ করতে হতে পারে। পারিশ্রমিক খুব সামান্য।'

আনিসুজ্জামান বললেন, 'হাবীব ভাই, আপনার কবিতার বইয়ের কাজ আমি বিনা পারিশ্রমিকেও করে দিতে রাজি আছি।'

আনিসুজ্জামান কবির বাসায় যান সপ্তাহে চার দিন। মাসোহারা ১০ টাকা। পাণ্ডুলিপি নকল করেন। তাঁর পছন্দের কবিতা কবি যখন বাদ দিয়ে দেন, তখন আপত্তি করেন।

এর মধ্যে আনিসুজ্জামান পড়ে গেলেন জ্বরে।

কবির বাড়িতে আর যাওয়া হয় না।

জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই বন্ধুরা এসে ধরে বসল, মানসী সিনেমা হলে চল, সিনেমা দেখতে।

আনিসুজ্জামান গেলেন মানসী হলে।

তার এক দিন পর কবির বাড়িতে উপস্থিত হলেন তিনি।

কবি বললেন, 'এ কদিন আসোনি কেন?'

'জ্বর হয়েছিল হাবীব ভাই,' বললেন আনিসুজ্জামান।

'তোমাকে পরশু দিন মানসী হলে দেখলাম বলে মনে হলো!'

'জি।'

তিনি আর কিছু বললেন না। আনিসুজ্জামানও আর আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে পারেন না। একসঙ্গে যে দুটোই ঘটা যে সম্ভব, এটা এখন কবিকে তিনি কেমন করে বোঝাবেন?

এরপর কাজের আনন্দ গেল চলে। নিয়ম করে কবির বাড়ি যান, কবিতা নকল করেন, কিন্তু কাজে যে মন নাই, সেটা বেশ বুঝতে পারেন কবি।

আহসান হাবীব বললেন, 'তোমার বোধ হয় ব্যস্ততা বেড়েছে। এখন সময় করতে একটু কষ্ট হচ্ছে!'

'জি।'

এরপর মাসোহারার বিনিময়ে কাজের চুক্তি গেল টুটে। এরপর কবির বাড়িতে অনেকবারই গেছেন আনিসুজ্জামান, কিন্তু কাজের উপলক্ষে নয়।

আনিসুজ্জামান ওই অল্প বয়সেই যোগ দিয়েছেন পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে। তার সভাপতি কাজী মোতাহার হোসেন। একবার সাহিত্য সংসদে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য নিয়ে আলোচনা হবে। কাজী সাহেবের কাছে তরুণেরা গেলেন সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাতে। কাজী সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'সুকান্ত কে?'

তখন আনিসুজ্জামান তাঁকে সুকান্তের কবিতার বই দিয়ে এলেন।

নির্দিষ্ট দিনে কাজী সাহেব তাঁর ছেলের শার্ট গায়ে দিয়ে এলেন সভাপতিত্ব করতে। ওপরের বোতামঘরে নিচের বোতাম লাগানো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিজ্ঞানী লেখক কাজী সাহেবের ভুলোমনের কথা কিংবদন্তিতুল্য। তিনি নিজের বাড়ির অবস্থান ভুলে গিয়ে পাড়ার রাস্তায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে লোকজনকে জিগ্যেস করেছেন, কাজী মোতাহার হোসেনের বাড়ি কোনটা? লোকেরা দেখিয়ে দিলে তিনি নিজের বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলেন, এই গল্প তখন প্রচলিত ছিল।

সভাপতির ভাষণে কাজী সাহেব বললেন, 'এই সভার আগে আমি সুকান্তের নাম শুনিনি। আমার ছেলে কাজী আনোয়ার হোসেনকে জিগ্যেস করলাম। সে বলল, সুকান্ত একজন কবি। এমনকি তার লেখা গানও আছে। ছেলেই আমাকে দুটো গান গেয়ে শোনাল। তারপর আমি এদের সংগ্রহ করে দেওয়া তার একটা কাব্যগ্রন্থও পড়লাম। কিছুকাল আগে আমি *ভাঙা তলোয়ার* নামে একটা কাব্য পড়েছিলাম। সুকান্তর কবিতা পড়ে মনে হলো, এ ভাঙা তলোয়ার নয়।

আরও পরে আরেকটা অনুষ্ঠানে আনিসুজ্জামানকে দেখিয়ে কাজী সাহেব বললেন, 'এদের একটা সাহিত্য সংগঠন আছে। তারপর শুধালেন, এই, কী যেন নাম তোমাদের সংগঠনের?'

'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ,' বললেন আনিসুজ্জামান। কিন্তু বলতে পারলেন না, 'স্যার, আপনিই আমাদের সংসদের সভাপতি!'

২৫.

এ কে ফজলুল হক আর ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবস্থান ভিন্ন হয়ে গেল।

তাঁরা দুজনেই এসেছেন পূর্ব বাংলা থেকে করাচিতে। গণপরিষদের অধিবেশনে অংশ নেবার জন্য। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সবার আগে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব এই পরিষদেই চার বছর আগে উত্থাপন করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেলে সে খবর পৌঁছে যায় বাংলায়, আর জেগে ওঠে বাংলার ছাত্রসমাজ। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে দুবার তিনি গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দুপুর একটার দিকে একবার রিকশায় করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যাচ্ছিলেন আইন পরিষদ ভবনের দিকে। সঙ্গে ছিলেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। হোস্টেলের ছাত্ররা তাঁদের দেখতে পেয়ে আহ্বান জানায়, আহত ছাত্রদের দেখতে হোস্টেলে চলুন।

ধীরেন্দ্রনাথ হোস্টেলে গিয়েছিলেন। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে পুলিশের পিটুনি খাওয়া ছেলেরা। তাদের চোখ লাল হয়ে আছে কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ায়।

তিনি সজল চোখে বলেছিলেন, 'আমি অবশ্যই পরিষদে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের কাছে এই অত্যাচার-নির্যাতনের কৈফিয়ত চাইব।'

দুপুরে শুরু হয়েছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশন।

ততক্ষণে গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছে গেছে তাদের কাছে।

তিনি বললেন, 'একটু আগে পুলিশের নির্যাতনে আহত ছাত্রদের আমি দেখে এসেছি। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এখন আমরা জানতে পেরেছি পুলিশ ছাত্রদের ওপর গুলি চালিয়েছে। আমরা কি এখন এইখানে বসে আলোচনা করব, যখন আমার ছাত্র ভাইদের

ওপরে গুলি চলছে। না। যতক্ষণ না আমি স্বচক্ষে দেখে আসছি পরিস্থিতি কী, যতক্ষণ না গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্ত চলছে, ততক্ষণ এই পরিষদের কার্যক্রমে অংশ নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

এই প্রতিবাদের মুখেও নুরুল আমিন অধিবেশন চালিয়ে যেতে চাইলেন।

হট্টগোলের মধ্যে স্পিকার অধিবেশন মুলতবি করে দিলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কয়েকজন পরিষদ সদস্য চলে গেলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

হাসপাতালের মেঝেয় শুয়ে কাতরাচ্ছে আহত ছাত্ররা।

তাঁর চোখ ভিজে উঠল। তিনি ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'এটা নারকীয় হত্যাকাণ্ড। আর একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞ।' মাটিতে শায়িত কয়েকজন আহত ছাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা সবাই আমার প্রণাম গ্রহণ করো।'

এ কে ফজলুল হক ২২ ফেব্রুয়ারির শহীদদের জানাজায় আরও হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সেই জানাজা থেকে মিছিল নবাবপুর রোডের দিকে এগিয়েছিল। রক্তাক্ত জামা হয়ে উঠেছিল পতাকা।

আজ, ১৯৫২ সালের ১০ এপ্রিল, করাচিতে গণপরিষদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক, এই প্রস্তাব উথাপন করেছেন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত সদস্য নূর আহমদ। তিনি কিন্তু বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন না, বাংলাকে সরাসরি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন।

অ্যাসেম্বলির কার্যক্রম চলছিল এভাবে :

মি. নূর আহমেদ (পূর্ব বাংলা, মুসলিম লীগ) : 'স্যার, আমার প্রস্তাব, বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হোক, এই হলো এই অ্যাসেম্বলির মত।

'স্যার, আমার বক্তব্য এই অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যর কাছে স্বতঃপ্রমাণিত ও পরিষ্কার। কাজেই আমি এর সমর্থনে কোনো বক্তব্য পেশ করব না।'

সভাপতি : 'আপনি কী বক্তব্য রাখতে চান?'

নুরুল আমিন (পূর্ব বাংলা, মুসলিম লীগ) : 'উনি এরই মধ্যে ওনার বক্তব্য বলে ফেলেছেন।'

সরদার শওকত হায়াত খান (পাঞ্জাব, মুসলিম লীগ) : 'একজন সরকারি নেতা তার কথা বলায় বাধা দিচ্ছেন।'

সভাপতি : 'প্রস্তাব উত্থাপিত হলো : বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হোক, এই হলো এই অ্যাসেম্বলির মত।'

পীরজাদা আবদুস সাত্তার খান (সিন্ধু, মুসলিম লীগ) : 'রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটা এখনই করার কোনো প্রয়োজনীয়তাও নাই। সময়ের ধারায় যখন প্রয়োজনীয়তা আসবে, তখন এই অ্যাসেম্বলি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

'আমার এই সংশোধনী পরিষ্কার এবং এটা আর কোনো ব্যাখ্যা দাবি করে না।'

সভাপতি : 'এই সংশোধনী উপস্থাপিত হলো : রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এটা এখনই করার কোনো প্রয়োজনীয়তাও নাই। সময়ের ধারায় যখন প্রয়োজনীয়তা আসবে, তখন এই অ্যাসেম্বলি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।'

সরদার শওকত হায়াত খান : 'স্যার, আমি খুবই দুঃখিত ও বিস্মিত যে, সরকারদলীয় একজন সদস্য একটা প্রস্তাব আনলেন, আরেকজন সদস্য সেটা স্থগিত করার চেষ্টা করছেন।'

এরপর পাঞ্জাবের সরদার শওকত হায়াত খান অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বক্তব্য দিলেন। তিনি বললেন, বাংলা পাকিস্তানের ৪ কোটি ৯ লাখ লোকের ভাষা। অবশ্যই তাদের দাবি মানতে হবে। তিনি মনে করেন, উর্দু ও বাংলা দুটোই যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হয়, তাহলে তা দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ও বন্ধন আরও দৃঢ় করবে। তিনি বলেন, সাহসী হতে হবে, সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করতে বর্তমানের চাহিদা, এটাকে স্থগিত করা উচিত হবে না, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার করার প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে।

এরপর উঠলেন এ কে ফজলুল হক। ৮০ বছর তাঁর বয়স। ঢাকা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল। তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলার প্রতিটি মানুষ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। তবু আমি বলব, আপাতত এই প্রস্তাব ভোটে দেওয়ার কোনো দরকার নাই। এটা স্থগিত থাকুক।'

সরদার শওকত হায়াত খান বললেন, 'আপনি কেন স্থগিত করতে চাচ্ছেন প্রস্তাবটা।'

ফজলুল হক বললেন, 'আমি খোলাখুলিভাবে বলি। আজ ভোট হলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব ভোটে হেরে যাবে।'

ফজলুল হকের এই ধারণার পেছনে বাস্তব কারণ আছে। তিনি দেখলেন, সরকারি দলের নূর আহমেদ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, কিন্তু তাঁর পক্ষে কোনো

বক্তব্য দিলেন না। সরকারদলীয় সব সদস্যই মুখে কুলুপ এঁটে আছেন। তিনি তাই আজ এটা স্থগিত রাখার পক্ষে। সুসময় আসুক। আবার এই প্রস্তাব অ্যাসেম্বলিতে তোলা হবে। তখন ভোট হবে।

এই সময় উঠে দাঁড়ালেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি এ কে ফজলুল হকের মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, 'বাংলার প্রতিটা মানুষ রাষ্ট্রভাষা বাংলা চায়। যে শিশু কথা বলে ভাঙা ভাঙা, সে-ও স্লোগান দিচ্ছে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"।'

পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ঢাকায় প্রাদেশিক পরিষদে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং পাস করিয়ে নিয়েছিলেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি মনে করেন, এই প্রস্তাবের সুরাহা এখনই করতে হবে, আর তা করতে হবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সকলে মিলে ভোট দিয়ে।

তাঁকে সমর্থন জানালেন পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত আরেক গণপরিষদ সদস্য শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বললেন, 'নূর আহমেদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাবটা এমনভাবে উত্থাপন করলেন, যেন তিনি মৃতের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে মন্ত্র পড়ছেন। তিনি প্রস্তাবের সমর্থনে একটা বাক্যও ব্যয় করলেন না। অথচ অন্য সময় তিনি কত কথা বলেন। পরিষদে যখন তিনি বক্তৃতা করতে ওঠেন, স্পিকার বারবার বলেও তাঁকে থামাতে পারেন না। যা-ই হোক, ছাত্ররা যখন ভাষা আন্দোলন করছিল পূর্ব বাংলায়, প্রধানমন্ত্রী তখন তড়িঘড়ি করে প্রাদেশিক আইন পরিষদে দৌড়ে গিয়ে প্রস্তাব পাস করেছেন যে, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।'

নুরুল আমিনের সঙ্গে শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের তর্ক লেগে গেল।

নুরুল আমিন দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি কোথায় পেলেন এসব কথা?'

শ্রীশ বললেন, 'আপনি কি রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে সমর্থন করেন নাই?'

'আপনি কেন আমার মুখে এমন উক্তি বসাচ্ছেন যা আমার মুখ থেকে বের হয় নাই?'

'আপনি কি প্রস্তাবটা উত্থাপন করেছিলেন, নাকি করেন নাই?'

'আমি অন্য কিছু বলেছিলাম।'

'আচ্ছা, প্রস্তাবটা কী ছিল, যেটা আপনি উত্থাপন করেছিলেন?'

'আপনি নিজেই পড়ে শোনান।'

'আমি তো সেখানে ছিলাম না। প্রাদেশিক পরিষদের আমি মেম্বার নই। আমি তো কোনো কপিও পাই নাই। আমি সংবাদপত্রে দেখেছি।'

'তাহলে আপনি আমাকে উদ্ধৃত করছেন কেন? আপনি কেন একটা বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন যার কপি আপনি পড়েনই নাই?'

'খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরিয়েছে, আপনি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং বলেছেন আপনি এখানে আসবেন, এই হাউসকে রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার প্রস্তাব পাস করিয়ে নেবেন।'

শেষে দুটো প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হলো। 'বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক' আর 'রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আপাতত স্থগিত থাকুক'।

৪১-১২ ভোটে স্থগিত রাখার প্রস্তাব পাস হলো।

এ কে ফজলুল হক ভোট দানে বিরত রইলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলা করা হোক—প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন। বলা দরকার, নূর আহমেদ নিজেই তাঁর প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেন।

ব্যাপারটা যে ষড়যন্ত্র ছিল, তা বুঝতে এ কে ফজলুল হকের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না।

তবু ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন খারাপ করলেন। এ কে ফজলুল হক কেন স্থগিতের পক্ষে বললেন। এই প্রস্তাব আজ যদি ভোটে বাতিল হয়ে যায়, পূর্ব বাংলার মানুষ আবার ঝাঁপিয়ে পড়ত সংগ্রামে।

খাজা নাজিম উদ্দিন, নুরুল আমিনদের আসল চেহারা মানুষের সামনে উন্মোচিত করে দেওয়াই তো ভালো ছিল।

২৬.

বিমান ছাড়বে ২৪ তারিখে। টিকিট বুকিং দেওয়া আছে। কিন্তু টিকিট কিনে ফেলা যাচ্ছে না, কারণ পাসপোর্ট হয়নি। ২৩ তারিখ পেরিয়ে গেল। পাসপোর্ট আসে না।

১৬ তারিখের দিকে খবর এল, পিকিং থেকে দাওয়াত এসেছে। শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ। পুরো পাকিস্তান থেকে ৩০ জন আমন্ত্রণ পেয়েছেন, পূর্ব বাংলা থেকে মাত্র পাঁচজন আছেন সে কাফেলায়। আতাউর

রহমান খান, *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, *যুগের দাবী* পত্রিকার সম্পাদক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, উর্দু লেখক ইউসুফ হাসান এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

যুগের দাবী ছিল যৌনপত্রিকা। ভাষা আন্দোলনের পর অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে, *যুগের দাবী*ও যৌনতা বিসর্জন দিয়ে সমাজ ও রাজনীতি-বিষয়ক পত্রিকা হয়ে উঠেছে।

আমন্ত্রণ পেয়েই পূর্ব বাংলার ডেলিগেটরা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলেন। কিন্তু পাসপোর্ট আর আসে না। পাসপোর্ট আসবে করাচি থেকে। সেখানেও পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে লোক গিয়ে ছোটাছুটি করছেন।

ঢাকাতেও আতাউর রহমান খান সচিব-উপসচিবের সঙ্গে দেখা করে জরুরতটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

সরকার আসলে নাখোশ। কমিউনিস্ট দেশে যাচ্ছে, কিসের শান্তি সম্মেলন, আসলে তো কমিউনিস্টদের সম্মেলন। এরা নিজেরাও কমিউনিস্ট না হলে কি আর আমন্ত্রণ পায়?

পাসপোর্ট এল ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫২, যাতে তখন আর প্লেনের টিকিট কেনা ও প্লেন ধরার সময় না থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বিমান আসেনি, লেট আছে, ২৪ ঘণ্টা লেট।

এই পাঁচজনের চারজন দৌড়াদৌড়ি করে সব গুছিয়ে নিলেন।

শুধু তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া আরাম করে ঘুমোচ্ছেন।

সকাল সকাল তাঁর বাড়িতে হাজির হলেন শেখ মুজিব।

মানিক মিয়াকে ঘুম থেকে তোলাই যায় না। তাঁর এক কথা, 'আপনারা যান। বেড়িয়ে আসেন। আমি যাব না। *ইত্তেফাক* কে দেখবে? বিজ্ঞাপন কে জোগাড় করবে? লিখবে কে?'

মুজিব ধরলেন মানিক মিয়ার স্ত্রীকে, 'ভাবি, আপনি কেন যেতে বলছেন না মানিক ভাইকে, ১০-১৫ দিনের ব্যাপার, তিনি চীন গেলে নতুন চীনের কথা লিখতে পারবেন, দেশের মানুষ জানতে পারবে। কাপড় কোথায়? সুটকেস কোথায়? আনেন। গোছান। মানিক ভাই, ওঠেন। আপনি না গেলে আমি যাবই না।'

মানিক মিয়া জানেন মুজিব নাছোড়বান্দা। অগত্যা উঠলেন।

'তাড়াতাড়ি করেন। ১০টার মধ্যে আমরা আতাউর রহমান সাহেবের বাড়ি যাব। সেখান থেকে ১১টার মধ্যে এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে হবে।'

তেজগাঁও বিমানবন্দরে তাঁরা পৌঁছে গেলেন ১১টার মধ্যেই।

তখনো তাদের বিমান আসেনি। তাঁরা চেক-ইন করে নিলেন।

ফ্লাইট এসে অবতরণ করল।

সরকারের কারসাজি বৃথা গেল।

প্লেন ২৪ ঘণ্টা লেট হওয়ার সুবাদে তাঁরা চীনের পথে আকাশে উড়াল দিতে সক্ষম হলেন।

প্রথমে তাঁরা নামলেন রেঙ্গুন। তারপর ব্যাংকক। সেখান থেকে হংকং। তারপর ট্রেনে করে ক্যান্টন।

ক্যান্টন থেকে বিমানে করে দেড় হাজার মাইল চীনের ভেতরে উড়ে যেতে হবে পিকিং।

সুন্দর ট্রেন। প্রতি তিনজনের জন্য একজন করে দোভাষী। মালপত্রের দায়িত্ব সব স্বেচ্ছাসেবকেরা নিয়ে নিয়েছে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা এইসব দায়িত্ব পালন করছে। ট্রেনের মধ্যে আছে খাওয়া আর ঘুমোনোর সুব্যবস্থা। ট্রেনের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত হেঁটেই চলাচল করা যায়। মুজিব হেঁটে হেঁটে এমাথা-ওমাথা করলেন।

মানিক মিয়া ঝিমোচ্ছেন। মুজিব ফিরে এলে বললেন, 'ভাই মুজিবর, কই গেছলেন?'

'এই তো মানিক ভাই, ট্রেনের এমাথা-ওমাথা ঘুরে দেখলাম।'

'কী দেখলেন?'

'প্রত্যেকটা মুখ উজ্জ্বল। মনে হচ্ছে, নতুন দেশ, নতুন মানুষ। মাত্র তিন বছর হলো স্বাধীনতা পেয়েছে, এর মধ্যে এত জাগরণ এরা সৃষ্টি করল কীভাবে। মনে হচ্ছে, আফিম খাওয়া জাত জেগে উঠেছে। আর আফিম খায় না। আর আমরা স্বাধীন হলাম পাঁচ বছর। আমরা তো ঘুমিয়ে পড়লাম। শাসকদের অযোগ্যতা আমাদের সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিল।'

ক্যান্টনে ওরা পৌছালেন সন্ধ্যার পর। শত শত ছেলেমেয়ে ফুলের তোড়া নিয়ে এসে হাজির।

স্থানীয় শান্তি কমিটির লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল পার্ল নদীর ধারে বিরাট হোটেলে।

রাতেই শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে ভোজ, ভোজের পর বক্তৃতা। মুজিব খন্দকার ইলিয়াসকে বললেন, 'এরা দেখি বাঙালিদের মতোই বক্তৃতা করতে আর বক্তৃতা শুনতে ভীষণ ভালোবাসে। আর ভালোবাসে হাততালি দিতে। কথায় কথায় তালি দেয়। অগত্যা অতিথিদেরও হাত নড়াতে হয়।'

সকালবেলা তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন এয়ারপোর্টের উদ্দেশে।

এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে ক্যান্টন শহরটাকে দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছেন মুজিব। তাঁর মনে হলো, এই প্রদেশটা বাংলার মতোই সুজলা-সুফলা। পিকিংয়ের উদ্দেশে প্লেন ছাড়ল। প্লেনের জানালা দিয়েও তিনি নিচের ভূদৃশ্য অবলোকন করতে লাগলেন। বাহ্, কত সুন্দর!

বিকালবেলা তাঁরা পৌঁছালেন পিকিং এয়ারপোর্টে। শিশুরা তাঁদের হাতে তুলে দিল ফুলের তোড়া। পিকিং শান্তি কমিটির সদস্যরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভারতবর্ষের কয়েকজন প্রতিনিধির।

তারপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো পিকিং হোটেলে। বিশাল হোটেল। বড় বড় রুম।

শান্তি সম্মেলন শুরু হয়েছে। ৩৭টা দেশের ৩৭৮ জন সদস্য যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে। ৩৭টা দেশের পতাকা উড়ছে। শান্তির প্রতীক পায়রার প্রতিকৃতি দিয়ে পুরো মিলনায়তন সাজানো হয়েছে সুন্দরভাবে। প্রত্যেক টেবিলে হেডফোন আছে। পাকিস্তানের ৩০ জন প্রতিনিধি একসঙ্গে বসেছেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা শুরু করলেন। ৩৭টা দেশের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে প্রত্যেক দেশের একজন বা দুজন করে নিয়ে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো।

হেডফোনে অনুবাদ শোনা যাচ্ছে। ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ ও রুশ ভাষায় বক্তব্য অনূদিত হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেকেই বক্তৃতা দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে কথা বলবেন দুজন। আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান।

আতাউর রহমান ভাষণ দিলেন ইংরেজিতে। শেখ মুজিব ভাবছেন তিনি কী করবেন। ইংরেজি বক্তৃতা তিনি দিতে পারেন, অনেক জায়গায় দিতেও হয়েছে। পাকিস্তানেই তিনি সব বক্তৃতা সব সময় ইংরেজিতে দিয়েছেন। কারণ তিনি উর্দু একদমই পারেন না। এখানে তিনি ইংরেজিতে অবশ্যই বলতে পারেন। কিন্তু এর আগে ভারত থেকে লেখক মনোজ বসু বক্তৃতা করেছেন বাংলায়। এই তো সুযোগ বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার। পূর্ব বাংলার ছাত্ররা বুকের রক্ত দিয়েছে এই ভাষার জন্য। এই ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব জয় করেছেন, কে না তাঁকে চেনে? কাজেই মাতৃভাষায় ভাষণ দেওয়াই তিনি কর্তব্য বলে মনে করলেন।

তিনি দাঁড়ালেন এবং শুরু করলেন বাংলায়।

দোভাষীরা সেটা ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ ও রুশ ভাষায় অনুবাদ করে যেতে লাগল।

তাঁর ভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন মনোজ বসু, জড়িয়ে ধরলেন মুজিবকে, বললেন, 'আজ আমরা দুটো আলাদা দেশের নাগরিক বটে, কিন্তু আমাদের ভাষা কেউ ভাগ করতে পারেনি। আর পারবেও না। তোমরা বাংলা ভাষাকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছ, তার জন্য আমরা ভারতবর্ষের বাংলাভাষী মানুষেরা খুবই গর্ব অনুভব করি।'

খন্দকার ইলিয়াস শেখ মুজিবের গলা জড়িয়ে ধরে আছেন, আর ছাড়তেই চান না। ক্ষিতীশ বাবু এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে, কিন্তু আসলে তিনি পিরোজপুরের লোক, তিনি বাংলা গানে মাতিয়ে তুললেন আসর। মাইক্রোফোনে তিনি বললেন, 'বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব।'

খন্দকার ইলিয়াসকে মুজিব বললেন, 'আজকে ক্ষিতীশ বাবুর গান শুনে আমার আব্বাসউদ্দীনের কথা খুব মনে পড়ছে।

'আমরা গেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। কৃষ্ণনগর হাইস্কুলের উদ্বোধন করতে। সেখানে বিখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ, সোহরাব হোসেন আর বেদারউদ্দীন আহম্মদ খান গান গাইবেন। আব্বাসউদ্দীনের গান শোনার জন্য হাজার হাজার লোক উপস্থিত হলো। বোঝোই তো, আব্বাসউদ্দীনের গান মানে জনসাধারণের প্রাণের গান। তাঁর গানে মাটির গন্ধ। বাংলার মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক।

'ওই সভায় গান হলো। সব গায়ক গান করলেন। আমি আর আব্বাসউদ্দীন রাতে একই বাড়িতে থাকিলাম।

'পরের দিন আমরা রওনা হলাম নৌকায়। আশুগঞ্জ স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরব। পথে গান আরম্ভ হলো। নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে কুলুকুলু রবে। এই সময় আব্বাসউদ্দীন ধরলেন ভাটিয়ালি গান। আমরা সবাই তন্ময় হয়ে শুনছি। তিনি আস্তে আস্তে গান করছেন। আমার মনে হলো, নদীর ঢেউগুলোও যেন তাঁর গান মন দিয়ে শুনছে। গান শেষ হলে আমি আমার মুগ্ধতার কথা জানালাম। বললাম, আপনি এত ভালো গান করেন কী করে?

'তিনি বললেন, মুজিব। আমার গান ভালো লেগেছে, কারণ এ হলো আমার বাংলার মাটির গান, বাংলার জলের গান। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। এই যে ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি, বাউল—কত প্রকারের গান, এ আর থাকবে না। আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গান তুমি ভালোবাসো, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা-কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে।

'আমি তাঁকে কথা দিলাম। আমার জীবন দিয়ে হলেও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা আমি করব।'

শান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে আসা পুরো সমাবেশকে কতগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ করা হলো। আলাদা আলাদা করে বসলেন তাঁরা। মুজিবও যোগ দিলেন একটা গ্রুপে। আলোচনায় অংশ নিলেন। কতগুলো প্রস্তাব এই ছোট গ্রুপে নেওয়া হলো। যেগুলো আবার বড় অধিবেশনে পেশ করে পাস করে নেওয়া হবে।

মানিক মিয়া এসব আলোচনার কোনোটিতেই অংশ নিলেন না। তিনি বললেন, 'আরে, এদের প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত সব আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। এইসব আলোচনার কোনো মানেই হয় না।'

এই সম্মেলনে মুজিবের দেখা হয়েছিল দুজন জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে। একজন রাশিয়া থেকে আসা আইজাক আসিমভ। সায়েন্স ফিকশনের সবচেয়ে বড় লেখক। আরেকজন নাজিম হিকমত। তুরস্কের বিখ্যাত কবি, কিন্তু দেশত্যাগী, তাঁর একমাত্র দোষ তিনি কমিউনিস্ট। এখন আশ্রয় নিয়েছেন রাশিয়ায়।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'শেখ মুজিব কী রকম গুণীর কদর বুঝতেন, এইবার বুইঝা লও।

'এই দুজনের কথা তিনি কখনো ভোলেন নাই। ১৯৬৭ সালে কারাবন্দী থাইকা যখন তিনি কোনো কাগজপত্র নোট ডায়েরি ছাড়াই গড়গড় কইরা নিজের জীবনের স্মৃতিকথা লিখতে বসলেন, তখন তিনি আলাদা কইরা আসিমভ আর নাজিম হিকমতের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বিশেষ গুরুত্বের সাথেই লিখবেন।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'হ। মুজিবরের স্মরণশক্তি যেমন ভালা আছিল, তেমনি ভালা আছিল তাঁর গুণের কদর করার ক্ষমতা। তাই তো তিনি এদের কথা, ১৫ বছর পরেও লেখতে ভোলেন নাই।'

শেখ মুজিব নতুন চীন দেখে মুগ্ধ। শান্তি সম্মেলনের আগে ১ অক্টোবরে হয়েছিল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। মুজিবদের পেছনেই উঁচু বেদিতে ছিলেন মাও সে-তুং, মাদাম সান ইয়েৎ সেন, চৌ এন-লাই, লিও শাও চি প্রমুখ। কুচকাওয়াজ হলো। ৫ লাখ মানুষের শোভাযাত্রা ছিল কাল, সংবাদপত্র পড়ে পরের দিন বিড়বিড় করছেন মুজিব, কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা নাই। বিপ্লবী সরকার সমস্ত জাতটার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে।

প্রথম রাতে মুজিবরা খেতে গিয়েছিলেন গাড়িতে করে, পাকিস্তানের পুরো প্রতিনিধিদল, তাদের দলনেতা পীর সাহেবের নেতৃত্বে, একটা মুসলমান হোটেলে। সেখানে সবকিছুই অসম্ভব ঝাল। মুজিব একটুখানি খাবার মুখে দিয়েই খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, পেটে ব্যথা অনুভূত হলো। ফিরে এসে

হোটেল রুমে রাখা আঙুর, আপেল খেয়ে কোনোরকমে শুয়ে পড়ে রাত কাটিয়ে দিলেন। মানিক মিয়া পরের দিন দুপুরবেলা ঘোষণা করলেন, 'আমি আর ওই ঝালওয়ালা মুসলিম খাবার খেতে পারব না, এই পিকিং হোটেলের খাবার অর্ডার দিয়ে খাব।' তিনি পিকিং হোটেলে খেয়ে সেখানেই দিবানিদ্রা দিলেন আরামে। মুজিব দুপুরবেলাও গেলেন পীর সাহেবের পিছু পিছু মুসলিম হোটেলে। উফ্। এত ঝাল! রাতের বেলা দেখা গেল পীর সাহেবের পেছনে দু-তিনজন ছাড়া আর কেউ নাই। তাঁরা মুসলিম হোটেলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে পিকিং হোটেলেই অর্ডার দিয়ে ভাত, ডিম, চিংড়ি, মুরগি, গরুর মাংস ইত্যাদি খেয়ে নিতে লাগলেন আরাম করে।

তবু হাত দিয়ে ভাত-তরকারি মেখে খেতে না পারলে কি আর ভালো লাগে। বাঙালির খাওয়া হলো ডাল, ভাত, মাছের ঝোল। মুজিব খুবই বাঙালি খানার অভাব অনুভব করছেন। সেই সমস্যারও অলৌকিক সমাধান হয়ে গেল। মুজিব পেয়ে গেলেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহপাঠী মাহাবুবকে, যে কিনা পিকিংয়ের পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদে নিয়োজিত। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মাহাবুব চলেছেন সস্ত্রীক, হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে মুজিব চিৎকার করে উঠলেন, 'মাহাবুব, মাহাবুব'; বাঙালি-বিরল চীনা রাস্তায় তাঁর নাম ধরে কে ডাকছে—মাহাবুব চমকে উঠে তাকিয়ে দেখতে পেলেন মুজিবকে। এসে জড়িয়ে ধরলেন। এর পর থেকে মাহাবুবের বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করতেন।

১৫ বছর পর মুজিব সেই স্মৃতি উল্লেখ করে লিখবেন, 'যে কয়দিন পিকিংয়ে ছিলাম, রাতে ওদের বাড়িতেই খেতাম। বাংলাদেশের খাবার না খেলে আমার তৃপ্তি কোনো দিনও হয় নাই।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'দেখলা, মুজিব তাঁর স্মৃতিকথায় দেশটার নাম কী বলল?

'বাংলাদেশ। মুজিব তো কখনো পূর্ব পাকিস্তান কথাটা মুখে আনতে চাইতেন না। তিনি কইতেন, পূর্ব বাংলা। তারপর আস্তে আস্তে বাংলাদেশ কথাটা তাঁর মনে ধরে। ১৯৫২ সালেও তিনি চীনে গিয়া যেইটা মিস করলেন, সেইটা বাংলাদেশের খাবার। পাকিস্তানের খাবার না।'

চীনে আরেক অসুবিধা হতে লাগল মুজিবের। তিনি দাড়ি কাটার ব্লেড খুঁজে পাচ্ছেন না। এখন এই দেশে দাড়ি কামানোর একমাত্র উপায় হলো সেলুনে বসে নাপিতের হাতে ক্ষৌরকর্ম করা। কিন্তু পুরো চীন ঢুঁড়েও কোথাও ব্লেড পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ চীন তখনো ব্লেড উৎপাদন শুরু করে নাই। আমদানি করে ব্লেড এনে দাড়ি কামানোর কোনো মানে হয় না। ক্ষুর দিয়ে দাড়ি

কামাও। এই হলো চীনের নীতি। চীনে বিদেশি সিগারেট পাওয়া যায় না। মুজিবের মনে ভাবনা, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় দেশে কিছু বিদেশি মুদ্রা এসেছিল, সেই টাকা আমরা ব্যয় করেছি জাপানি পুতুল আমদানি করে, আর চীনে বিদেশি মুদ্রা একমাত্র ব্যয় করা হয় শিল্প-কলকারখানা স্থাপনে।

সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। আতাউর রহমান খান আর মানিক মিয়া দেশে ফিরে গেছেন। মুজিব আর ইলিয়াস রয়ে গেলেন। চীনটা ভালো করে দেখে নেওয়া যাক। খরচ তো সব শান্তি কমিটি দেবে। তারা সঙ্গে দোভাষী দেবে, চলাফেরা থাকা-খাওয়ার দায়দায়িত্ব তাদের, আর সেই দায়িত্ব তারা সুচারুভাবে পালন করে চলেছে।

মুজিব ও ইলিয়াস গেছেন সাংহাই। দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর বলে মনে হলো সাংহাইকে। সেখানে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হলো সবচেয়ে বড় টেক্সটাইল মিলে। এসবই জাতীয়করণ করা হয়েছে। শ্রমিকেরা এর মালিক। শ্রমিকদের থাকার জন্য সুন্দর ও বিশাল কলোনি বানানো হয়েছে। সেসব দেখানো হলো মুজিবদের।

মুজিব বললেন, 'আমি কলোনির ভেতরে কোনো একটা শ্রমিকের বাড়িতে যেতে চাই। তারা কেমন আছে, সেটা স্বচক্ষে দেখতে চাই।'

ইলিয়াস বললেন, 'গাইডকে বলো। সেই নিয়ে যাবে।'

মুজিব বললেন, 'এখন বলব না। হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে গিয়ে বলব, এই বাড়িটা দেখতে চাই। তা না হলে ওদের কোনো সাজানো বাড়িতে নিয়ে যাবে, যেটা হয়তো দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষভাবে গুছিয়ে রাখা হয়েছে।'

মুজিব তা-ই করলেন। একটা বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে দোভাষীকে বললেন, 'এই কলোনির যেকোনো একটা বাড়ির ভেতরটা দেখতে চাই। এদের ঘরের ভেতরের অবস্থাটা আমি দেখব। ব্যবস্থা করা যাবে?'

দোভাষী ভেতরে গেল, ফিরে এসে বলল, 'চলো।'

তাঁরা ভেতরে গেলেন। একজন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের তিনি স্বাগত জানালেন। ফ্ল্যাটের ভেতরে পা রাখলেন মুজিব আর ইলিয়াস। ভেতরে গিয়ে বসলেন তাঁরা। দু-তিনটা চেয়ার, একটা খাট, ভালো বিছানা। পুরো বাড়িতে একটা পরিচ্ছন্নতা ও সম্পন্নতার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে যেন। গৃহকর্ত্রীও শ্রমিক, এক মাস আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে, স্বামী গেছেন কাজে।

দোভাষী বললেন, 'আপনারা বাড়ির ভেতরটা দেখুন।'

মুজিব ও ইলিয়াস অন্দরে গেলেন। আরও একটা শোবার ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম। সবটা মিলিয়ে একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য যথেষ্টরও বেশি ব্যবস্থা।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনারা খবর না দিয়ে এসেছেন। আপনাদের এখন আপ্যায়ন করি কীভাবে! একটু চা খান।'

তিনি ভেতরে গিয়ে চা বানিয়ে আনলেন, দুধ-চিনি ছাড়া চীনা চা। তারা চা খেলেন।

মুজিব বললেন ইলিয়াসের কানে কানে, 'এর নতুন বিয়ে হয়েছে, একে কোনো উপহার না দিয়ে যাই কী করে? কী দেওয়া যায়?'

হঠাৎ মুজিবের নজর পড়ল তার নিজের হাতের আঙুলের দিকে, বেশ তো একটা আংটি সেখানে শোভা পাচ্ছে।

মুজিব আংটি খুলে ফেললেন। দোভাষীকে বললেন, 'এই সামান্য উপহার আমরা ভদ্রমহিলাকে দিতে চাই। কারণ, আমাদের দেশের নিয়ম হলো, কোনো নতুন বিয়েবাড়িতে গেলে বর-কনের জন্য কিছু নিয়ে যেতে হয়, তাদের উপহার দিতে হয়।'

ভদ্রমহিলা কিছুতেই সেই আংটি নেবেন না।

মুজিব বললেন, 'না নিলে আমরা দুঃখিত হব। বিদেশি অতিথি আমরা, অতিথিকে দুঃখ দিতে নাই। চীনের লোক অতিথিপরায়ণ হয়, এটা শুনেছি, দেখছি।'

ভদ্রমহিলা আংটি নিলেন।

পরের দিন সেই দম্পতি সাংহাইয়ের কিংকং হোটেলে শেখ মুজিবের কাছে এসে হাজির। তাঁরাও একটা উপহার এনেছে। এবার মুজিব বললেন, 'না না, বিয়ের উপহারের বদলে কোনো উপহার নেওয়ার নিয়ম বাংলাদেশে নাই।'

কিন্তু নাছোড় দম্পতি উপহার দেবেনই। মুজিবকে নিতে হলো। চীনের স্বাধীনতার প্রতীকচিহ্নিত কলম।

প্লেনে উঠে পড়েছেন মুজিব, ইলিয়াস। তাঁরা ফিরে আসছেন স্বদেশে। মুজিবের মনে নানা ভাবনা। পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালে, চীন স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৯ সালে। স্বাধীন হয়ে পাকিস্তান সরকার এমন সব কাজ করছে, দেশ ঝিমিয়ে পড়েছে। আর চীনা সরকার সমস্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছে। ওদের দেশের সরকার মানুষকে বোঝাতে পেরেছে, দেশটাও জনগণের, দেশের সম্পদও জনগণের। আর পাকিস্তানের সরকার বোঝাতে পেরেছে, দেশটাও জনগণের নয়, সম্পদ কতিপয় একটা বিশেষ গোষ্ঠীর।

ব্যাঙ্গমা ঠোঁট বাঁকাল। ব্যাঙ্গমি পাখা ঝাপটাল।

ব্যাঙ্গমি বলল, 'মুজিব ১৫ বছর পরে কী লিখবেন স্মৃতিকথায়?'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'খুব একটা জরুরি কথা লিখবেন তিনি। বলবেন, চীনে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে কমিউনিস্টরাই। আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির যন্ত্র যত দিন দুনিয়ায় থাকবে, তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জনগণের কর্তব্য বিশ্ব শান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে কাজ করা।'

মুজিব চীনে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করেছেন। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল শরতের বাতাসে, সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল বাঙালির কানে কানে। সবাই খুব খুশি। তারা ফিরে আসার পর পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কমিটির উদ্যোগে চীন-ফেরত প্রতিনিধিদলের সংবর্ধনার আয়োজন করা হলো।

তাতে খন্দকার ইলিয়াস উপস্থিত হলেন চীনের জাতীয় পোশাক, গলাবন্ধ কোট আর ট্রাউজার্স পরে।

প্রতিনিধিরা সবাই চীনের সমাজব্যবস্থা, জনগণ ও নেতাদের প্রশংসা করে বক্তব্য রাখলেন।

তারপর ঘোষণা এল, এবার বক্তৃতা দেবেন শেখ মুজিবুর রহমান।

পুরো হল সোল্লাসে করতালি দিয়ে উঠল।

গুঞ্জন উঠল, তিনি চীনে বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলায়। আরও জোরে তালি হবে। তালি...

২৭.

তাজউদ্দীন আহমদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে চাইছে। তিনি বসে আছেন শ্রীপুর রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেওয়া ট্রেনে। তাকিয়ে আছেন প্ল্যাটফরমে দাঁড়ানো স্কুলের ছাত্র-আর শিক্ষকদের দিকে। সবাই আজ এসেছে তাঁকে বিদায় জানাতে। এই স্কুলে তিনি ছিলেন এক বছর তিন মাস তিন দিন। যোগ দিয়েছিলেন সহকারী শিক্ষক হিসেবে, আজ অবশ্য বিদায় নিলেন প্রধান শিক্ষক হিসাবে।

গত সোয়া এক বছরে তাঁর সময় চার ভাগে ভাগ করে নিতে হয়েছিল একটা ভাগে আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে স্নাতক শ্রেণীতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া। এখন তিনি তৃতীয় বর্ষে। এক ভাগে আছে তাঁর গ্রামের বাড়ি। বনের সঙ্গে বাড়ি, বন বিভাগের দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। তিনি নিপীড়িতের পক্ষে, পীড়কের বিরুদ্ধে সোচ্চার, ঢাকায় কামরুদ্দীন সাহেব ওকালতি করেন, তাঁদের কাছে তিনি নিয়ে যান এই এলাকার লোকজনদের, যারা ঠিক জানে না ন্যায়বিচারের জন্য কোথায় কার কাছে যেতে হবে। আর এক ভাগে আছে এই শ্রীপুর স্কুলের শিক্ষকতা। পরীক্ষার খাতা দেখা থেকে শুরু করে ক্লাসে পড়ানো, সরকারের নানা বিভাগে দৌড়াদৌড়ি করা স্কুলের উন্নয়নের জন্য, আন্তস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় স্কুল যোগ দিলে তার পাশে দাঁড়ানো, স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলা হলে রেফারির দায়িত্ব পালন করা—এসবই তাঁকে করতে হয়েছে, কোনো রকমের গাফিলতি ছাড়াই। তারপর আছে রাজনীতি।

যুবলীগের নেতা তিনি। ভাষা আন্দোলনের কর্মী। আবার একই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছেন কামরুদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে একটা বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনের। আওয়ামী মুসলিম লীগ মুসলিম লীগের লেবাস ছাড়তে পারছে না। সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে উঠে পরিচালিত হবে, এমন একটা রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা অনুভব করেন।

ট্রেন নড়ে উঠে ধীরে ধীরে ঢাকার দিকে চলতে শুরু করেছে। কয়লার ইঞ্জিনের ঝিকঝিক শব্দ কানে আসছে। তাজউদ্দীন তাঁকে বিদায় দিতে আসা ছাত্রদের ওপর থেকে চোখ সরাতেই পারছেন না। পুরো স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকেরা চলে এসেছে স্টেশনে, তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য। এরা এত ভালোবাসে তাঁকে! তিনিও এদের এত ভালোবেসে ফেলেছেন!

দুপুরে ছাত্ররা আয়োজন করল তাঁর বিদায়ের অনুষ্ঠান। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আবদুল বাতেন তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সেই মালা গলায় পরে তাজউদ্দীনের মনে হলো, এই ফুল কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো নির্জীব হয়ে পড়বে, কিন্তু ছেলেদের ভালোবাসার স্মৃতি তাঁর মন থেকে কোনো দিনও মুছে যাবে না। এই ভালোবাসার স্মৃতি চিরদিন সজীব থাকবে, তাজা থাকবে।

বক্তৃতা দেবার পালা এল তাজউদ্দীনের। ঘোষণা হলো, এবার ভাষণ দেবেন আজকের অনুষ্ঠান যাঁকে ঘিরে, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধান শিক্ষক, এই এলাকার গর্ব জনাব তাজউদ্দীন আহমদ।

তিনি উঠলেন। দাঁড়িয়ে থাকলেন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে বাষ্পে। তাঁর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। ছেলেরা সবাই কাঁদতে আরম্ভ করল, কাঁদতে লাগলেন শিক্ষকেরাও। এই রকম একটা আবেগঘন পরিস্থিতি তৈরি হবে, তাজউদ্দীন ভাবতেও পারেননি। তিনি কখনো লোকসমক্ষে এইভাবে কান্নাকাটি করেননি।

অনুষ্ঠানের পর যখন তিনি রেলস্টেশনের দিকে রওনা দিলেন, ছেলেরা আর শিক্ষকেরা চলল তাঁর পিছু পিছু। যতক্ষণ না ট্রেন আসে, তারা দাঁড়িয়েই রইল।

তাজউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর ভাইঝি শাহিদা, ও ঢাকায় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। তাকে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ কারকুন বাড়ি লেনের ভাড়া বাসায় শাহিদা রাতে থাকবে। কালকে তার পরীক্ষা।

এই মেয়েটি অতি অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়। এরা তিন ভাইবোন। তিনজনকেই লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকিয়েছেন তাজউদ্দীন। তিনিই এখন তাদের অভিভাবক বাড়ি থেকে দুই ভৃত্য সোবহান আর আকবর শাহিদাকে এনেছে শ্রীপুর স্টেশন পর্যন্ত।

শাহিদা বলল, 'চাচা, আপনার চোখে পানি?'

তাজউদ্দীন রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ট্রেন চলছে। ঠান্ডা বাতাস আসছে জানালা দিয়ে।

ছেলেরা চোখের আড়াল হয়ে গেল। কিন্তু মনের আড়াল তারা হবে কি কোনো দিনও? তাজউদ্দীন ভাবতে লাগলেন।

হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছিটা আসছে। নভেম্বর মাসে বৃষ্টি! তিনি শাহিদাকে বললেন, 'গায়ের চাদরটা ভালোমতো জড়িয়ে নাও। ঠান্ডা লেগে যাবে হঠাৎ করে।'

শাহিদা তার গায়ের চাদর টানাটানি করতে লাগল।

তাজউদ্দীন চাকরিটা ছাড়লেন কিশোর মেডিকেল হলে একটা চাকরি পেয়েছেন বলে। বাড়ি-শ্রীপুর-ঢাকা করতে গিয়ে তাঁর অনেক সময় ও উদ্যম অপচয় হয়ে যায়। এবার হয়তো একটু বেশি সময় পাওয়া যাবে।

কিশোর মেডিকেল হলটা তাঁর বন্ধু ডা. এম এ করিম সাহেবের। মিটফোর্ড থেকে এলএমএফ পাস করে তিনি জগন্নাথ কলেজে আইএসসি পড়েন, ওই সময় তিনি ছাত্র সংসদের সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর কিশোর মেডিকেল হল ছিল রাজনৈতিক কর্মীদের আড্ডাখানা। তিনি যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আবার কমিউনিস্টদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগটা বেশ

অন্তরঙ্গ। তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন, অনেক রাত তিনি ডা. করিমের সঙ্গে তাঁর বাসাতেও কাটিয়ে দেন।

হোসেন মাস্টারও তাঁর সঙ্গে ট্রেনে সহযাত্রী হয়েছেন। তিনি বললেন, আজকা আকাশটা কাঁদতেছে।

হোসেন মাস্টার ইংরেজি ও বাংলা পড়ান। এঁরা সহজ কাব্য করতে পছন্দ করেন।

তাজউদ্দীন মৃদু হাসলেন। কিন্তু তাঁরও মনে হতে লাগল, আজ আকাশেরও মন খারাপ!

শাহিদা বলল, 'চাচাজান, সিনেমা দেখব।'

ওর পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষা সে ভালোই দিয়েছে। এখন তো সে একটা সিনেমা দেখার আবদার করতেই পারে। তাজউদ্দীন আহমদ ভাইঝিকে নিয়ে চললেন রূপমহল হলে। ওখানে প্রদর্শিত হচ্ছে *রানী ভবানী*।

সিনেমা শেষ।

তাজউদ্দীন বললেন, 'কেমন লাগল?'

শাহিদা বলল, 'ভালো। তবে শেষটা আরও ভালো হতে পারত!'

বলে কী এই মেয়ে! তাজউদ্দীন চমকে উঠলেন।

ভাইঝিকে বাসায় রেখে তাজউদ্দীন ছুটলেন যোগীনগর। যুবলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হচ্ছে। তিনি ধরতে পারেন কি পারেন না!

শেষ ১০ মিনিট পাওয়া গেল সভার।

গলার ভেতরটা খুসখুস করছে। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ঠান্ডা লেগে গেছে তাজউদ্দীনের। তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন।

সভার ভেতরেই কাশি দিতে থাকলেন তিনি। কী বিপদ!

ভাগ্যিস, সভা তাড়াতাড়ি শেষ হলো! সভাপতি মাহবুব আলী তাড়াতাড়িই সভা শেষ করে দিলেন। তাজউদ্দীন উঠলেন।

শীতের আমেজ বাইরে। তিনি গলার মাফলারটা ভালোমতো জড়িয়ে নিয়ে সাইকেলে উঠলেন। কানের কাছে শীতের বাতাস শিস বাজাতে লাগল।

সাইকেল চালাতে চালাতেই তাজউদ্দীনের মনে পড়ল শ্রীপুর স্কুলের কথা, ছাত্রদের কথা, সহকর্মীদের কথা।

এই ছেলেগুলো এইভাবে তাঁর হৃদয় দখল করে বসে আছে! তাঁর সেই হৃদয় আবার দ্রবীভূত হতে লাগল!

২৮.

সওগাত পত্রিকা অফিসে গেছেন আনিসুজ্জামান। হাসান হাফিজুর রহমান ছিলেন সেখানে। তাঁর হাতে এক তোড়া কাগজ। সেটা তিনি ধরিয়ে দিলেন আনিসুজ্জামানের হাতে। শিরোনামহীন এক দীর্ঘ কবিতা :

> আম্মা তাঁর নামটি ধরে একবারও ডাকবে না তবে আর?
>
> ঘূর্ণিঝড়ের মতো সেই নাম উন্মথিত মনের প্রান্তরে
> ঘুরে ঘুরে ডাকবে, জাগবে
> দুটি ঠোঁটের ভেতর থেকে মুক্তোর মতো গড়িয়ে এসে
> একবারও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না, সারাটি জীবনেও না?
> কি করে এই গুরুভার সইবে তুমি? কতোদিন?
> আবুল বরকত নেই; সেই অস্বাভাবিক বেড়েওঠা
> বিশাল শরীর বালক, মধুর স্টলের ছাদ ছুঁয়ে হাঁটতো যে তাঁকে
> ডেকো না,
>
> আর একবারও ডাকলে ঘৃণায় কুঁচকে উঠবে—
> সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার— কি বিষণ্ণ থোকা থোকা নাম;
> এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষ্ণ ফলার মতো এখন হৃদয়কে হানে;...

আনিসুজ্জামান দীর্ঘ সেই কবিতাটি পাতার পর পাতা উল্টে পড়ে গেলেন। সবটা যে বুঝলেন তা নয়, কিন্তু আবেগে তার শরীর রোমাঞ্চিত হলো।

জিগ্যেস করলেন, 'কোথায় ছাপবেন?'

হাসান বললেন, 'দেখি।'

সওগাত প্রেসে হাসান তখন ছাপছিলেন ফজলুল হক হল বার্ষিকী, তাঁরই সম্পাদনায়। বার্ষিকীটা যখন বেরোল, তখন সবাই বিস্মিত, অনেকেই মুগ্ধ; কারণ এটা দেখতে একেবারে হল ম্যাগাজিনের মতো নয়, প্রভোস্টের ছবি

নাই, সম্পাদনা পরিষদ বা খেলোয়াড়দের গ্রুপ ছবি ঠাঁই পায়নি, কার্টিজ কাগজে একেবারে সাহিত্যপত্রিকার মতো করে ছাপা। তাতেই কবিতাটা ছাপা হলো 'অমর একুশে' নাম দিয়ে।

এই কবিতা লেখার পর হাসানের মনে হলো, একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকীর আগেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা পত্রিকা বের করতে হবে। এটি হবে সাহিত্য পত্রিকা।

খুব সুন্দর একটা একুশে সংকলন বের করলেন হাসান। কিন্তু সেটা একুশে ফেব্রুয়ারির আগে বের করতে পারলেন না। ছাপাখানায় কখনো কোনো জিনিস সময়মতো পাওয়া যায় না।

লেখা পেতে দেরি হয়েছিল। হাসান চেষ্টা করছিলেন সবার লেখা ঠিকমতো সময়মতো জোগাড় করতে, লেখকেরা আবার কুড়ে প্রকৃতির হয়ে থাকেন কিনা। শামসুর রাহমান লেখা দিলেনই না, কলকাতার *পরিচয়* পত্রিকায় সদ্য প্রকাশিত তাঁর একটা কবিতা পুনর্মুদ্রণ করে দিলেন হাসান।

কিন্তু আসল সমস্যা কাগজ কেনার টাকা জোগাড় করা। সেটাই করে উঠতে পারছিলেন না হাসান।

সেই টাকা জোগাড় করে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' নাম নিয়ে সংকলনটা বেরোল মার্চে।

কাগজের টাকা জোগাড় হলো বটে, ছাপাখানার বাকির টাকা আর শোধ হয় না। ছাপাখানার মালিক মোহাইমেন সাহেবের ভাই মুকিত সাহেব হাসানকে খুব বকাবকি করলেন। আনিসুজ্জামানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খুব মন খারাপ করলেন। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনটিতে আনিসুজ্জামানের গল্প ছাপা হয়েছে। ব্লকে ছাপা উৎসর্গপত্রের লেখাটাও আনিসুজ্জামানের নিজের হাতের।

কাজেই ছাপাখানার টাকা পরিশোধ করতে না পারার কারণে হাসান যে বকুনি খেলেন, তার অংশ যেন আনিসুজ্জামানকেও বিদ্ধ করছে।

হাসান সেদিনই বাড়ি চলে গেলেন।

গুড় বিক্রি করে টাকা নিয়ে ফিরে এলেন ঢাকায়।

শোধ করলেন প্রেসের দেনা।

২৯.

আবার এল ফেব্রুয়ারি। আবার এল একুশে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫৩ সাল। একটা বছর ধরে কারাগারে আটক কতজন! ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভাষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা। উদ্দীপনা। তাঁরা কারাগারের ভেতরে বসেই শুনতে পান কোকিলের ডাক। ফাল্গুনের দখিনা বাতাস তাদের মনকে উদাস করে, একটা বছর আগের ফাল্গুনের স্মৃতি তাঁদের মনে উঁকি দেয়।

তরুণ ফজলুল করিমের উত্তেজনা বেশি। আইএ ক্লাসের ছাত্র, বয়স কম, কিন্তু সান্নিধ্য পেয়েছে মহাজনদের, মওলানা ভাসানী ছিলেন এই পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে, এখনো আছেন অধ্যাপক অজিত গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা এবং শামসুল হক।

তিন নামকরা অধ্যাপক পড়ান ফজলুল করিমকে, মুনীর চৌধুরী পড়ান ইংরেজি। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এমএ, কারাগারে বসবাসের সময়টাকে ফলপ্রসূ করতে এখন পড়ছেন বাংলা সাহিত্যে এমএ, তাঁকে বাংলা পড়ান অধ্যাপক অজিত গুহ। মুনীর চৌধুরী তরুণ ছাত্রকে প্রবল উৎসাহে নাটক পড়ান, পড়াতে গিয়ে বসা থেকে তিনি দাঁড়িয়ে যান, এবং নিজেই সেই নাটকে অভিনয় করতে শুরু করে দেন। তিনি নিজেই আবার গল্প করেন, ছাত্রদের সঙ্গে কীভাবে মিশে যেতে পারেন তিনি, একবার নাকি তাঁর ছাত্র সিগারেট হাতে করে তাঁর সামনে এসে বলে, দিয়াশলাই হবে, মুনীর চৌধুরী বলেন, হবে; তিনি দিয়াশলাই এগিয়ে দিলে ছেলেটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে, পরে ক্লাসে গিয়ে দেখতে পায়, সে তার শিক্ষকের কাছ থেকে দিয়াশলাই নিয়েছে। নিজেই গল্প করেন, ক্লাসে তিনি এত উচ্চ স্বরে পড়ান যে অন্য ক্লাস থেকে শিক্ষকেরা তাঁকে চিরকুট পাঠান, আস্তে কথা বলুন।

মুনীর চৌধুরী ফজলুল করিমকে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে এইসব গল্প করেন।

অজিত কুমার গুহ জগন্নাথ কলেজের বাংলার অধ্যাপক। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে তাঁর অবস্থান প্রকাশ্য। তাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। তিনি অধ্যাপকই দিনাজপুর জেল থেকে এসেছেন। আগমনের প্রথম দিন অজিত গুহ

নাম-পরিচয় জানতে চাইলেন ফজলুল করিমের। পরের দিন ভোরে চা-নাশতার পর্ব শেষ হলে তিনি এলেন এই তরুণের বিছানার কাছে। জানতে চাইলেন, 'তোমার পড়াশোনার কী অবস্থা?'

ফজলুল করিম বললেন, 'মার্চ মাসে আইএ পরীক্ষা, আমি প্রস্তুতি নিতে চাই।'

'সাবজেক্ট কী কী নিয়েছ?'

'বাংলা বিশেষ পত্র নিয়েছি।'

'খুব ভালো। আমি তোমাকে বাংলা ও লজিক পড়াব। মুনীর চৌধুরী ইংরেজি পড়াতে পারবেন। মোজাফফর আহমদ পড়াবেন লজিক '

শুনে ফজলুল করিম খুশিতে আটখানা। দেশের শ্রেষ্ঠ তিন শিক্ষককে তিনি পেয়ে গেলেন কারাগারে এসে। তাঁকে অর্থনীতি পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা আর অলি আহাদ।

অজিত গুহ এই শিক্ষার্থীর দায়িত্ব যেন নিজে নিয়েছেন। জেলে বসে পরীক্ষা দেব, অনুমতি দিন—এই মর্মে দরখাস্ত লিখতে বলো ফজলুল করিমকে, ডিকটেশন দিয়ে লিখিয়ে নিলেন অজিত গুহ। নিজেই বাইরে থাকা শিক্ষকদের কাছ থেকে জেনে নিলেন পাঠ্যতালিকা, বইপুস্তকও তিনিই তাঁর সহকর্মীদের দিয়ে কিনিয়ে তাঁর নামে জেলগেটে আনানোর ব্যবস্থা করলেন। একটা জানালার ধারে ফজলুল করিমের বিছানা পাতা হলো। আশপাশে কেউ থাকবে না। তাতে ছেলের পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে। নিজের বিছানা পাতলেন ছাত্রের বিছানা থেকে পাঁচ-ছয় হাত দূরে। নিজের টাকায় অনেকগুলো এক্সারসাইজ খাতা কিনে আনালেন। পড়ার জন্য রুটিন তৈরি হলো।

শুধু পড়া নয়, ভালো খাদ্যের ব্যবস্থাও করলেন অজিত গুহ. একটা স্টোভ আনালেন। নুন-মসলাপাতি, ডিম, মাংস ইত্যাদি কিনে এনে নিজেই রাঁধেন। পরোটা, মাংস, শিঙাড়া ইত্যাদি বানিয়ে ওয়ার্ডের সব বন্দীকে খাওয়ান।

মুনীর চৌধুরী নিজেও বাংলায় এমএ পরীক্ষা দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকেও বাংলা পড়ান অজিত গুহ।

কালিদাস তাঁর প্রিয় কবি।

মেঘদূত থেকে তিনি পড়ান, 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্ত।' বোঝাতেন মন্দ্রাক্রান্তা ছন্দ, আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনূদিত *মেঘদূত* থেকে আবৃত্তি করেন:

'পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভোতল, কই গো কই মেঘ, উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও।'

আজ রাতে ফজলুল করিমের ঘুম আসতে চায় না। জানালার ধারে বিছানায় শুয়ে তিনি ছটফট করেন। অজিতদা রীতিমতো ১০টাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কাল একুশে ফেব্রুয়ারি।

কারাগারের ভেতরেও পালন করা হবে।

আজ দুপুরবেলা মাক্কুশা মাজারের কাছ থেকে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা শোনা যাচ্ছিল, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দীরা দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। দেখতে পেলেন মাজারসংলগ্ন মসজিদের দেয়ালে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন কিছু দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া আবদুল ওয়াদুদ পাটোয়ারী। তিনি ভাষণ দেওয়া শেষ করে বন্দীদের উদ্দেশে স্যালুট দিলেন। ফজলুল করিমের হাত আপনা-আপনি কপাল পর্যন্ত উঠে এল। তারপর ওয়াদুদ তাঁর দল নিয়ে চলে গেলেন। বন্দীরা নিচে নেমে এল। আবার মিছিল আসছে। আবারও সবাই দোতলা অভিমুখে রওনা দিলেন। দোতলার সিঁড়িটার মুখ একটা নড়বড়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো। তাঁরা সেই বেড়া ভেঙে ওপরে উঠে গেলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি কীভাবে পালন করা হবে, ঠিক করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি কেউ খাদ্য গ্রহণ করবেন না। জেল কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে, সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবারের টাকা যেন রাজবন্দী সাহায্য তহবিলে নগদ জমা দেওয়া হয়। কালো ব্যাজ ধারণ করা হবে।

জেলখানায় কালো কাপড় নাই। এ সমস্যার সমাধান কী হবে, কে জানে?

ফজলুল করিম ভাবলেন, তাঁর কালো ব্যাজটা জেলগেটে জমা আছে। নোয়াখালীতে যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তো তাঁর বুকে একটা কালো ব্যাজ ছিল। সেটা মাইজদী জেল কর্তৃপক্ষ জেলগেটে জব্দ করে। নোয়াখালী থেকে ঢাকায় আসার পরে ফজলুল করিম চিঠি লিখে ওই মূল্যবান ব্যাজটি ঢাকায় আনিয়ে নেন। কালকে সকালে উঠে গেট থেকে কি ওই ব্যাজটা নেওয়া যাবে না? দেবে ওরা? আর একটা ব্যাজ দিয়ে এতজন করবেটা কী?

এইসব নানা ছেঁড়াখোঁড়া ভাবনা তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

ভোরবেলা, চারটার সময় অজিত গুহ অভ্যাসমাফিক উঠে পড়েছেন। কিন্তু বাকি বন্দীরাও উঠে পড়লেন। বাইরে স্লোগানের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এর মধ্যে দেখা গেল অজিত গুহ কালো ব্যাজের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। তাঁর এক জোড়া সিল্কের মোজা ছিল। সেই মোজা কেটে তিনি কালো ব্যাজ বানিয়েছেন।

বেলা বাড়ছে। নাজিম উদ্দিন রোড ধরে ছোট ছোট মিছিল কালো পতাকা নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় স্লোগান দিচ্ছে প্রভাতফেরির মানুষেরা, আর কারাগারের ভেতরে স্লোগান ধরল বন্দীরা : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।

তখন বাইরের মিছিলকারীরা স্লোগান ধরল, রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

বেলা বাড়ছে, মিছিলের সংখ্যাও বাড়ছে।

মিছিলের আওয়াজ শুনলেই বন্দীরা দৌড়ে যাচ্ছেন দোতলায়। মিছিলে অনেক কালো পতাকা। এদেরও তো কালো পতাকা দরকার। মোহাম্মদ তোয়াহার কালো কার্ডিগানটাকে পতাকা বানিয়ে তারা দোলাতে লাগলেন।

আবার তাঁরা ছুটে নামেন নিচতলায়। যান পাঁচিলের কাছে। মুনীর চৌধুরী দরাজ গলায় স্লোগান ধরেন, বাকি ছয়-সাতজন তার জবাব দেন।

অনেক মিছিল গেল বংশাল রোড আর নাজিম উদ্দিন রোড ধরে।

বাইরে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী পালিত হলো বিপুলভাবে। হাজার হাজার মানুষ, আবালবৃদ্ধবনিতা, খালি পায়ে চলল আজিমপুর কবরস্থানে। ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল শহীদ বরকত আর শফিউরের সমাধি। মেডিকেল কলেজের সামনে যেখানে প্রথম গুলি হয়েছিল, সেখানেও ফুল দিল শোকার্ত প্রতিবাদী মানুষ।

কবরস্থানে নারীর প্রবেশ নিয়ে খাদেমদের সঙ্গে একটু বচসা হলো। তাঁরা বললেন, মেয়েরা কবরস্থানের ভেতরে ঢুকতে পারবে না। নিয়ম নাই। কিন্তু ভিড় গেল বেড়ে, শত শত মেয়ে আসতে লাগল, হাজার হাজার মানুষ, কে কাকে বাধা দেয় আর কেই-বা কার কথা শোনে। প্রথমে বলা হয়েছিল, কবরে ফুল দেওয়া যাবে না, কিন্তু ফুলে ফুলে ভরে গেল কবর।

তবে প্রভাতফেরির গান কেউ কবরস্থানের দেয়ালঘেরা চত্বরে গাইবে না, এই নিষেধটা মানা হলো।

প্রভাতফেরির মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হলো তিনটা গান :

মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে,
আজিকে স্মরিও তারে।

ভুলব না এই একুশে ফেব্রুয়ারি
ভুলব না।

আর আবদুল লতিফ সুরারোপিত আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর গান :

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

সন্ধ্যায় কার্জন হলে অনুষ্ঠান হলো। তাতেও এই তিনটা গান গাওয়া হলো

লুৎফর রহমান যখন দরদ দিয়ে গাইতে লাগলেন, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', তখন শ্রোতাদের চোখ ছলছল করে উঠল আপনা-আপনিই।

৩০.

পুরোপুরি পাগল না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত নুরুল আমিন সরকার শামসুল হককে জেলখানা থেকে ছাড়ল না।

তাঁর স্ত্রী আফিয়া খাতুনও বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ চলে গেলেন।

শামসুল হক রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। তাঁর পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা তরুণ লেখক ও সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীনের। আবু জাফর শামসুদ্দীন বসে আছেন তাঁর বইয়ের দোকানে। হঠাৎই শামসুল হক সেখানে হাজির হন। তাঁর গায়ে একটা পুরোনো ছেঁড়া কালো আচকান। পরনে ময়লা পায়জামা। পায়ে শতচ্ছিন্ন ইংলিশ জুতা। আচকানের পকেট থেকে শামসুল হক এক তোড়া কাগজ বের করলেন। বললেন, পড়ে দেখেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন পড়লেন। হিজ ইমপেরিয়াল ম্যাজেস্টি দি অলমাইটি আল্লাহ। একটা দরখাস্ত বা স্মারকলিপি। পূর্ব বাংলার অবস্থা বেশ খারাপ। আল্লাহ তাআলার সরাসরি হস্তক্ষেপ দরকার। আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করেন।

শামসুল হক বললেন, 'এটা আল্লাহর কাছে পাঠাব। ডাকখরচ দরকার। ৫০টা টাকা হবে?'

আবু জাফর শামসুদ্দীন ১০টা টাকার একটা নোট বের করে বললেন, 'আমার তো আর্থিক অবস্থা এত ভালো না, আপনি এইটাই রাখুন। তবে আপনি যাবেন না। বসুন। খেয়েছেন কিছু?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে দিদার হচ্ছে। খাওয়াদাওয়া লাগে না।'

জাফর চা-বিস্কুট আনালেন। তিনি খেলেন। তারপর ১০ টাকা নিয়ে মুখ নিচু করে কাছারির দিকে চলে গেলেন। ডানে-বাঁয়ে কোনো দিকেও তিনি তাকাচ্ছেন না। জাফর বিস্মিত হয়ে তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল জাফরের বুক থেকে।

আওয়ামী মুসলিম লীগের সভা হচ্ছে। শামসুল হক সাহেবকে বক্তৃতা করতে বলা হলো। তিনি বললেন, 'আমি সারা পৃথিবীর খলিফা। এই নির্দেশ ওপর থেকে আমার ওপরে এসেছে।'

সবাই বিস্মিত। যাঁরা জানত, তারা উদ্বিগ্ন। কেউ কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, কেউ বা মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

৩১.

ঢাকার পল্টন ময়দান। আওয়ামী মুসলিম লীগের জনসভা। লোকে-লোকারণ্য। বক্তা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বৈশাখ মাস। ভীষণ গরম। সোহরাওয়ার্দী সবে বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়েছেন। একজন এসে তাঁর কানে কানে একটা খবর দিলেন।

সোহরাওয়ার্দী তাঁর ভাষণে বললেন, আজ পাকিস্তানের একটা বিরাট খবর আছে।

সভা শেষ হলো। মুজিব ফিরছেন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে, জিপগাড়িতে

মুজিব তাঁর পাশে বসা। 'লিডার, পাকিস্তানের খবর আছে বললেন। খবরটা কী?'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'খাজা নাজিম উদ্দিন সাহেবকে গভর্নর জেনারেল বরখাস্ত করেছে।'

'এ তো খুশির খবর।'

'এতে খুশি হওয়ার কিছু নাই।'

'এটা তো খাজা সাহেবের প্রাপ্য।'

'হ্যাঁ, শাসনতন্ত্র না দিয়ে আর সাধারণ নির্বাচন না করে এরা পাকিস্তানকে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির লীলাক্ষেত্র বানিয়ে তুলেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বানানো হলো মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে। তিনি মুসলিম লীগের সদস্যও না আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন পাকিস্তানের। তাঁকে দেশে ডেকে পাঠানো হলো। এবং তাঁকেই মুসলিম লীগেরও সভাপতি বানিয়ে দেওয়া হলো।

মুজিব বললেন, 'মোহাম্মাদ আলী বগুড়ার তো কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নাই, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও কম, এ তো আমেরিকা থেকে কোট-প্যান্ট টাই পরা ছাড়া আর কিছু শিখেও আসতে পারে নাই। এই প্রধানমন্ত্রী দিয়া পাকিস্তান চলবে?'

মুসলিম লীগের কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল না।

একমাত্র প্রতিবাদ করল পূর্ব বাংলার আওয়ামী মুসলিম লীগ।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে সত্যি সত্যি নানা হাস্যকর কাণ্ড করতে লাগলেন। একদিন বললেন, ভারতের সঙ্গে দেশরক্ষা চুক্তি করতে হবে। নেহরু আমার বড়দা হয়।

পাকিস্তানে ব্যাপক নিন্দা হলো সে কথা নিয়ে।

তারপর বললেন, 'বাংলা জবান হামি ভুলিয়া গেছে।'

খুশি হলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। আর খুশি হলো আমেরিকা। তারা ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছে।

৩২.

শেখ মুজিব বললেন আতাউর রহমান সাহেবকে, 'আপনি পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি হন। আমার পদের দরকার নাই। আমি কাজ করছি। কাজ করতেই থাকব।'

দিন পনেরো পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। নতুন কমিটি হবে।

মুজিব সারা দেশ ঘুরে ঘুরে পার্টি গড়েছেন। ৭০টা ইউনিয়নে পর্যন্ত লীগের কমিটি হয়েছে। প্রত্যেকটা জেলায় গেছেন। এর মধ্যে করাচি থেকে হোসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী এসেছিলেন মুজিবের উদ্যোগে। তিনিও মুজিবের সঙ্গে ঘুরেছেন দেশের বিভিন্ন জেলায়। তাঁকে দেখে পার্টিতে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে, জনসভাগুলোয় ভিড় হয়েছে।

এমনিতেই মুজিবের জনপ্রিয়তা সর্বমহলে। তার ওপর পার্টির শাখাগুলো গঠিত হয়েছে তাঁরই উদ্যোগে। কাজেই শেখ মুজিব যদি জেনারেল সেক্রেটারি হতে চান, সব কাউন্সিলরের ভোট তিনিই পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নাই। ৩৩ বছরের যুবক মুজিবকে এই পদে কেন্দ্রীয় নেতাদের সবাই যে চান, তা কিন্তু নয়। আবদুস সালাম খান মনে করেন, মুজিব তাঁকে গুরুত্ব কম দেন, আতাউর রহমান খানকে গুরুত্ব বেশি দেন। কাজেই তিনি চান না, মুজিব সাধারণ সম্পাদক হোক। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন রংপুরের খয়রাত হোসেন, ময়মনসিংহের হাশিমউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। মুজিব শুনতে পেয়েছেন, তিনি যাতে সাধারণ সম্পাদক হতে না পারেন, সে জন্যে তাঁরা টাকাপয়সা খরচ করতে শুরু করেছেন।

মুজিব একা একা বিড়বিড় করেন, পার্টির দরকারের সময় কেউ একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করল না, আর এখন আমাকে ঠেকানোর জন্য টাকাপয়সা খরচ করতে কোনো বেগ পেতে হচ্ছে না। হবই না সাধারণ সম্পাদক।'

তিনি সোজা চলে গেলেন আতাউর রহমান খান সাহেবের বাড়িতে। বৈঠকখানায় ঢুকেই হাঁক পাড়লেন, 'খান সাহেব, কই?'

আতাউর রহমান খান পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে এলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার।'

মুজিব বললেন তিনি সাধারণ সম্পাদক হতে চান না। আতাউর রহমানই যেন এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

আতাউর রহমান খান বললেন, 'মাথা খারাপ! আমার কত কাজ। আমাকে ওকালতি করতে হয়। এখন যিনি সেক্রেটারি জেনারেল হবেন, তাঁকে অবশ্যই পূর্ণকালীন এই কাজই করতে হবে। আপনি ছাড়া কে এই কাজ পারবে! সারা দিনরাত পার্টির কাজ কে করতে পারবে। এই পদে আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

মুজিব চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে বললেন, 'আপনি জানেন, কয়েকজন নেতা তলে তলে ষড়যন্ত্র করছে, আমার নাকি বয়স কম। একজন বয়স্ক লোকের সেক্রেটারি জেনারেল হওয়া দরকার। এই লোকগুলোর একটুও কৃতজ্ঞতা নাই। আমি রাতদিন পরিশ্রম করে সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে পকেটের টাকা খরচ করে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করায়েছি।'

আতাউর রহমান তাঁর হাতে হাত রেখে বললেন, 'বাদ দেন ওদের কথা কাজ করবে না। শুধু বড় বড় কথা।'

মুজিব বললেন, 'আপনি ভালোভাবে চিন্তা করে বলেন। একবার আমি যদি বলি, আমি প্রার্থী, তাহলে কিন্তু আর কারও কথা আমি শুনব না।'

'না না। আপনিই তো সেক্রেটারি হবেন। এইটাই ফাইনাল কথা।'

আতাউর রহমান খান জানেন, সালাম খান মুজিবের ওপরে রাগ করেছে আতাউর রহমান খানকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য।

মুজিব বেরিয়ে এলেন আতাউর রহমান খানের বাসা থেকে।

তিনি গেলেন কারকুন বাড়ি লেনে, মওলানা ভাসানীর সঙ্গে দেখা করতে।

ভাসানী বললেন, 'এইটা আবার কওন লাগব নাকি!' মাথায় তালপাতার আঁশের টুপি, গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি—এই তো ভাসানীর চিরদিনের পোশাক। একটা তসবিহ তাঁর আসনের পাশে। 'তুমিই হইবা সেক্রেটারি।'

মুজিব বললেন, 'হুজুর, আমি তো সেক্রেটারি হইতে চাই না। আপনি আর কাউরে করেন। আমি জয়েন সেক্রেটারি থাকলাম। না-হয় মেম্বার থাকলাম। আমি তো কাজ করবই আপনি আমারে যা করতে বলেন।'

'না না। এইটা নিয়া দ্বিতীয় কোনো কথা নাই। যাও গা। সামনে কাউন্সিল। কাম কি কম! হল ভাড়া করন লাগব, স্টেজ, মাইক, দাওয়াতের কার্ড, ম্যানিফেস্টো, গঠনতন্ত্র। ট্যাকাও তো জোগাড় করন লাগব। আমি বেবাক বুঝি। তুমি আর এইটা নিয়া কথা বাড়াইয়ো না। তুমিই হইবা সেক্রেটারি।'

ভাসানী মুক্তি পেয়েছেন ১৯৫৩ সালের ১৯ এপ্রিল।

কাউন্সিলের তারিখ এগিয়ে আসছে। মুকুল সিনেমা হলে কাউন্সিল হবে। ইয়ার মোহাম্মদ খান মুকুল সিনেমা হল বুকিংয়ে সহায়তা করলেন। কাউন্সিলে যোগ দিতে সারা পূর্ব বাংলা থেকে নেতা-কর্মীরা আসতে লাগলেন। তাঁরা থাকবেন কোথায়? এত হোটেল তো ঢাকা শহরে নাই।

মুজিব নদীপারের ছেলে। জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে নৌকায়। তিনি বুড়িগঙ্গায় বড় বড় নৌকা ভাড়া করলেন। সদরঘাটে সব নৌকা বাঁধা রইল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব কাউন্সিলে যোগ দেবেন প্রধান অতিথি হিসাবে, সেটাও সবাই মিলে সাব্যস্ত করলেন।

মুজিবের বিরোধী গ্রুপ গিয়ে ধরল আবুল হাশিমকে, যিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, এবং সদ্য কারামুক্ত, প্রবীণ। 'হাশিম সাহেব, আপনি আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি হন।'

আবুল হাশিম নিমরাজি। বললেন, 'আমার কোনো আপত্তি নাই। তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হতে হবে।'

আবুল হাশিম তাঁর বাড়িতে দাওয়াত করলেন মওলানা ভাসানীকে। ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমি তো একটা মুশকিলে পড়েছি। আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা আমাকে খুব করে ধরেছেন, আমি যেন সেক্রেটারি জেনারেল পদে কনটেস্ট করি। আমি বলেছি, আমি করতে পারি, কিন্তু আমাকে নির্বাচিত করতে হবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়।'

ভাসানী বললেন, 'সাধারণ সম্পাদক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হইতে পারবেন কি না জানি না। কারণ, মুজিব ঘোষণা কইরা দিছে, সে একজন প্রার্থী। তয় আপনি যদি সভাপতি হইতে চান, আমি ছাইড়া দিতে রাজি আছি।'

কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হলো। মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করছেন। সোহরাওয়ার্দী প্রধান অতিথি। শত শত কাউন্সিলর যোগ দিয়েছে সম্মেলনে। প্রথম অধিবেশনের পর ভাসানী ঘোষণা করলেন, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, আবুল মনসুর আহমদ আর শেখ মুজিবুর রহমান বসবেন একত্রে। তাঁরা মিলে সর্বসম্মতিক্রমে তালিকা করে আনবেন নতুন কমিটির।

আতাউর রহমান খান মুজিবকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বললেন, 'ওরা তো খুব ধরেছে আমি যেন সেক্রেটারি পদে প্রার্থী হই। কী করি বলেন তো?'

মুজিব বললেন, 'আপনাকে তো আমিই প্রার্থী হতে বলছিলাম। আপনি শোনেন নাই। এখন আমি দাঁড়াইয়া গেছি। এখন আপনি দাঁড়ালে নির্বাচন হবে। যে বেশি ভোট পাবে, সে সাধারণ সম্পাদক হবে।'

আতাউর রহমান খান বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি প্রার্থী হচ্ছি না।'

চার নেতা বসলেন। কিন্তু একমত হতে পারলেন না।

মুজিব এসে কাউন্সিলে বললেন, 'ভোট হবে।'

কাউন্সিল সভায় মওলানা ভাসানী সভাপতি, আতাউর রহমান খান, সালাম খান, খয়রাত হোসেন সহসভাপতি আর শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

সাবজেক্ট কমিটিতে দলের ইশতেহার ও গঠনতন্ত্র নিয়ে সারা রাত আলোচনা হলো। সেটাও পাস হয়ে গেলে মুজিব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, এত দিনে আওয়ামী লীগ একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড়াল। ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র না থাকলে কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না।

তাজউদ্দীন আহমদকে করা হলো ঢাকা উত্তর আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক।

আমগাছে তখন ছোট ছোট আম ধরেছে। বড় বড় বোঁটায় সবুজ ছোট ছোট আম ঝুলে আছে।

সেগুলোর দিকে তাকিয়ে ব্যাঙ্গমা বলল, 'ঘটনা তো ঘইটা গেল।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'কী ঘটনা?'

ব্যাঙ্গমা ঠোঁট নেড়ে নেড়ে বলল, 'তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝাইড়া ফেলতে সক্ষম হইলেন। তিনি কি যুবলীগ করবেন, নাকি ছাত্রলীগ, নাকি গণতান্ত্রিক পার্টি, নাকি মিইশা যাইবেন কমিউনিস্টগো লগে, এই দ্বন্দ্ব থাইকা তিনি একেবারে সাফসুতরা হইয়া বাইরাইয়া আইলেন।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'শেখ মুজিব তাঁরে দায়িত্ব দিছেন ঢাকা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক পদে।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'কলকাতার ইসলামিয়া কলেজের সিরাজউদ্দৌলা হলে ছাত্রদের ডাইকা মুজিব কইছিলেন, এই স্বাধীনতা স্বাধীনতা না। আমগো আসল স্বাধীনতার লাইগা লড়াই করতে পূর্ব বাংলায় যাওন লাগব।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'হ। কইছিলেন তো।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'তাজউদ্দীনও একই মতের মানুষ। বিশেষ কইরা, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন সব পাল্টাইয়া দিছে। আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই শামসুর রহমান খান আছেন না! ওই যে তাজউদ্দীনের লগে অল্পস্বল্প আলাপ-পরিচয় আছিল। ১৯৫০ সালে তিনি তো ঢুইকা গেলেন সরকারি চাকরিতে। পোস্টিং হইল করাচিতে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর তাজউদ্দীনের সঙ্গে তাঁর দেখা হইল একটা অনুষ্ঠানে। দুজনে পাশাপাশি বইসা আছেন। অনুষ্ঠান শুরু হইতে দেরি হইব। লোকজন তহনও তেমন আসে নাই।

'শামসুর রহমান খান কইলেন, আমি তো পাকিস্তান সরকারের চাকরি নিছি। তোমরা যারা জনতার রাজনীতি করো, তারা নিশ্চয়ই আমগো পছন্দ করো না।

'তাজউদ্দীন তাঁরে কইলেন, না না, ঠিক আছে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। দরকার আছে।

'কী ব্যাপারে দরকার? জিগাইলেন শামসুর রহমান খান।

'তাজউদ্দীন তখন তাঁরে কইলেন, দ্যাশ স্বাধীন হইলে আপনারা দ্যাশের কামে লাগবেন।

'দেশ তো স্বাধীন হইছেই।

'পাকিস্তান না। এই দেশ না।

'পূর্ব পাকিস্তান আবার আলাদা কইরা স্বাধীন হওনের কাম আছে নাকি?

'হ। আছে। পশ্চিমা গো লগে থাকতে আমরা পারুম না। আমগো আলাদা দ্যাশ লাগবই। তাজউদ্দীন কইলেন।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'শেখ মুজিব আর তাজউদ্দীন দুইজন আলাদা আলাদা কইরা একই ভাবনা ভাবতাছেন। আজকা তাঁরা একটা লাইনে মিলিত হইলেন। এরপরেই না ইতিহাস তাগো দুইজনারে আরও কাছে লইয়া যাইব। দ্যাশটা স্বাধীন হইব।'

ব্যাঙ্গমি বলল, '১৯৪৯ সালে মুজিব যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবিদাওয়া নিয়া আন্দোলন করতেছেন, করতে গিয়া ছাত্রদের ওপরে শাস্তির খড়্গ নাইমা আইছে, তখন মুজিব দাবি আদায়ে চাপ সৃষ্টি আর শাস্তির আদেশ প্রত্যাহারের লাইগা ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি ঘেরাও করল। তাঁর বাড়ির নিচের ঘরগুলাও দখল করল ছাত্ররা।

'সেই সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার বিশাল এক পুলিশ বহর নিয়া উপস্থিত। মুজিব ছাত্রদের সাথে পরামর্শ করলেন। ঠিক হইল, আর হগ্গলের গ্রেপ্তার হওনের দরকার নাই। আটজন থাকব, যারা গ্রেপ্তার বরণ করব। মুজিব অবশ্যই থাকবেন। কারণ হেয় গ্রেপ্তার হইলে আন্দোলন চাঙ্গা হইব।

'তাজউদ্দীন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরে বলা হইছে, তিনি যেন গ্রেপ্তার না হন। ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ মিনিট সময় দিল ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ি ছাড়নের। আটজন বাদে সবাই বাইরে গেল। কিন্তু ভিড়ের চাপে তাজউদ্দীন বাইরাইতে পারেন নাই। মুজিব তাঁরে চোখ টিপি মারলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একটা কাগজ বাইর কইরা কইলেন, আমি প্রেস রিপোর্টার। একটা কাগজে তিনি কে কে গ্রেপ্তার হইছে, তাগো নাম লেখতে লাগলেন। পুলিশ তাঁরে ছাইড়া দিল।'

ব্যাঙ্গমা কইল, 'মুজিব এই ছোট চোখ টিপার ঘটনা আর তাজউদ্দীনের ছাড়া পাওনের কথা ভুলতে পারেন নাই। ১৮ বছর পর নিজের স্মৃতিকথা জেলে বইসা লেখনের সময় এই কথা উল্লেখ করতে তিনি ভোলেন নাই। কাজেই আরও পরে যখন ১৯৭১-এর ২৫ মার্চের রাইতে শেখ মুজিবরে পাকিস্তান আর্মি ধইরা নিয়া যাইব, তাজউদ্দীন যে গ্রেপ্তার এড়ায়া যাইতে পারব, আর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হইব, এইটা তো আমরা অহনই কইয়া দিতে পারি।'

৩৩.

হেমন্তকাল। হাটখোলার সরুপথে রিকশায় চলেছেন মুজিব। সকালবেলা। রোদ উঠেছে মিষ্টি। রাস্তায় শিউলি ফুল ঝরে পড়ে আছে, পাঁচিল ডিঙিয়ে মাথা বের করা শিউলিঝাড়ে পড়েছে সকালবেলার রোদ।

শেখ মুজিব যাচ্ছেন এ কে ফজলুল হকের কাছে। কে এম দাস লেনের বাড়িটির গেট খোলাই ছিল। তিনি ভেতরে ঢুকে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন, 'নানা, আছেন নাকি।'

বিশালদেহী ৮১ বছরের ফজলুল হক বেরিয়ে এলেন। পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবির ওপরে একটা কার্ডিগান। মুজিবের পরনে ট্রাউজার, গায়ে শার্ট, শার্টের ওপরে একটা হালকা কোট।

'নাতি, কী খবর? আসো, বসো।'

মুজিব বৈঠকখানায় বসলেন।

এ কে ফজলুল হককে বাংলার লোকেরা জানে শেরেবাংলা বা বাংলার বাঘ বলে। তাঁকে বাংলার মানুষ মোটের ওপরে খুব শ্রদ্ধা করে। তিনি অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কৃষক প্রজা পার্টির নেতা। মুসলিম লীগ করেননি বলে শেখ মুজিবের দল তাঁর বিরোধিতা করত।

আজ বৈঠকখানায় বসে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মুজিবের মনে পড়ে গেল, বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। মুজিব তখন কলকাতায় ছাত্র, গোপালগঞ্জ আসেন মাঝেমধ্যে, বক্তৃতা দেন পাকিস্তানের পক্ষে। এই সময় শহরের কয়েকজন মুরুব্বি মুজিবের পিতা শেখ লুৎফর রহমান সাহেবকে বললেন, 'আপনার ছেলে যা আরম্ভ করেছে, ওকে তো জেল খাটতে হবে। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে এখনই মানা করেন।'

আব্বা তখন যে উত্তরটা করেছিলেন, তা মুজিবের আজও মনে আছে। তিনি বললেন, 'দেশের কাজ করছে। অন্যায় তো কিছু করছে না। যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে। দেশের জন্য জেল খাটবে। পাকিস্তান না করলে আমরা মুসলমানরা কি টিকতে পারব?'

একদিন মেলা রাত পর্যন্ত বাপ-বেটায় শুয়ে শুয়ে রাজনীতি নিয়ে আলাপ

করছেন। হাবিবুল্লাহ বাহারের লেখা *পাকিস্তান* গ্রন্থ মুজিবের মুখস্থ। মুজিবুর রহমান খাঁর *পাকিস্তান* বইও তিনি হেফজ করেছেন। শেরেবাংলা লাহোরে যে পাকিস্তান প্রস্তাব করেছিলেন, আর সেদিন যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল, পাকিস্তান হবে দুইটা, আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র, পশ্চিম অংশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান, আর সমস্ত বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান। কলকাতাও সেই স্বাধীন দেশে থাকবে, দার্জিলিং থাকবে, আসাম থাকবে। পিতা খুশি হলেন পুত্রের আলোচনা শুনে।

শুধু বললেন, 'শোনো, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কোনো রকমের ব্যক্তিগত আক্রমণ করবা না।'

একদিন মা-ও বললেন, 'বাবা, আর যা-ই করতি চাও, করবা, কিন্তু হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। শেরেবাংলা এমনি এমনি শেরেবাংলা হন নাই।'

শেরেবাংলার সামনে বসে আছেন মুজিব। দুজনের হাতেই চায়ের কাপ। কী চা? দার্জিলিং চা নাকি? দার্জিলিংও বাংলার অংশ হওয়ার কথা ছিল, খাজা নাজিম উদ্দিন সে দাবি ছেড়ে চলে এসেছেন ঢাকায়। মুজিব মনে মনে ভাবলেন।

মায়ের কথাটাও আজ মুজিবের মনে পড়ছে। শেরেবাংলা এমনি এমনি শেরেবাংলা হন নাই। বাংলার মানুষ তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিল। আরেক দিনের কথা। শেখ মুজিব বক্তৃতা করছেন তাঁর নিজের ইউনিয়নে, বলছিলেন, ফজলুল হক সাহেব কেন মুসলিম লীগ ত্যাগ করলেন, কেন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন, কেন তিনি পাকিস্তান চান না?

এই সময় একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। মুজিব তাঁকে চেনেন। মুজিবের দাদার বন্ধু। তাঁদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তাঁদের সবাইকে তিনি ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধাভক্তি করেন। সেই বৃদ্ধ বললেন, 'খোকা মিয়া, যা বলার বলেন, কিন্তু হক সাহেবের বিরুদ্ধে কিছু বইলেন না। তিনি যদি পাকিস্তান না চান, আমরাও চাই না। জিন্নাহ কে? আমরা তো তাঁকে চিনি না। নামও শুনি নাই। হক সাহেব গরিবের বন্ধু।'

এর পর থেকে মুজিব কোনো দিনও ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই।

ফজলুল হক সাহেবের আরেকটা গুণ আছে। তিনি সবার নাম ও চোহারা মনে রাখতে পারেন। বহুদিন পরে কাউকে দেখলে তার নাম ধরে ডেকে বসেন তিনি। এইভাবে নাম ধরে ডাকলে কে না মুগ্ধ হবে! মুজিব ফজলুল হকের এই গুণটা রপ্ত করার চেষ্টা করেন। তিনিও সবার নাম ও চেহারা মনে

রাখার অনুশীলন করেন। আর ফজলুল হক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন দেশি পরিবেশ। ইংলিশ কেতা, উর্দু কেতা তার পছন্দ নয়। মুজিবের সঙ্গে এদিক দিয়ে মিলে যায় ফজলুল হকের।

শেখ মুজিব চায়ের কাপ নামিয়ে বললেন, 'নানা, আপনি অ্যাডভোকেট জেনারেল পদ ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন কেন? মুসলিম লীগ তো খুবই আনপপুলার। দেশের মানুষ তো দুই চোখে এই অযোগ্য, জালিম, অসৎ, দুর্নীতিবাজদের পছন্দ করে না।'

'কী করতে বলো?' সুরুৎ করে এক কাপ চায়ের অর্ধেকটা গিলে ফেলে ফজলুল হক বললেন।

'আপনি আওয়ামী লীগে জয়েন করেন।'

'করতে বলো।'

'হ্যাঁ. আপনি শেরেবাংলা। আপনার কি শেয়ালদের সঙ্গে চলা মানায়? আমি যাচ্ছি চাঁদপুরে। আওয়ামী লীগের জনসভা করতে। আপনিও যাবেন আমার সাথে।'

'আচ্ছা তুমি যখন বলছ।'

মুজিব জানেন, ফজলুল হক রাজি হবেন। মোহন মিয়া চেষ্টা করেছিলেন ফজলুল হককে দিয়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনকে সরিয়ে নিজেরা ক্ষমতা নিতে। পারেন নাই। কার্জন হলে বেদম মারপিট হয়েছে দুই গ্রুপে। মার খেয়ে কেটে পড়েছে মোহন মিয়ার দল।

চাঁদপুরের জনসভায় ফজলুল হক বললেন, 'যাঁরা চুরি করবেন, তাঁরা মুসলিম লীগে থাকেন। আর যাঁরা ভালো কাজ করতে চান, তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।'

মুজিব জানেন, ফজলুল হক ভালো বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা করেন গল্পের ছলে। এই কারণেই মুসলিম লীগের সঙ্গে কৃষক প্রজা পার্টির যখন কোনো নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো, নির্বাচনী এলাকায় ফজলুল হকের জনসভা থাকলে তিনি যেন ভাষণ দিতে না পারেন, তা নিশ্চিত করতে কৌশল প্রয়োগ করত মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মীরা। তারা রটিয়ে দিত, শেরেবাংলা ওখানে আসছেন কেরোসিন তেল দিতে। তখন কেরোসিন তেলের খুব আক্রা। লোকজন কেরোসিনের খালি টিন হাতে আসত, আর দেখত, কেরোসিন দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে ভাষণ। তারা বিরক্ত হতো। আর মুসলিম ছাত্রলীগের ছেলেরা ফজলুল হককে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করত। তাদের ভয়, শেরেবাংলা যদি একবার তার গল্পের ঝাঁপি খুলতে পারেন, জনতা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়বে।

তাঁর গল্পের কৌশলও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তিনি একবার ঢাকায় লেখাপড়া না-জানা প্রার্থী কালু মিয়ার পক্ষে নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে এসেছেন। লোকে তাঁকে ধরল, 'এই রকম মূর্খ প্রার্থীর পক্ষে আপনি কেন কথা বলছেন?'

তিনি বললেন, 'দেশ হলো একটা নৌকা। আমি হলাম তার মাঝি আমি তো হাল ধরেই আছি। আমার এখন দরকার মাল্লা। এখন শিক্ষিত লোককে আমি মাল্লা বানাব কেন। মাল্লা হিসাবে আমার দরকার কালু মিয়াকে। আমি মাঝি, দেশের হাল ধরি, এই যদি চান, মাল্লা হিসাবে কালু মিয়াকে ভোট দেন। আর যদি মাঝি বদলাতে চান, চান যে আমিই না থাকি, তাইলে কালু মিয়ার শিক্ষিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট দেন।'

এই গল্প শেখ মুজিবের অনেকবার শোনা।

আরেকবারের ঘটনা। মুর্শিদাবাদে গেছেন তিনি। উপনির্বাচন উপলক্ষে। তিনি সমর্থন জানাতে এসেছেন সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে। বদরুদ্দোজা শিক্ষিত লোক। তিন ভাষায় সুন্দর কথা বলতে জানেন। ফজলুল হক ভাষণ দিতে শুরু করলেন, 'ভাইসব, আপনারা যখন হাটে হাঁড়ি কিনতে চান, তখন হাঁড়ি বাজিয়ে দেখে নেন কি না?'

সবাই বলল, 'হ্যাঁ। তাই নেই।'

'তাহলে এবার আমরা একটু বদরুদ্দোজাকে বাজিয়ে দেখব। বদরুদ্দোজা তুমি পাঁচ মিনিট বাংলায় বক্তৃতা করো তো।'

বদরুদ্দোজা পাঁচ মিনিটে কর্ডোভা, গ্রানাডা থেকে শুরু করে বাংলার নির্যাতিত মুসলমানদের ইতিহাস তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করতে লাগলেন।

ফজলুল হক বললেন, 'এবার একটু উর্দুতে পাঁচ মিনিট ভাষণ দাও তো।'

বদরুদ্দোজা উর্দুতে বলতে লাগলেন।

এবার একটু ইংরেজিতে বলো দেখি।

অমনি বদরুদ্দোজা ইংরেজিতে বলতে লাগলেন।

ফজলুল হক বললেন, 'আপনারা নিজেরা বাজিয়ে দেখলেন। বদরুদ্দোজা বাজে কি না?'

একই মানুষ, একবার শিক্ষিতের পক্ষে, একবার অশিক্ষিতের পক্ষে চমৎকার করে বলে গেলেন। মানুষ তাঁর কথাতেই উদ্দীপিত হলো।

এখন তিনি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে, আর আওয়ামী লীগের পক্ষে বলছেন।

কিছুদিন আগে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন।

মুজিব ফজলুল হকের ভাষণ শোনেন আর হাসেন।

৩৪.

কোর্টের পেছনে তাঁতীবাজারের ছোট্ট বাসা। সকালবেলা। মুজিব নাশতা করতে বসেছেন। সঙ্গে অপর দুই গৃহবাসী খোন্দকার আবদুল হামিদ আর মোল্লা জালাল। বাখরখানি এসেছে গরম গরম, আর জিলাপি। নাশতা ভালো হচ্ছে। জিলাপি খাওয়ার একটা অসুবিধা হলো, কামড় দেওয়ার পর রস গায়ে পড়ে। মুজিব খুবই সাবধান। রস তিনি কিছুতেই গায়ে পড়তে দেবেন না। তিনি নিচে বাখরখানি রেখে ওপরে জিলাপি রেখে মুখে পুরছেন।

একটু পরে দেখলেন, শার্টে জিলাপির রস লেগে গেছে। কোন পথে যে রস পড়ে!

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন খোকা। পুরো নাম মমিনুল হক খোকা। শেখ মুজিবের ফুফাতো ভাই। তাঁকে দেখে মুজিব উচ্চ স্বরে বললেন, 'এই তুই কোথায় থাকিস। আমি নূরপুর গেছলাম। ফুপুআম্মা বললেন, তোর কোনো খবরাখবর পান না। ব্যবসার জন্য নাকি বাড়ি থেকে টাকাপয়সা আনছিস। তারপর আর কোনো খবর নাই। নে, নাশতা কর। বস।'

'আমি নাশতা কইরে এসেছি মিয়াভাই।'

'থো। কী নাশতা করছিস। নে বস। জিলাপি আর বাকরখানি দুইটাই গরম আছে।'

নাশতা খাওয়া হয়ে গেলে মুজিব বললেন, 'খোকা। তুই কোথায় থাকিস? বাসা নিছিস কোথায়?'

'আরমানিটোলা। রজনী বোস লেন।'

'চল তো, দেখে আসি তোর বাসা।'

মুজিব আর খোকা রিকশায় চললেন আরমানিটোলা। বাইরে আকাশে মেঘ। রোদ ওঠেনি। দিনটা মৃত মাছের চোখের মতো। রাস্তার ধারে একদল কাক পাতার ঠোঙা নিয়ে টানাটানি করছে।

তাঁরা রজনী বোস লেনে এসে পড়েছেন। বটতলার নিচে অবনীর মিষ্টির দোকান। এই দোকানে পাওয়া যায় দারুণ স্বাদের পুরী আর ঘিয়ে ভাজা হালুয়া। এইখানে আড্ডা বসে মমিনুল হক খোকাদের, বন্ধুবান্ধব রোজ ভিড়

করেন এখানে। ওই যে ওখানে আগাখান সম্প্রদায়ের মোহাম্মদ ভাইয়ের বাড়ি। আরেকটু দূরে দেখা যাচ্ছে বোম্বে রেস্টুরেন্ট।

মুজিব নামলেন রিকশা থেকে। রিকশাওয়ালাকে বললেন, 'ভাই, আপনি একটুখানি ওয়েট করেন। আমি এখনই আবার ফিরব।'

৮/৩ রজনী বোস লেনের বাড়িতে ঢুকে পড়লেন মুজিব। চারদিক তাকিয়ে দেখলেন। রান্নাঘর, শৌচাগার সব। তারপর বললেন, 'চল, আমার সাথে চল।'

মমিনুল হক খোকা বাধ্য ছেলের মতো তাঁর মিয়াভাইয়ের রিকশায় উঠে পড়লেন।

তাঁতীবাজারের বাড়িতে গিয়ে তিনি মোল্লা জালাল আর খোন্দকার আবদুল হামিদকে বললেন নির্দেশের স্বরে, 'এই, তোমরা সব বিছানাপত্র গুছায়া লও। আমরা আজ থেকে খোকার বাসাতেই থাকব।'

মুজিবের কথার ওপরে কোনো কথা চলে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজনের বিছানাপত্র, স্যুটকেস, ব্যাগ এসে পৌঁছে গেল রজনী বোস লেনের বাড়িতে।

মুজিবের কপালে জুটল একটা ছোট্ট কামরা।

সেই ছোট কামরাতেই আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদের মতো বড় বড় নেতারা প্রায়ই আসতে লাগলেন।

৩৫.

বগুড়ার পাঁচবিবি গ্রামে মওলানা ভাসানী অবস্থান করছেন। তাঁকে ধরে আনতে হবে। মুজিব আর খন্দকার ইলিয়াস তাই চলেছেন ট্রেনে।

ভাসানী পাঁচবিবি থেকে চিঠি পাঠিয়েছেন মুজিবের কাছে। সাধারণ সম্পাদকের কাছে সভাপতির চিঠি। ময়মনসিংহে পার্টির সম্মেলন ডাকো।

সভাপতির নির্দেশ। মুজিব অমান্য করতে পারেন না। তিনি ময়মনসিংহেই সম্মেলন ডাকলেন।

কিন্তু তিনি এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলেন।

সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছে। সামনে পূর্ব বাংলায় নির্বাচন হবে। মুজিবের হিসাব হলো, বাংলায় এখন আওয়ামী মুসলিম লীগ ছাড়া আর কোনো দল নাই। আর কোনো পার্টির কোনো জনপ্রিয়তা নাই। 'গণতন্ত্রী দল' নামে একটা দল খোলা হয়েছিল, কাগজ-কলমের বাইরে তার কোনো অস্তিত্ব নাই। মুসলিম লীগ ঘোরতর অজনপ্রিয়। এ অবস্থায় নির্বাচন করলে আওয়ামী লীগ এককভাবে জয়লাভ করবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের ভেতরেই অনেকেই চাইছেন যুক্তফ্রন্ট। কেউ কেউ গিয়ে ফজলুল হককে বুঝিয়েছেন, আপনি কেন আওয়ামী লীগে যোগ দেবেন। তাহলে তো আপনার লোকজন নমিনেশন পাবে না। এমএলএ, মিনিস্টার হতে পারবে না। আপনি কৃষক প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করুন। আপনি আওয়ামী লীগের সাথে দর-কষাকষি করতে পারবেন। আর তা ছাড়া যদি মুসলিম লীগ কিছু আসন পায়, নির্বাচনের পরে তাদের সাথেও দর-কষাকষি করা যাবে।

ফজলুল হক দেখলেন, কথা ঠিক।

তাঁর পেছনে গিয়ে জুটল মুসলিম লীগের বিদ্রোহী, পদত্যাগী, বহিষ্কৃত সুবিধাবাদীরা।

শেখ মুজিব যুক্তফ্রন্ট চান না। বিশেষ করে, ফরিদপুরের মুসলিম লীগারদের তিনি সব সময়ই অপছন্দ করে এসেছেন, তারা এসে জুটেছে ফজলুল হকের সঙ্গে।

ভাসানী কাউন্সিল ডেকে নিজে আশ্রয় নিয়েছেন বগুড়ার পাঁচবিবিতে।

ট্রেনে বসে খন্দকার ইলিয়াসকে মুজিব বললেন, 'মওলানা সাহেবের এই এক অভ্যাস। যখনই কোনো জটিল সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় হয়, উনি সটকে পড়েন।' এর আগে মুজিব ভাসানীর সঙ্গে দেখা করেছেন। ভাসানী তাঁকে বলেছেন, 'যদি হক সাহেব আওয়ামী লীগে আইসেন, তাইলে তাঁরে গ্রহণ করা যায়। আর যদি অন্য দল করেন, তাইলে তাগো আমরা যুক্তফ্রন্টে লইমু না। যে লোকগুলান মুসলিম লীগ থাইক্যা বিতাড়িত হইছে, হেরা অহন হক সাহেবের কান্ধে ভর করনের চেষ্টা করতাছে। মুসলিম লীগের যত আকাম-কুকাম, তার সাথে হেরা এই সেদিন পর্যন্ত জড়িত আছিল, হেরা রাষ্ট্রভাষা বাংলারও বিরোধিতা করছে, হেগো আমরা ক্যান লমু? আর শুনো, আওয়ামী লীগের মইধ্যে জানি যুক্তফ্রন্টঅলারা মাথাচাড়া দিয়া উঠতে না পারে, এইটাই দেইখো।'

মুজিব জানেন, রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর অবস্থান পরিষ্কার। বাংলার জন্য তাঁর যে ভালোবাসা, তাতে কোনো খাদ নাই। তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন।

ট্রেন চলছে। প্রথমে যেতে হবে বাহাদুরাবাদ ঘাট। তারপর নদী পার হতে হবে স্টিমারে। ওপারে ফুলছড়ি ঘাট।

মওলানা ভাসানীকে নিয়ে সত্যিই মুশকিল। তাঁর জনপ্রিয়তা দারুণ, তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা তুলনাহীন, লোক ভালো কিন্তু যখন কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া সময় আসে, যাতে দুটো বিবদমান পক্ষ থাকে, ভাসানী আড়ালে চলে যান। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের 'কায়েদ-এ আজম' জিন্নাহ এসেছিলেন আসামে। মওলানা ভাসানী তখন আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি। আসামের মুসলমানেরা পাকিস্তান আন্দোলনে পুরা সমর্থন দেবে, জিন্নাহকে আশ্বস্ত করলেন ভাসানী। সেই সঙ্গে তিনি আসামের মুসলমানদের ওপরে কী রকম অত্যাচার হচ্ছে, তার বিবরণ পেশ করতে লাগলেন। বর্ণনার এক পর্যায়ে আবেগে তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর বর্ণনা শুনে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা সবাই কাঁদতে লাগল। পরে, জিন্নাহকে আলাদা পেয়ে, ডিনারের আগে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ইস্পাহানি জিন্নাহর সামনে মওলানা ভাসানীর প্রশংসা করতে লাগলেন। জিন্নাহ বিরক্তিভরে বললেন, 'মওলানার মতো লোক মোটেও রাজনীতির উপযুক্ত নন। রাজনীতিতে বাজে ভাবালুতার কোনো স্থান নাই। আবেগের কোনো জায়গা নাই। রাজনীতি কঠিন দাবা খেলা। এখানে চোখ থাকবে অশ্রুহীন, যাতে বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। এ জন্য প্রয়োজন কঠিন পরিশ্রম, সাহস আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।'

মুজিবকে এই গল্প নিজের মুখে করেছেন ইস্পাহানি।

ব্যাঙ্গমা বলে, 'ইস্পাহানি কিন্তু বাঙালি নন। পাকিস্তানি।'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'তাতে কী হইল। তাগো আদি নিবাস ইরান। তয় মুজিবের তিনি ভক্ত আছিলেন। আরও কয়েক বছর পর আইয়ুব খান যহন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হইব, আর বেসিক ডেমোক্রেসি চালু করতে চাইব, তহন একদিন ইস্পাহানি প্লেনে বসবেন বিশিষ্ট লেখক কলকাতাবাসী অন্নদাশঙ্কর রায়ের পাশের আসনে। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁরে জিগাইবেন, পাকিস্তানের পলিটিক্সের খবর কী?

'ইস্পাহানি জবাব দিবেন, আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি কোনো ডেমোক্রেসিই না। একে তো মাত্র আশি হাজার ভোটার। এর মধ্যে একচল্লিশ হাজার ভোটার কিইনা ফেলতে কয় টাকা আর লাগে? আইয়ুব খান ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চান।

'তাইলে কী করা উচিত? অন্নদাশঙ্কর রায় পুছ করবেন। ইস্পাহানি জবাব দিবেন, গণতন্ত্র দিয়া ইলেকশন কইরা ইলেকটেড পলিটিশিয়ানদের হাতে ক্ষমতা ছাইড়া দিয়া চইলা যাওন উচিত আইয়ুব খানের।

'পূর্ব বাংলায় কে আছে যে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হইতে পারে?
'কেন, শেখ মুজিব। ইস্পাহানি জবাব দিব।'

বাহাদুরাবাদ ঘাট এসে গেল।

শেখ মুজিব আর খন্দকার ইলিয়াস নামলেন ট্রেন থেকে। এখন এই বালিভরা পথে ছুটে যেতে হবে স্টিমার ধরতে। মুজিবকে অনেকেই চেনে, তারা তাঁকে সালাম দিয়ে পথ করে দিতে লাগল।

শেখ মুজিবের মনে নানা দুশ্চিন্তা। সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে খবর দেওয়া হয়েছে। তিনি আসবেন। তিনি পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি। কিন্তু পূর্ব বাংলার লীগের সিদ্ধান্ত নেবে কাউন্সিলররা। যুক্তফ্রন্টের পক্ষে অনেকেই ঘোঁট পাকিয়েছে। ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভাপতি আবুল মনসুর আহমদ। তিনি বুঝদার লোক। কিন্তু তিনি পরিচালিত হচ্ছেন তাঁর সাধারণ সম্পাদক হাশিমউদ্দিন সাহেবের দ্বারা। মুজিব সমস্ত জেলায় জেলায় চিঠি পাঠিয়েছেন, সব জেলার প্রতিনিধি যেন উপস্থিত থাকে। তাদের থাকার জন্য ছোটবড় সব হোটেল বুকিং দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

মুজিব জানেন, সব জেলা থেকে প্রতিনিধিরা এলে মুজিব যা বলবেন, সেটাই ভোটে গৃহীত হবে। কিন্তু মওলানা ভাসানী হঠাৎ করে চিঠি পাঠিয়েছেন, 'আমি সভায় উপস্থিত হইতে পারিব না।'

মুজিবের মাথায় হাত। সভাপতি ছাড়া সভা হবে, এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে! তিনি তাই ছুটেছেন মওলানা ভাসানীকে পাঁচবিবি থেকে ধরে আনতে।

খন্দকার মোশতাকও যুক্তফ্রন্ট-সমর্থক। কমিউনিস্ট ভাবাপন্নরা আওয়াজ তুলেছে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে।

স্টিমার ফুলছড়ি ঘাটে পৌঁছাল।

মুজিব আর ইলিয়াস নামলেন স্টিমার থেকে। আবার দৌড়ে গিয়ে বগুড়াগামী ট্রেনে উঠতে হবে।

তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত ট্রেনে উঠেছেন। আরেকটা ট্রেন এল বগুড়া থেকে। মুজিব যেন দেখতে পেলেন, ওই ট্রেনে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ভাসানীর মতো দেখতে কাকে যেন দেখা যায়।

ইলিয়াসকে বললেন, 'দেখ তো কে?'

ইলিয়াস ট্রেন থেকে নেমে ওই ট্রেনের জানালায় উঁকি দিয়ে বললেন, 'ওই তো মওলানা সাহেব।'

তখন মুজিবের ট্রেন ছেড়ে দেয় দেয়। হুইসেল বেজে উঠেছে তাড়াতাড়ি

তিনি মালপত্রসমেত নেমে পড়লেন।

মওলানা ভাসানীও ট্রেন থেকে নেমেছেন। মুজিব আর ইলিয়াস তাঁর কাছে গেলেন। তিনি কোনো কথা না বলে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন। মুজিবেরাও তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল।

মুজিব জিগ্যেস করলেন, 'ব্যাপার কী? আপনি সভা ডাকতে বললেন। আমি সভা ডাকলাম। এখন আবার আপনি উপস্থিত হবেন না কেন?'

মওলানা ভাসানী হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'তোমরা জানো না, ঐক্যফ্রন্ট করার লাইগা তোমাগো নেতারা পাগল হইয়া গেছে। আমি তো নীতি ছাড়া নেতাগো লগে এক হইতে পারি না। আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে লোক বেশি। ভোট হইলে হাইরা যাইবা। আমি আর রাজনীতিই করুম না। আমার তো কিছুই নাই। আমি তো ভোটে খাড়ামু না। কারও ক্যানভাসও করতে পারুম না। তাই আর রাজনীতি করুম না। কাউন্সিল সভায় যোগ দেওনের কোনো ইচ্ছা তাই আমার নাই।'

মুজিব হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আপনি তো আমার সাথে পরামর্শ না করেই কাউন্সিল ডাকতে বলে দিলেন। কাউন্সিল তো আর কিছু দিন পরে ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল। ময়মনসিংহের বুদ্ধি আপনারে কে দিল! তবে আপনি তো কাউন্সিলের মত জানেন না। আপনিও ইচ্ছা করলে যুক্তফ্রন্ট পাস করাইতে পারবেন না। আওয়ামী লীগের সদস্যরা এই বিতাড়িত মুসলিম লীগ নেতাদের হাতে অনেক মাইর খেয়েছে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। তারা জানে, মুসলিম লীগের এই ঘুষি খাওয়া নেতারা বিরোধী দল করার জন্য আসে নাই। আওয়ামী লীগের কান্ধে পাড়া দিয়া ইলেকশন পার হইতে আসছে। আপনি যদি উপস্থিত না হন, তাইলে আমি এখনই টেলিগ্রাম করে দিলাম। সভা স্থগিত। আমিও বাড়ি চলে যাব।'

মওলানার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা সর্দারের চর নামে একটা জায়গায় পৌঁছে গেলেন। ছোট্ট দুটি কুঁড়েঘর, একটা সামান্য আঙিনায় গিয়ে থামলেন ভাসানী। হাঁক পাড়লেন, 'মুসা মিয়া।'

মুসা মিয়া দৌড়ে এসে কদমবুসি করলেন তাঁর পীর সাহেবকে। 'হুজুর, আসসালামু আলাইকুম। আস্যা পড়ছেন, খুবই ভালো করিছেন, একনা খবর দিয়া আসা লাগে না, হুজুর।'

তিনি এখন মওলানা আর তাঁর সঙ্গীদের কোথায় বসতে দেন?

রাতে কোনো ট্রেন নাই ঢাকা ফেরার, মুজিব-ইলিয়াসকে এখানেই রাত কাটাতে হবে।

গাছের নিচে মাদুর বিছিয়ে বসে পড়লেন মওলানা ভাসানী, মুজিব, খন্দকার ইলিয়াস। সেখানেই মুজিব-ইলিয়াসের সুটকেসও রাখা হলো। তখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। ডুবন্ত সূর্যের ম্লান আলো এসে পড়েছে গাছের নিচে এই আগন্তুকদের চোখে-মুখে। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গরুর পাল নিয়ে ফিরে আসছে রাখাল। হাঁসের দল কাতারবন্দী হয়ে জলাশয় থেকে ফিরে আসছে গৃহস্থবাড়ির আঙিনায়।

রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উঠে কুয়াশার সঙ্গে মিশে থমকে আছে কলাগাছের মাথায়

মুসা মিয়া বলতে লাগলেন, 'হুজুরদের কষ্ট হতিছে। চা খাবেন? হামি চা আনবার পাঠ্যা দিছুঁ ফুলছড়ি ঘাটত। চা আসিচ্চে।'

সন্ধ্যার সময় যে মোরগ ঘরে ফিরে এল, সে কি জানত, কী অপেক্ষা করছিল তার অদৃষ্টে। একটু পরে মোরগের পাখা ঝাপটানোর শব্দ এল। বোঝা গেল, মোরগ জবাই হচ্ছে।

মুসা মিয়ার তো কোনো সংস্থান নাই যে এই অতিথিদের রাতে থাকতে দেন। একজন প্রতিবেশীর একটা ঘর আছে, সেখানেই তিনজনের বিছানার ব্যবস্থা হলো। রাতের বেলা তিনজনে একবার গরম স্বরে, একবার নরম স্বরে আলোচনা চালিয়ে গেলেন। ভাসানী বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও গা, আমি কথা দিতাছি আমিও যামু। কইবেন করুম মিটিঙে।'

ভাসানীর প্রতিশ্রুতি পেয়ে মুজিব আর খন্দকার ইলিয়াস ফিরলেন ময়মনসিংহ। কিন্তু আসার আগে মুসা মিয়া নামের ওই প্রায় চালচুলাহীন সহায়-সম্বলহীন কৃষকটিকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'মুসা মিয়া, আপনার মতো বড় হৃদয়ের মানুষ আমি জীবনেও দেখি নাই। আজকে আপনি আমাদের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসা মেহমানদের জন্য যা করলেন, তার কোনো তুলনা নাই। আমি আপনার কথা চিরদিন মনে রাখব।'

ব্যাঙ্গমা বলল,

> মুসা মিয়া গরিব না, অন্তরেতে ধনী।
> তার কথা মুজিবর ভোলেনি কখনই ॥

ব্যাঙ্গমি বলল,

> ১৩ বৎসর পরে কারাগারে বসে।
> মুজিবর স্মৃতি লেখে বিষাদে হরষে ॥

কত মহারথী নাম এসে ভিড় করে।
এক নাম লেখা হয় স্বর্ণাক্ষরে ॥
মুসা মিয়া নাম, বাড়ি চর সরদার।
এত বড় প্রাণ আমি দেখি নাই আর ॥
মুজিব লেখেন তাহা, কৃতজ্ঞতাভরে।
ইতিহাসে মুসা মিয়া জ্বল জ্বল করে ॥

ময়মনসিংহের সম্মেলনে মুজিব জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন যুক্তফ্রন্ট গঠনের ধারণার বিরুদ্ধে। ১৯৪৮ সালের, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের যাঁরা বিরোধিতা করেছে, তাদের সঙ্গে ঐক্য হতে পারে না। তবে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক যদি আওয়ামী লীগে যোগ দিতে চান, তাকে স্বাগত জানানো হবে।

ভোট হলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত পাস হয়ে যেত যে, আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল ঐক্যফ্রন্ট চায় না।

কিন্তু আতাউর রহমান সাহেব বললেন, 'মুজিব, এই প্রস্তাব কিন্তু প্রকাশ্যে আমাদের পাস করিয়ে নেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাতে লোকের মনে ভুল ধারণা হবে, আওয়ামী লীগ ঐক্য চায় না।'

মুজিব বললেন, 'আমি আপনার কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।'

কারণ, মানুষ মুসলিম লীগের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ। তারা যেমন করেই হোক, এই অত্যাচার থেকে মুক্তি চায়। কাজেই তারা বিরোধী দলগুলো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ঐক্য করুক, এটা আশা করে। বিশেষ করে, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এক হোন, এটা জনতার প্রত্যাশা।

সোহরাওয়ার্দী এসেছেন কাউন্সিলের প্রধান অতিথি হয়ে। তিনিও একবার বললেন, 'বৃদ্ধ নেতা ফজলুল হক সাহেবকে একবার দেশের মানুষের সেবা করার সুযোগ দেওয়া উচিত।'

শেখ মুজিব বললেন, 'ইলেকশন এলায়েন্স করা যেতে পারে। যেখানে হক সাহেবের দলের ভালো লোক থাকবে, সেখানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী দেবে না, আর যেখানে আওয়ামী লীগের ভালো প্রার্থী থাকবে, সেখানে হক সাহেবের দল প্রার্থী দেবে না।'

মওলানা ভাসানী খেপে গেলেন, বললেন, 'না, কোনো রকমের এলায়েন্স হইব না। আওয়ামী লীগ একলাই ইলেকশন করব।'

এই পর্যন্ত কথা হয়ে রইল।

মওলানা ভাসানী আর মুজিব বেরিয়ে পড়লেন সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করতে। সোহরাওয়ার্দীও করাচি ঘুরে ঢাকায় আসছেন।

ভাসানী-মুজিব প্রথমে সফর করলেন উত্তরবঙ্গ। জনসভা উপচে পড়ছে লোকে। আর মুজিব দলের লোকদের বললেন, 'কাকে প্রার্থী করা যায়, ঠিক করে নাম পাঠিয়ে দেবেন।'

উত্তরবঙ্গ থেকে তাঁরা গেলেন কুষ্টিয়া। এই সময় ঢাকা থেকে এল টেলিগ্রাম। প্রেরক: আতাউর রহমান খান এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবকে অতিসত্বর ঢাকা যেতে হবে।

মুজিব বললেন, 'কাল জনসভা। সেটা ক্যানসেল করে যাওয়া যায় নাকি? লোকজন খেপে গিয়ে কর্মীদের ধরে ধরে মার দিবে। হুজুর আপনি যান, আমি কালকের জনসভা শেষ করে আসব।'

কুষ্টিয়ার জনসভা শেষ করার পর মুজিব খবর পেলেন, ঢাকায় মওলানা ভাসানী ও ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের অঙ্গীকারনামায় সই করেছেন।

মুজিব তাড়াতাড়ি ফিরলেন ঢাকায়। মওলানা ভাসানীকে গিয়ে ধরলেন, 'এইটা আপনি কী করলেন! আমার জন্য দুইটা দিন অপেক্ষা করতে পারলেন না? আর আমার জন্য না পারেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের জন্য তো অপেক্ষা করতে পারতেন?'

ভাসানী বললেন, 'আমি কিছু জানি না। আমি কইছিলাম, মুজিব না আইলে আমি কোনো দস্তখত করতে পারুম না। আতাউর রহমান খান আর মানিক মিয়া কইল, মুজিবরে আমরা বুঝামু। ওই দায়িত্ব আমাগো। আপনে সাইন করেন। আমি করলাম।'

মুজিব বললেন, 'আতাউর রহমান খান সাহেব আর মানিক ভাই যদি বলে থাকেন, আমার দায়িত্ব তাঁরা নিছেন, আমি তো আপত্তি করতে পারব না। মানিক ভাইয়ের কোনো কথা আমি ফেলি না। তবে খান সাহেব নিজেই তো যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে উনি তো আবার না করতে পারেন না। কেউ এসে হাত ধরলেই উনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। যা-ই হোক, দেশের যদি এতে ভালো হয়, আমি যুক্তফ্রন্ট মেনে নিলাম।'

মুজিবের রাগ কমে গিয়েছিল। কিন্তু আবার তিনি খেপে গেলেন, যখন শুনলেন নিজামে ইসলামী নামের একটা দলকেও যুক্তফ্রন্টে নিতে হবে। ফজলুল হক সাহেব নাকি তাদের সঙ্গে আগেই ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করার জন্য চুক্তি করে রেখেছেন। গণতন্ত্রী দলকেও নিতে হবে। বুঝলাম, তাদের কর্মীরা প্রগতিশীল। কিন্তু আমার পার্টির লোকদের বঞ্চিত করে তো আমি বাইরের

লোকদের জায়গা করে দিতে পারি না। তিনি মওলানা সাহেবকে গিয়ে ধরলেন। এসব কী হচ্ছে?

যুক্তফ্রন্টের একটা ২১ দফা কর্মসূচি প্রস্তুত করলেন আবুল মনসুর আহমদ। তাঁকে একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে এই নির্বাচনী ইশতেহার তৈরি করার জন্য। মওলানা ভাসানী বললেন, 'শুনো মনসুর, আওয়ামী লীগের ৪২ দফা মেনিফেস্টো তৈরি করাই তো আছে। কাউন্সিলে পাস করানো আছে সেইটারেই তুমি যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার বানায়া ফেলো।'

আবুল মনসুর আহমদ ভাবলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির একুশ শব্দটাকে মূল অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। তিনি ওই ৪২ দফাকেই বানিয়ে ফেললেন ২১ দফা। আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোতেই এটা ছিল যে, ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করতে হবে, একটা স্থায়ী শহীদ মিনার নির্মাণ করতে হবে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবাকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এগুলো যুক্তফ্রন্টের ম্যানিফেস্টোতেও রাখতে হবে।

একুশের চেতনায় উজ্জীবিত ২১ দফা কর্মসূচি বানিয়ে সেটাতেই ভাসানী ও ফজলুল হকের স্বাক্ষর নেওয়া হলো।

যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হলেন সোহরাওয়ার্দী। যুগ্ম সম্পাদক আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান ও কৃষক প্রজা পার্টির কফিলউদ্দিন চৌধুরী। দপ্তর সম্পাদক হলেন কামরুদ্দীন।

রজনী বোস লেনের বাড়িতে ফিরে মুজিবের রাতের বেলা ভালো ঘুম হলো না।

তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, আতাউর রহমান খান, মানিক ভাই, আবুল মনসুর আহমদ—সবাই তাঁর চেয়ে বয়সে আর অভিজ্ঞতায় বড়। তাঁরা যখন বলছেন, যুক্তফ্রন্ট হলে দেশের ভালো হবে, নিশ্চয়ই হবে। তবে তিনি ভবিষ্যৎ ভালো দেখেন না। সালাম খান সেদিন এসে বলছিলেন, 'আর কত দিন বিরোধী দলে থাকা যায়, ক্ষমতায় না গেলে জনসাধারণের আস্থা আর আমাদের উপরে থাকবে না। যেভাবে হোক, ক্ষমতায় যেতে হবে। যুক্তফ্রন্ট করলে ক্ষমতায় যাওয়া হান্ড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হয়।'

মুজিব জবাব দিয়েছিলেন, 'নির্বাচনে হয়তো জেতা যাবে, ক্ষমতায় যাওয়াও যাবে। তবে এই ক্ষমতা বেশি দিন থাকবেও না। আর যেখানে আদর্শের মিল নাই, সেখানে ঐক্যও বেশি দিন থাকে না।'

টিক টিক টিক টিক। একটা টিকটিকি ডেকে উঠল সেই সময়।

মুজিবের তন্দ্রামতো এল। বাইরে মোরগ ডাকছে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

৩৬.

সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের চেয়ারম্যান। যুক্তফ্রন্ট পরিচিত হতে লাগল হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর দল হিসাবে। তাদের দলীয় প্রতীক নৌকা। সোহরাওয়ার্দী করাচি থেকে আসার সময়েই পকেট ভরে টাকা নিয়ে এসেছেন তিনি একটা পুরোনো জিপ কিনলেন। যুক্তফ্রন্টের অফিস হলো ৫৬ সিমসন রোড। সদরঘাটের কাছে। পাশে রিভারভিউ রেস্তোরাঁ। একটু দূরে রূপমহল সিনেমা হল। যুক্তফ্রন্টের অফিস ভবন পুরোনো, জরাজীর্ণ। দপ্তর সম্পাদক কামরুদ্দীন আহমদ। সোহরাওয়ার্দী ওই অফিসের একটা ছোট্ট কামরাকে নিজের আবাস করে তুললেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, তিনি ওই অফিসেই সময় কাটান। মুড়ি, বিস্কুট বিস্কুট তার খাদ্য, দোকানের ভাঙা কাপের নোংরা চা তার পানীয়। তাঁর গ্যাসট্রিক-আলসারের সমস্যা আছে। তা উপেক্ষা করে তিনি অমানুষিক কঠোর পরিশ্রম করছেন।

শারীরিক পরিশ্রম যত, তারও চেয়ে বেশি তাঁকে করতে হচ্ছে মাথা ঘামানো. একে তো তিনি আছেন প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়ায়. তার ওপর পুরো প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দু তিনি।

যুক্তফ্রন্ট কোনো আদর্শের ঐক্য নয়। আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী, গণতন্ত্রী দল—একেকজনের আদর্শ আর উদ্দেশ্য একেক রকম। কৃষক শ্রমিক পার্টি নতুন দল, তাতে সব মনোনয়নপ্রত্যাশীর ভিড়। মুসলিম লীগে মনোনয়ন না পেয়ে তারা আসতে লাগল ফজলুল হকের কাছে। নমিনেশন ফরম ছাপিয়ে বিক্রি করা হলো। এক লাখ টাকার বেশি এল ফরম বিক্রির টাকা থেকে।

সোহরাওয়ার্দী নিজের টাকায় কতগুলো মাইক্রোফোন কিনে আনলেন

মনোনয়ন নিয়ে যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্য বিরোধ তুঙ্গে। আওয়ামী লীগ আর কৃষক শ্রমিক পার্টির কর্মীরা বিক্ষোভ-পাল্টাবিক্ষোভ প্রদর্শন করে চলেছে।

সেই ক্ষোভ ফজলুল হক আর ভাসানীর মধ্যেও সংক্রমিত হলো। ভাসানী রাগ করে ঢাকার বাইরে চলে গেলেন। মুজিব একা কত সামলাবেন!

নেজামে ইসলামী একটা তালিকা দিয়ে বলল, এদের নমিনেশন দেওয়া যাবে না, এরা কমিউনিস্ট।

মাঝেমধ্যে ফজলুল হকের কাছ থেকে ছোট ছোট চিঠি আসে, তাঁকে অসম্মান করতেও পারা যায় না।

তবে কৃষক শ্রমিক পার্টির কফিলউদ্দিন চৌধুরী, যিনি কিনা যুক্তফ্রন্টের জয়েন্ট সেক্রেটারি, তিনি আবার ভালো প্রার্থী আওয়ামী লীগের হলেও তাঁকেই সমর্থন করছেন। আতাউর রহমান খানও জয়েন্ট সেক্রেটারি। মুজিব তৎপর। বোঝা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ থেকে বেশি মনোনয়ন দেওয়া হবে, তাতে হক সাহেবের দলের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী না থাকলে যুক্তফ্রন্ট ভেঙেই যেত। সোহরাওয়ার্দী ঘোষণা করলেন, আমি নিজে হলাম একজন গ্লোরিফায়েড ক্লার্ক, আমি কোনো মত দিব না।

শেষ মত দিবেন ফজলুল হক আর মওলানা ভাসানী। এর মধ্যে ভাসানী ঢাকার বাইরে। তাঁকে ধরে আনা হলো।

মুজিব তাঁকে বললেন, 'হুজুর, আপনি সরে থাকবেন না। কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতারা কিছু হলেই উঠে যাবে বলে, ফজলুল হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আসি, আমি কার সাথে পরামর্শ করব? আপনাকে থাকতেই হবে।'

মুজিব নিজে থেকে অনেকগুলো জেলার মনোনয়ন চূড়ান্ত করলেন কিন্তু তার নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিতে যেতে হবে গোপালগঞ্জ নির্বাচনী অফিসে।

তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন। এর ফলে তিন-চারটা জেলার মনোনয়ন তাঁর মনের মতো হলো না। আজিজ আহমেদকে চট্টগ্রামে মনোনয়ন না দিয়ে একজন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হলো। খন্দকার মুশতাককে মনোনয়ন দেওয়া হলো না, এটাও মুজিব পছন্দ করলেন না।

আতাউর রহমান খান ও ফজলুল হকও চলে গেলেন নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায়।

এবার ঢাকার অফিস সামলানোর দায়িত্ব একা সোহরাওয়ার্দীর। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। চব্বিশ ঘণ্টা তিনি মনোনয়নপ্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নিতে থাকলেন। ২৩৭ আসনের জন্য মনোনয়নপ্রার্থী ১১০০-এর বেশি। তিনি সবার সঙ্গে দেখা করলেন। সবার কথা শুনলেন। এদের প্রত্যেকের কথা শোনা

আর তাঁদের সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এটা একটা অতিমানবিক ব্যাপার। গ্লোরিফায়েড ক্লার্ক সোহরাওয়ার্দী সেই অতিমানবিক কাজ করে চলেছেন। গোসল বাদ দিলেন। মনোনয়ন-প্রার্থীদের সামনেই টোস্ট বিস্কুট আর চা খেয়ে তাঁর ভোজ সারছেন।

ভাসানী আবার ঢাকা ত্যাগ করেছেন। যাবার আগে মুজিবের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন, বলে গেছেন, 'ওই সমস্ত লোকের সাথে কি কথা কওন যায়? কাজ করা যায়? আমি যুক্তফ্রন্টের ধার ধারি না। তোমগো যুক্তফ্রন্ট আমি মানি না। আমি যামু গা।'

ঢাকা তখন গমগম করছে। মনোনয়নপ্রার্থীরা ভিড় করে আছেন, সঙ্গে এনেছেন এলাকার বাক্‌চতুর ব্যক্তিটিকে, তাঁর সঙ্গে আছে সমর্থকেরা, নিজের শক্তি দেখানোর জন্য সমর্থকদের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। আর আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর ছাত্রকর্মীরা। ছাত্রলীগই প্রধান ছাত্রশক্তি। তারা মিছিল করছে। ভিড় করে আছে যুক্তফ্রন্টের অফিসের সামনে. তারা স্লোগান দিচ্ছে মনোনয়ন ঘোষণায় কেন দেরি হচ্ছে তা জানতে চেয়ে। প্রার্থীদের সমর্থকেরাও অধৈর্য, এলাকায় গিয়ে কাজ করতে হবে না? ছাত্রলীগের ছেলেরা ঘেরাও করল এ কে ফজলুল হকের গাড়ি। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, 'আমি আর আসব না মনোনয়ন বোর্ডের কাজে।'

মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়ল, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাচ্ছে।

মুসলিম লীগাররা মহা উৎসাহে সেই খবর টেলিফোনে ছড়িয়ে দিতে লাগল সারা দেশে। মুসলিম লীগবিরোধী ছাত্রজনতা উৎকণ্ঠিত। তারা সবাই ভিড় করতে লাগল যুক্তফ্রন্ট অফিসে। অনেকেই গেল এ কে ফজলুল হকের বাড়ির সামনে।

মুসলিম লীগের কাগজ *আজাদ*। মাওলানা আকরম খাঁ এর সম্পাদক. তিনি নির্দেশ দিলেন তাঁর রিপোর্টারকে, যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের খবর নিয়ে আসো। আজ রাতে এটাই হবে প্রধান সংবাদ। কাল দেশবাসী জেনে যাবে ভাঙনের খবর।

রিপোর্টার সন্তোষ বসাক। ঝানু সাংবাদিক। তিনি যুক্তফ্রন্ট অফিসের সামনে গিয়ে সারা দিন এর-ওর সাক্ষাৎকার নিয়ে দাঁড় করিয়ে ফেললেন চমৎকার রিপোর্ট : যুক্তফ্রন্ট ভেঙে চৌচির।

কিন্তু রাতেই ফজলুল হক বিবৃতি দিলেন, যুক্তফ্রন্ট ঠিক আছে। তিনিও যুক্তফ্রন্টেই আছেন।

আজাদ-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। হালকা-পাতলা মানুষটির ব্যক্তিত্ব প্রবল।

তিনি এপিপির একটা ছোট্ট তারবার্তা পেলেন, যাতে এ কে ফজলুল হকের বিবৃতিটা এসেছে।

তাঁর সহকর্মী এসে দিয়ে গেল একতোড়া কাগজ, বললেন, সম্পাদক সাহেব এটা দিয়েছেন, এইটা আজকা লিড হবে।

সিরাজুদ্দীন হোসেন পড়লেন খবরটা, যুক্তফ্রন্ট ভেঙে চৌচির। তিনি সেই খবরটাকে নিজের ড্রয়ারে তালা-চাবি দিয়ে রেখে শেরেবাংলা ফজলুল হকের বিবৃতি ছাপলেন : যুক্তফ্রন্ট ভাঙে নাই।

পরের দিন সকাল সকাল সিরাজুদ্দীন সাহেব পত্রিকা অফিসে এসে হাজির। বারান্দায় সাইকেল রেখে তিনি অফিস কক্ষে ঢুকলেন। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। পকেট থেকে বের করলেন সিগারেটের প্যাকেট। পিয়নকে ডেকে বললেন, 'এই দেখো তো, দিয়াশলাইয়ের কাঠি কই পাওয়া যায়। যাও। দিয়াশলাই এনে দাও।'

পিয়ন একটা খাম হাতে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

খামের ওপরে তাঁর নাম লেখা।

খামটা খুললেন সিরাজুদ্দীন হোসেন। 'আপনার চাকরির আর প্রয়োজন নাই। আকরম খাঁ।'

সিরাজুদ্দীন হোসেন সিগারেটটা ঠোঁটে ধরে বেরিয়ে এলেন আজাদ অফিস থেকে। বাইরে এসে দিয়াশলাই কিনে সিগারেটটা ধরালেন। আকাশে এক রাশ ধোঁয়া ছেড়ে মনে মনে বললেন, 'উফ্, কী শান্তি, কী মুক্তি!'

শহীদ সাহেব আওয়ামী লীগ আর কৃষক শ্রমিক লীগের ২০ জন নেতা নিয়ে একটা সিলেকশন বোর্ড করলেন। তাঁরা প্রার্থীদের ভেতর থেকে যোগ্যতা বিবেচনা করে মনোনয়ন চূড়ান্ত করে ফেলতে লাগলেন। কিন্তু দিনরাত প্রার্থী আর তাদের সমর্থকেরা এসে ভিড় করছে অফিসে। তখন সোহরাওয়ার্দী পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন হামিদুল হক চৌধুরীর বাড়িতে। সেখানেই বিরতিহীন বৈঠকে সব নমিনেশনই চূড়ান্ত হয়ে গেল। দু-একটা মনোনয়ন বদলাতে হলো মওলানা ভাসানী বা এ কে ফজলুল হকের চিরকুট পেয়ে। কফিলউদ্দিন চৌধুরীর উদারতা খুব কাজে লাগল। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মনোনয়ন পেলেও তিনি তাতে আপত্তি তো করেনই নাই, বরং সমর্থন করে গেছেন। সবগুলো মনোনয়ন হলো সর্বসম্মতিক্রমে।

তাজউদ্দীন আহমদকে মনোনয়ন দেওয়া হলো তাঁর বাড়ি কাপাসিয়া এলাকা থেকে।

তাজউদ্দীনের ঢাকার ভাড়াবাসা। বাড়িটা একতলা। ভেতরে আঙিনা আছে। সেই আঙিনায় ঢাকার যুবকর্মীদের নিয়ে একটা সভা করে ফেললেন তাজউদ্দীন। খন্দকার ইলিয়াসকে সভাপতি করে একটা কর্মিশিবির গঠিত হলো সে সভায়। এঁরা ঢাকার যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীর পক্ষে প্রচার চালাবেন।

৩৭.

মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী লিলি চৌধুরী।

ঢাকা জেলখানার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দীরা একটু অধীর হয়ে আছেন। তাঁদের মুক্তির কোনো খবর আসে কি না! সামনে নির্বাচন। রাজবন্দীদের জেলে রেখে নির্বাচন হবে?

মুনীর চৌধুরী ফিরে এলেন জেলগেটের ভিজিটর রুম থেকে। সহবন্দীরা ধরলেন তাঁকে। অজিত গুহ বললেন, 'মুনীর, লিলি কী বলল?'

মুনীর চৌধুরী বললেন, 'লিলিকে আমি জিগ্যেস করলাম, লিলি, আমাদের মুক্তির ব্যাপারে কোনো খবর আছে? কিছু জানো। লিলি বলল, না, জানি না। আমি বললাম, আমরাও কিছু জানি না।'

বন্দীরা সবাই মুনীর চৌধুরীর কথা শুনে হেসে ফেললেন।

মুনীর চৌধুরী এরই মধ্যে বাংলায় এমএ পরীক্ষা দিচ্ছেন জেলখানা থেকেই। অজিত গুহ তাঁর শিক্ষক। মুনীর চৌধুরী পরীক্ষায় প্রথম পর্বে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছেন।

এখন তিনি লিখছেন একটা নাটক।

অজিত গুহ তাঁকে বললেন, 'ও মুনীর, কী করো?'

'একটা নাটক লিখছি অজিতদা। একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করতে হবে না? এই নাটক জেলখানার ভেতরে মঞ্চস্থ করা হবে। রণেশদা আমার কাছে নাটক চেয়েছেন।'

তাঁর নাটক লেখা সম্পন্ন হলো।

নাটকের পাণ্ডুলিপি মুনীর চৌধুরী দিয়ে দিলেন রণেশ দাশগুপ্তকে। তিনি এক কমিউনিস্ট বন্দী। সবাই তাঁকে ডাকে রণেশদা বলে। তিনি কারাগারের ১

নম্বর ও ২ নম্বর খাতায় যে কমিউনিস্ট বন্দীরা থাকেন, তাঁদের নিয়ে গোপনে রিহার্সাল করতে থাকেন। ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগ থেকে শুরু হলো রিহার্সাল। নাটকের নাম *কবর*। একুশের ভাষাশহীদেরা কিছুতেই কবরে যাবেন না।

জেলখানা কমিউনিস্ট বন্দীদের দিয়ে ভর্তি। ১৯৪৭ সাল থেকেই শুরু হয়েছে কমিউনিস্টবিরোধী অভিযান। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রথম থেকেই ঘোষণা করেছেন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর অবস্থানের কথা।

কমিউনিস্টদের জেলখানায় রাখা হয় খুবই মানবেতরভাবে। সন্ধ্যার পরে অনেককেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেলে। তাঁদের খাবার দেওয়া হয় কম। এঁরা এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। তখন তাঁদের শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তির ধরনের মধ্যে আছে 'সাত দিনের আট ডিগ্রি বাস'। আট ডিগ্রি মানে ওই দশ হাত বাই পাঁচ হাত সেলে দিনরাত তালা দিয়ে রাখা। ভেতরে একটা টুকরি রাখা থাকে। রাতে সেইখানে প্রাকৃতিক কাজ সারতে হবে।

কমিউনিস্টদের হয়তো বিছানাই দেওয়া হতো না। মাটিতে থাকো। মানবেতর পরিবেশের প্রতিবাদে কমিউনিস্ট বন্দীরা অনশন করেন। প্রথম ছয় দিন তাঁদের সামনে খাবার রাখা হয়। বন্দীরা তা স্পর্শ করেন না। তারপর শক্তপোক্ত কয়েদিদের ধরে আনা হয়। এরা এখন বন্দীদের নাকের ভেতরে নল ঢুকিয়ে দিয়ে জোর করে তরল খাবার পাকস্থলীতে ঢুকিয়ে দেবে। এই রকম করে খাওয়াতে গিয়ে শিবেন রায় নামে একজন শ্রমিকনেতা মারা যান। তাঁর নলটা অন্ননালিতে না ঢুকে শ্বাসনালিতে ঢুকে গিয়েছিল। তিনি চিৎকার করে তাঁর যন্ত্রণার কথা জানাচ্ছিলেন। কয়েদিরা তো আর ডাক্তার নয়। তারা বুঝতে পারেনি, জোর করে খাবার ঢুকিয়ে দিলে শ্বাস বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। কমিউনিস্ট বন্দীরা অনশন করত, বিশ দিন বাইশ দিন। আটান্ন দিন পর্যন্ত অনশন করেছেন, এমন উদাহরণও আছে। তাঁদের কেউ কেউ পাগল হয়ে যেতেন ক্ষুধার যন্ত্রণায়। মেঝেতে গড়াগড়ি খেয়েছেন, কাপড়চোপড় ছেড়ে ছুটোছুটি করেছেন, কিন্তু অনশন ভঙ্গ করতেন না কেউ।

রাজশাহীর খাপড়া ওয়ার্ডে কমিউনিস্ট বন্দীদের ওপরে গুলি চালানো হয়েছিল ১৯৫০ সালের এপ্রিলে। সাতজন নিরাপত্তা বন্দী, যাঁরা আসলে কমিউনিস্ট ছিলেন, নিহত হন। অনেকেই আহত হয়েছিলেন।

বিশে ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতের পর সব বন্দী চুপি চুপি সমবেত হলেন ১ নম্বর ও ২ নম্বর খাতা থেকে বেরিয়ে। হারিকেন, প্রদীপ আর দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা হলো। মঞ্চস্থ হলো *কবর*।

নেতা : অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা গেছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিও নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় পড়ে সব নষ্ট হয়ে গেছে।

... ...

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছ নাকি?

মূর্তি ২ : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারবো না।...

মুর্দা ফকির : কোথায় গেলি? সব ঘুমিয়ে নাকি? উঠে আয় সব মিছিল করে উঠে আয়। গুলি, গুলি হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব। কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি—গুলি হবে আজ কবর খালি করে সব উঠে আয়।

জেলখানার চার দেয়ালের ভেতরে সেই 'আয় আয়' আওয়াজ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। কোরোসিন দীপের শিখা ওঠে কেঁপে।

৩৮.

হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী তিনজনই খুবই জনপ্রিয়। তাঁরা তিনজন একত্র হয়েছেন, এই খবরেই পূর্ব বাংলাজুড়ে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিল।

ফজলুল হক ও ভাসানী দেশের দুই দিকে প্রচারাভিযানে নেমেছেন। তাঁদের জনসভায় লোকসমাগম হতে লাগল ব্যাপক।

সোহরাওয়ার্দী ডেকে বললেন কামরুদ্দীনকে, মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারে নেমেছেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া। আরও আছেন প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন। আইজি, ডিআইজি, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট কমিশনাররা তাঁদের পক্ষে কাজ করছেন। তার ওপর আবার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতিমা জিন্নাহও চলে এসেছেন পূর্ব বাংলায়। পাকিস্তান থেকে বড় বড় আলেমরা এসেছেন পাকিস্তানের সংহতি আর ইসলাম রক্ষার পবিত্র উদ্দেশ্যে। এ অবস্থায় আমাদের চুপ করে বসে থাকা উচিত নয়।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আনালেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফার খাঁ, নবাবজাদা নসরুল্লাসহ নামীদামি নেতাদের। তিনি একা ছক কষলেন, পুরো পূর্ব বাংলায় কে কোথায় কীভাবে সফর করবেন। তিনি নিজেও বের হয়ে পড়লেন জনসভা করতে। তাঁর জনসভাগুলোতেও লোক উপচে পড়তে লাগল।

৩৯.

মানিক মিয়া চিৎকার করছেন, 'আমার কোলবালিশ দুইটা কই?'

স্বামীবাগের ছোট্ট ভাড়াবাড়িতে *ইত্তেফাক* সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া থাকেন সপরিবারে। সেখানেই এম আর আখতার মুকুল বসে আছেন বৈঠকখানায়। রাত সাড়ে ১০টা। মানিক মিয়ার কণ্ঠস্বর ভেতরের ঘর থেকে ভেসে আসছে, 'আমার কোলবালিশ দুইটা কই?'

রাত ১০টায় কেনই বা মানিক মিয়া তাঁর *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর চিফ রিপোর্টার এম আর আখতার মুকুলকে বললেন, 'মুকুল মিয়া। হাতের কাম-কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলেন। আপনারে আমার লগে যাইতে হইবে।' মুকুলও দ্রুত সেরে নিলেন হাতের বাকি কাজটুকু, তারপর প্রচণ্ড শীতের রাতে পাশাপাশি রিকশায় বসে ৯ নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেসের *ইত্তেফাক* অফিস থেকে চলে এলেন স্বামীবাগে। বাইরের ঘরে বসলেন।

মানিক ভাই অন্দরে ঢুকেছেন, আর ঢোকামাত্রই চিৎকার, 'আমার কোল বালিশ দুইটা কই?'

মানিক মিয়া ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুকুলকে বললেন, 'এখনই ফোন করেন তো অফিসে, বশিরকে আইতে কন।'

মুকুল ফোন করলেন *ইত্তেফাক*-এ, 'এই বশিরকে কও এখনই মানিক ভাইয়ের বাসায় আসতে। খুব জরুরি।'

বশির *ইত্তেফাক*-এর বিখ্যাত পিয়ন।

মুকুল কিছুদিন আগেও চাকরি করতেন *সংবাদ*-এ। মুসলিম লীগ সরকার-সমর্থক পত্রিকা। বিয়ে উপলক্ষে ছুটি নিয়েছেন, গেছেন বগুড়া শহরে। বিয়ের রাতের খাদ্যতালিকায় ছিল সাদা ভাত আর খাসির মাংস,

অসচ্ছল উভয় পরিবারের জন্য সেও অনেক। পরের দিন রেজিস্ট্রি খাম এল মুকুলের নামে, তাঁর অফিস থেকে, খাম খুলে জানতে পারলেন, *সংবাদ*-এ তাঁর চাকরিটা আর নাই।

ঢাকায় ফিরে এসে সোজা গেলেন ৯ নম্বর হাটখোলায়। প্যারামাউন্ট প্রেসের ভেতরেই *ইত্তেফাক* অফিস। *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* রূপান্তরিত হচ্ছে *দৈনিক ইত্তেফাক*-এ। লোক লাগবে।

একই রুমে বসেছেন *ইত্তফাক*-এর সম্পাদক মানিক মিয়া, পাশেই সহকারী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদের বসার জায়গা। বারান্দা ঘেরা হয়েছে বেড়া দিয়ে, সেখানে সার্কুলেশন, বিজ্ঞাপন ও জেনারেল সেকশন। ও পাশে আরেক ছোট বারান্দায় জেনারেল ম্যানেজার আর প্রুফ বিভাগের বসার জন্য কোনোরকমের ব্যবস্থা।

জীবনে এই প্রথম মুকুল দেখলেন *ইত্তেফাক*-এর বিখ্যাত সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে। পরনে হাওয়াই শার্ট। হিটলারি গোঁফ। নাতিদীর্ঘ মানুষ। কিন্তু কথা বলেন চিৎকার করে। যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এম আর আখতার মুকুল, এরই মধ্যে সাংবাদিকতা করেছেন দু-তিনটা কাগজে, শুনে মানিক মিয়া রাজি হলেন মুকুলকে চাকরি দিতে।

'*সংবাদ*-এ মাসে বেতন কত পাইতেন?' মানিক মিয়া ভ্রু কুচকে বললেন।

'১৭৫।'

'১৭৫। বাম দিককার একের কথাটা ভুলিয়া যান। খালি ৭৫।'

মুকুল মাথা চুলকাতে লাগলেন। সদ্য বিয়ে করে ফিরেছেন। ১৭৫ থেকে ১ গেলে থাকে কত?

মানিক মিয়া বললেন, 'কাগজটা যদি টিকিয়া যায়, তা হইলে এইভাবে কোঅপারেটিভ বেসিসে চালানো হইবে, রাজি থাকেন তো কইয়া ফেলান। না থাকলে যান গা। আধা ঘণ্টা টাইম দিলাম। ভাবিয়া কন।'

তখন *ইত্তেফাক*-এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদের, শ্রমিক ফেডারেশন নেতা।

মুকুল *ইত্তেফাক*-এ যোগ দিলেন। এক দিন পর, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৩, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক* দৈনিক হয়ে গেল।

সামনে নির্বাচন। যুক্তফ্রন্টের একটা মুখপত্র চাই। মানিক মিয়া কোনো দলের মেম্বার নন। কাজেই *ইত্তেফাকই* হবে যুক্তফ্রন্টের জন্য উপযুক্ত কাগজ।

এর মধ্যে *দৈনিক আজাদ* থেকে চাকরি খোয়ানো সিরাজুদ্দীন হোসেনও চলে এসেছেন *ইত্তেফাক*-এ। তিনি এখন বার্তা সম্পাদক। সিরাজুদ্দীন

হোসেনের চাকুরিচ্যুতির খবর শোনামাত্রই বিচলিত হয়ে উঠলেন মুজিব। তিনি মানিক মিয়াকে অনুরোধ জানালেন সিরাজ ভাইয়ের জন্য ব্যবস্থা করতে।

এর মধ্যে *ইত্তেফাক*-এ বার্তা সম্পাদক কাদের সাহেব পদত্যাগ করেছেন।

কাজেই সিরাজুদ্দীন হোসেনের *ইত্তেফাক*-এ যোগ দিতে কোনো অসুবিধা হলো না।

তিনি কঠোর এবং নিষ্ঠাবান। কোনো রিপোর্ট মিস হয়ে গেলে রিপোর্টারদের ভীষণ বকা দেন। আবার কেউ ভালো রিপোর্ট করলে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিতেও কার্পণ্য করেন না।

এম আর আখতার মুকুল একদিন সকালবেলা গেছেন সচিবালয়ে। সেখানেই তথ্য দফতর। ভেতরে গিয়ে দেখলেন তাঁর সম্পাদক মানিক মিয়াও বসে আছেন। খানিক পরে দৈনিক *সংবাদ*-এর চিফ রিপোর্টার সৈয়দ জাফর হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। তিনি মুকুলের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলতে লাগলেন। 'কী ব্যাপার জাফর ভাই, এত অস্থির লাগতেছে ক্যান? ঘটনা কী?' মুকুল জিগ্যেস করলেন। সৈয়দ জাফর বললেন, 'আরে ধানমন্ডিতে একটা সরকারি জমি পাইছি। তিন হাজার টাকা দরকার। আগামীকাল কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট '

'ধানমন্ডিতে তো ধানের খেত। নিয়া কী করবেন? শিয়াল ডাকে।'

'এখন ডাকে। একদিন কি ডেভলপড হবে না? আর আগের টাকা তো দেওয়া আছে। পিছাই কেমনে?'

মানিক মিয়া গলা উঁচিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, আপনেরা এত ফুসুরফাসুর করতাছেন ক্যান? কী হইছে আমারে খুলিয়া কন দেহি?'

সৈয়দ জাফর বললেন, 'না, মানিক ভাই, আপনার শুনে কাজ নাই।'

মানিক মিয়া শুনবেনই। অগত্যা সৈয়দ জাফরকে খুলে বলতেই হলো তাঁর সমস্যার কথা।

মানিক মিয়া বললেন, 'কাইল একবার খোঁজ করিয়েন।'

সমস্ত দিন মুকুল কাজের তোড়ে ভেসে বেড়ালেন। রাতে অফিসে এসে রিপোর্ট লিখছেন।

রাত ১০টায় মানিক মিয়ার আদেশ, 'চলেন, আমার লগে চলেন।'

এখন মানিক মিয়ার বাসায় এসে তো কিছুই বুঝছেন না মুকুল। মানিক ভাই কোল বালিশ খোঁজেন কেন?

বশির চলে এসেছে। মানিক ভাই বললেন, 'বশির, পাশের বাড়ি যা। বিয়া পড়ানো হইয়া গেলে বরের দুই পাশ থাকিয়া বালিশ দুইটা লইয়া একেবারে সোজা আমার দারে আইবি। যা।'

মানিক মিয়া বাথরুমে গেলেন হাতমুখ ধোয়ার জন্য। তাঁর স্ত্রী এলেন খাবারদাবার নিয়ে। বললেন, 'দুইটা বালিশের জন্য এত চিল্লাচিল্লির কী হইল হীরু মিয়া বালিশ দুইটা বিয়াবাড়ির বররে ধার দিছে। আসিয়া যাইবে তো।'

বালিশ দুটো এল। মানিক মিয়া ব্লেড দিয়ে একটা বালিশের সেলাই কেটে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। টাকা বেরোল।

তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'মুকুল মিয়া, এইবার বুঝবার পারলেন তো ঘটনা। লন দুই হাজার টাকা। সৈয়দ জাফররে দিয়েন।'

ইত্তেফাক-এর পিয়ন বশির। সকালবেলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে পত্রিকা ফেরিও করে। পিয়ন কাম হকার।

একদিন সকালবেলা সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে *ইত্তেফাক* হাতে চিৎকার করতে লাগল, 'ভাসানীর কোনো খবর নাই। ভাসানীর কোনো খবর নাই '

চারদিকে এমনিতেই রব, এই বুঝি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। মওলানা ভাসানী প্রায়ই এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে মন-কষাকষি করে ঢাকার বাইরে চলে যাচ্ছেন, মানুষের মধ্যে এই নিয়ে নানান কথা।

এর মধ্যে কী খবর ছাপা হলো *ইত্তেফাক*-এ! জনতা উৎসুক। ভাসানী কি আবার ঢাকার বাইরে গেছেন গা ঢাকা দিতে? নাকি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলেন তিনি?

কাগজ কেনার পরে পাঠক ভাসানীসংক্রান্ত কোনো খবর আর খুঁজে পায় না।

'কই, ভাসানীর খবর কই?' ক্রেতা জিগ্যেস করল বশিরকে।

বশির চিৎকার করে বলতে লাগল, 'কইছিলাম কি না, ভাসানীর কোনো খবর নাই '

৪০.

শেখ মুজিবের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়াহিদুজ্জামান। পূর্ব বাংলার সেরা ধনীদের একজন। তাঁর নিজের লঞ্চ, নিজের স্পিডবোট; সাইকেল, মাইক্রোফোনের তো কোনো ইয়ত্তা নাই। তাঁর নিযুক্ত কর্মীসংখ্যাও কম নয়।

শেখ মুজিবের নির্বাচনী রসদ সাকল্যে একটা মাইক্রোফোন। দুইটা সাইকেল গোপালগঞ্জ আর কোটালীপাড়া থানা মিলে তাঁর নির্বাচনী এলাকা। রাস্তাঘাট নাই বললেই চলে। নদীনালা খালবিলে ভরা। মুজিবের নিজের পরিবারের কয়েকটা দেশি নৌকা আছে। এই নিয়েই মুজিব নেমে পড়লেন নির্বাচনী প্রচারাভিযানে।

গোপালগঞ্জের লোকেরা তাঁকে অনেক আগে থেকেই ভালোবাসে। তিনি নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ঘিরে ধরল মানুষ। নিজেদের সাইকেল নিয়ে এসে পড়ল স্বেচ্ছাসেবক কর্মিবাহিনী।

তিনি কয়েকটা জনসভায় বক্তৃতা করলেন। মানুষের যে সাড়া পেলেন, তাতে বুঝলেন, ওয়াহিদুজ্জামান শোচনীয়ভাবে হারতে যাচ্ছেন।

মুজিব যেখানেই যাচ্ছেন, লোকজন শুধু তাঁকে ভোট দেবার অঙ্গীকার প্রকাশ্যে ব্যক্ত করছে, তা-ই নয়; তারা তাঁকে জোর করে বসিয়ে সামনে পানদানিতে রাখছে পান আর কিছু টাকা, নজরানা। নিতেই হবে। এ হলো শেখ মুজিবের জন্য মানুষের উপহার। তারা তাঁকে নির্বাচনী খরচ জোগাতে চাইছে। ওয়াহিদুজ্জামানের টাকা বেশি। মুজিবের টাকা নাই। টাকার অভাবে মুজিব যেন হেরে না যান। গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ নিজের পকেটের টাকা বের করে পানদানিতে রেখে মুজিবকে বাধ্য করছে তা গ্রহণ করতে

একজন বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন পথের ধারে। মুজিব ছুটছেন এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ি, পথে সবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। গ্রামের মেয়েরা তাঁকে বিশেষভাবে দেখতে চায়, গ্রামের মানুষ বলে, 'অন্দরে চলেন, মহিলারা আপনেরে একটু দেখতি চায়, বাবা।'

এর মধ্যে একজন বৃদ্ধার ডাক, 'বাবা, মুজিবর, বাবা মুজিবর, একটু শুইনে যাও বাবা।' পরনে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, সমস্ত শরীর মলিন, মুখে বলিরেখা, চুল যেন পাটের আঁশ, চোখ কোটরাগত, চোখের নিচে শুকনো অশ্রু আর ধূলিবালি মিলে পিঁচুটির দলা। তিনি তার শীর্ণ হাত তুলে মুজিবকে ডাকছেন, 'বাবা, মুজিবর।'

'কী মা?'

'একটু ঘরের ভেতরে এসো, বাবা। ভাঙা ঘর। বুড়ি মানুষ। একলা থাকি, বাবা। তোমারে যে বইসতে দিব বাবা, আমার তো সাধ্য নেই। তবু তুমি যদি একটু আসো।'

মুজিব তার পর্ণকুটিরে ঢুকলেন। রোদে রোদে ঘুরছেন, ঘরের ভেতরটার ছায়া তার শরীর একটুখানি জুড়িয়ে দিল।

বৃদ্ধা বললেন, 'কী দিই তোমারে, কী দিই সোনামুখে, একটুখানি দুধ রাখছি বাবা। বসে একটু খেয়ে নাও।'

মুজিব বসে দুধটুকু পান করলেন।

বৃদ্ধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছেন। তারপর আঁচলের গিঁট খুলে একটা সিকি বের করে দিয়ে বললেন, 'বাবা, আমার সাধ্য থাকলে আরও কিছু দিতাম। এই আমার সব।'

মুজিব কয়েকটা টাকা পকেট থেকে বের করে বৃদ্ধার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'মা, আপনি দোয়া করবেন। আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আমি সারা জীবন মনে রাখব।' মুজিবের চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রুপাত হতে লাগল।

বৃদ্ধা মুজিবের টাকা তো নিলেনই না, তবে তাঁর দেওয়া সিকিটা তাঁকে গ্রহণ করতে হলো।

মুজিব মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'যে মানুষ আমারে এত ভালোবাসে, সেই মানুষেরে ধোঁকা আমি দিতে পারব না।'

এইভাবে এক টাকা, আট আনা করে শেখ মুজিবের পকেটে জনসাধারণের দেওয়া পাঁচ হাজার টাকা জমে গেল।

এত ভালোবাসা, এত সাড়া! তবু মুজিবের মনে শঙ্কা, জিতবেন তো!

এর কারণ, মুজিবের নিজের ইউনিয়নের বিখ্যাত আলেম ও সুবক্তা শামসুল হক সম্প্রতি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন। স্পিডবোটে চড়ে তিনি গ্রামের পর গ্রামে যাচ্ছেন। আর ফতোয়া দিচ্ছেন, নৌকায় ভোট দিলে ইসলাম শেষ হয়ে যাবে, ধর্ম থাকবে না। শামসুল হক সাহেবকে শেখ মুজিব নিজেই খুব শ্রদ্ধা করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর খুবই ভালো সম্পর্ক। তিনি যখন ফতোয়া দিচ্ছেন, তখন হতাশ না হয়ে উপায় কী? শুধু শামসুল হক সাহেব নন, শর্ষিনার পীর, বরগুনার পীর, শিবপুরের পীর, রহমতপুরের শাহ সাহেব—সবাইকেই জড়ো করতে পেরেছেন দেশের সবচেয়ে বড়লোকদের একজন ওয়াহিদুজ্জামান। পীর সাহেবদের পেছনে তাঁদের তালেবে এলেমরা ছুটছে। কারও কোনো বিশ্রাম নাই। শেখ মুজিবকে হারাতেই হবে। একদিকে টাকা, একদিকে পীরদের অবিরাম ফতোয়া। যদি ইসলাম বাঁচাতে চাও, মুসলিম লীগকে ভোট দাও। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন সরকারি কর্মচারীরা। ঢাকা থেকে এলেন পুলিশের প্রধান, পরিষ্কারভাবে কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, মুসলিম লীগকে সমর্থন করুন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটই শুধু বললেন, আমি সরকারি কর্মচারী, আমি তো প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে পারব না। তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো। তাঁর বদলে যে জেলা ম্যাজিস্টেট এলেন, তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন মুসলিম লীগের পক্ষে। শুধু কি

তাই, তিনি ভোটকেন্দ্র এমনভাবে স্থানান্তর করতে লাগলেন, যাতে ওয়াহিদুজ্জামানের সুবিধা হয়।

ঢাকায় সোহরাওয়ার্দীর কাছে খবর গেল। মুজিবের বিরুদ্ধে সরকার, পীর সাহেবেরা সবাই মিলে একজোট হয়ে লেগে পড়েছে। তিনি চলে এলেন গোপালগঞ্জে। দুটো জনসভায় ভাষণ দিলেন। মওলানা ভাসানীও এলেন একটা সভা করলেন।

এবার সরকার মুজিবের কর্মী ও নেতাদের গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। এক ইউনিয়নেই আটক করা হলো ৪০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে।

এদিকে শুধু নিজের আসনের দিকে দেখলে হবে না, আশপাশের জেলাতেও তো যেতে হবে অন্য প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারাভিযানে অংশ নিতে। মুজিব তাও গেলেন।

৪১.

তাজউদ্দীন আহমদ ভোট নিয়ে এত চিন্তিত নন। তাঁর বয়স কেবল ২৯। এর মধ্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। আবার ভর্তি হয়েছেন আইন ক্লাসে। ভোটের প্রচারাভিযানে বের হন, বাজারে বাজারে যান, হাটে যান, লোকের সঙ্গে কথা বলেন, যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিতে আহ্বান জানান মানুষকে। আবার ট্রেনে চড়ে ঢাকা চলে আসেন, আইন বিভাগের ক্লাসে যোগ দেন। সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমাও দেখেন।

তিনি বড় নেতা নন। অন্যের নির্বাচনী এলাকায় গিয়ে তাঁকে বক্তৃতা করতে হয় না। কিন্তু তিনি জানেন, নিজের এলাকায় তিনি জনপ্রিয়। তিনি এই ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত তাঁর বাড়িতে গেছেন, এলাকার প্রতিটা সমস্যায় লোকে তাঁকে পাশে পেয়েছে। এর ওপরে আছে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী হাওয়া।

কিন্তু একটা দুশ্চিন্তা আছে। তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পুরোনো বড় নেতা ফকির আবদুল মান্নান।

মওলানা ভাসানী চললেন তাজউদ্দীনের নির্বাচনী এলাকায়।

রাজেন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের পর ঘন গজারিবন। সেই বনের ভেতর দিয়ে একচিলতে একটা কাঁচা রাস্তা। সাইকেল নিয়ে পথ চলা সহজ। কিন্তু ভাসানী যাবেন কীভাবে? তাজউদ্দীনের নিকটাত্মীয়দের হাতি আছে। চাইলেই হাতি তিনি পেয়ে যান। এর আগেও তিনি একবার দুটো হাতিতে চড়ে শিকারে বেরিয়েছিলেন ঢাকা থেকে আসা বন্ধু করিম সাহেবকে নিয়ে।

মওলানা ভাসানী কাপাসিয়া চলেছেন হাতির পিঠে চড়ে।

প্রতিপক্ষ ভয় পেয়ে গেল। মওলানা ভাসানী যদি তাজউদ্দীনের পক্ষে জনসভায় ভাষণ দেন, তাহলে তো পরাজয় নিশ্চিত।

যে-করেই হোক, মওলানা ভাসানীর আগমন প্রতিহত করতে হবে।

কী করে করা যায়?

হাতি খুব ভয় পায় আগুনকে।

মওলানা ভাসানী চলেছেন গজেন্দ্রগমনে। হাতির পিঠে তাঁর সঙ্গে বসে আছেন তাজউদ্দীন। আর আছে মাহুত। তার হাতে অঙ্কুশ।

তাজউদ্দীন বললেন, হুজুর, যত মৌলভি সাহেব, পীর সাহেব, খারিজি মাদ্রাসার ছাত্র, সবাই তো একজোট, সবার তো এক রা। যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিলে বিবি তালাক হয়ে যাবে। যুক্তফ্রন্ট ইন্ডিয়ার দালাল। নৌকায় ভোট দিলে ইসলাম খতম হয়ে যাবে।

মওলানা ভাসানী বললেন, 'কইতে দেও। কইতে দেও। খালি ভোটের দিনটা আইতে দেও। ভোট হোক। ভোট গোনা হোক। দেইখো কী হয়। মুসলিম লীগ টাকাপয়সা ছিটাইতেছে। মানষে দুই চারটা টাকা পাইয়া দুই চার কথা কইতেছে। ভোটের দিন হেরাও মুসলিম লীগেরে ভোট দিতে পারব না।'

তাঁরা ঘন বনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন। বসন্তের বাতাস বইছে।

হঠাৎ হাতি চঞ্চল। মাহুত আতঙ্কিত। বনের মধ্যে আগুন দিল কে?

সূর্যনারায়ণপুর জায়গাটার নাম। আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উঠছে পথের দুধারের গাছে। আর তো হাতি যাবে না। না গেলে উপায়টাই বা কী? মওলানা ভাসানীর নাম করে মাইকিং করা হয়েছে। আজকের জনসভায় তিনিই প্রধান বক্তা। ভাসানীর নাম শুনলেই হাজার হাজার মানুষ জড়ো হবে।

তাজউদ্দীন বললেন, 'আগুন লাগা জায়গাটা কোনোমতে পার করে ফেলো।'

মাহুত হাতিকে সামনে এগিয়ে নিতে চাইল। হাতি কিছুতেই আগুনের মধ্যে যাবে না। সে দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগল। মাহুতের কোনো নিয়ন্ত্রণই নাই হাতির ওপরে।

মওলানা ভাসানী ও তাজউদ্দীন ছিটকে পড়ে গেলেন হাতির পিঠ থেকে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, দুজনেই অক্ষত রইলেন পুরোপুরি।

হাতি ছেড়ে দিয়ে দুজনে হাঁটাপথে রওনা হলেন। সাইকেল নিয়ে ছুটল কর্মীরা। মোষের গাড়ি আনতে। ততক্ষণে আগুন নিভে গেছে।

মওলানা ভাসানী আবার হাতির পিঠে আরোহণ করলেন। হাতিতে চড়েই তারা হাজির হলেন জনসভাস্থলে।

সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল, মুসলিম লীগাররা মওলানা ভাসানী ও তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

জনতা স্লোগান ধরল, তোমার আমার মার্কা, নৌকা নৌকা।

৪২.

সোহরাওয়ার্দীকে যেতে হলো মোশতাককে দোয়া করার জন্য। তাও মোশতাকের নির্বাচনী এলাকার পাশে এলাকায়।

সোহরাওয়ার্দী একটা চা-চক্রে দাওয়াত করেছেন দাউদকান্দির নেতা-মাতব্বরদের। সবাই এসেছেন সেই চা-চক্রে। খন্দকার মোশতাকও উপস্থিত। সোহরাওয়ার্দী সবার খোঁজখবর নিচ্ছেন। সবার হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছেন। তাঁকে কেন এখানে আসতে হলো, সে কথা মনে করে আপন মনে হাসছেন। মোশতাকও ভাবছেন, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে সেদিন মুজিবকে ধরেছিলাম।

ঘটনা এই : মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে ঢাকায় ফিরে এসেছেন মুজিব। এসে দেখলেন, আওয়ামী লীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা মনোনয়ন পান নাই। চট্টগ্রামের এম এ আজিজ পান নাই, খোন্দকার মোশতাকের মতো জেলখাটা কর্মীও নমিনেশন পান নাই।

মোশতাক ধরে বসলেন মুজিবকে। 'মুজিব, তুমি থাকলা না। আমি নমিনেশন পাইলাম না। কিন্তু ইলেকশন করবই। স্বতন্ত্র থেকে।'

মুজিব বললেন, 'নৌকা মার্কার যে জোয়ার এসে গেছে, তাতে কি আব স্বতন্ত্র থেকে করলে জিতবা?'

মোশতাক বললেন, 'তোমার লিডাররে বলো আমার এলাকায় গিয়া আমারে সাপোর্ট দিতে।'

মুজিব বললেন, 'সেটার তো নিয়ম নাই। আমরা অঙ্গীকার করেছি, কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষ নিবে না। তাদের জন্য ভোট চাবে না।'

মোশতাক বললেন, 'তবু তুমি নিয়া চলো আমাকে লিডারের কাছে। তুমি বললে তিনি না করতে পারবেন না।'

মুজিব গেলেন সোহরাওয়ার্দীর কাছে, সঙ্গে খোন্দকার মোশতাক, গিয়েই মুজিব উচ্চ স্বরে বলতে লাগলেন, 'লিডার, এটা আপনারা কী করলেন! মোশতাক কী করে নমিনেশন পায় না। সে আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিল। জেল থেকে কেবল বার হয়েছে।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'এখন তো আর বলে কোনো উপায় নাই। নমিনেশন পেপার তো সাবমিট হয়ে গেছে।'

মুজিব বললেন, 'ও তো স্বতন্ত্র হিসাবে নমিনেশন সাবমিট করেছে।'

মোশতাক সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বললেন, 'স্যার, আপনাকে আমার এলাকায় যেতে হবে। আপনার পাশে দাঁড়ায়া থাকব। আপনি পরিচয় করায়া দিবেন।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তা করতে হামি পারব না। তবে যেটা পারব, তোমার পাশের কন্সটিটুয়েন্সিতে যাব।'

'আচ্ছা, আপনি চলেন। আপনার পাশে যদি একটু দাঁড়াতে পারি, তাহলেই হবে।'

সোহরাওয়ার্দী গেলেন মোশতাকের আসনের পাশের এলাকায়।

সেখানে দাউদকান্দি এলাকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দাওয়াত করলেন চা-চক্রে। সেখানেই তিনি মোশতাককে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ওকে আমরা নমিনেশন দিতে পারি নাই। কৃষক শ্রমিক পার্টিকে দিতে হলো। ওর জন্য আমার দোয়া আছে। আপনারাও দোয়া করবেন।'

৪৩.

নির্বাচন হলো কয়েক দিন ধরে। ১৯৫৪-এর বসন্ত যেন মধুর দক্ষিণা বাতাস বইয়ে দিতে লাগল পূর্ব বাংলায়।

গ্র্যাজুয়েটস স্কুল, ঢাকা। সন্ধ্যা নামছে আকাশে আবির ছড়িয়ে। উজ্জ্বলতা চারদিকে। কনে-দেখা হলদে আলোয় ঝলমল করছে সব। সোহরাওয়ার্দী দাঁড়িয়ে আছেন একটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তাঁর গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পরনে সাদা পায়জামা। তাঁকে খুব ক্লান্ত কিন্তু পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে। কমলা রোদ এসে পড়েছে তাঁর চুলে। তাঁকে দেখাচ্ছে একটা পিতলের ভাস্কর্যের মতো।

সাংবাদিকেরা তাঁকে এটা-ওটা প্রশ্ন করতে লাগল।

তিনি বললেন, 'হামার মনে হয় মুসলিম লীগ অ্যাসেম্বলিতে নিজেদের গ্রুপ বানাতে পারবে না। গ্রুপ বানাবার জন্য দরকার হয় ১০ জন মেম্বার। আমার হিসাব বলে, ওরা ৯টার বেশি সিট পাবে না।'

ফল বেরোতে সময় লাগল। ৯-১০ মার্চ ভোট হয়েছে, ফল বেরোল ১৮ মার্চ। ২৩৭টা মুসলিম আসন। দেখা গেল, মুসলিম লীগ পেয়েছে নয়টি আসন। সোহরাওয়ার্দীর হিসাব কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেল।

যুক্তফ্রন্ট পেল ২২৮টি।

দৈনিক ইত্তেফাক অফিস। সবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে। অফিসের সামনে জনতার বিশাল ভিড়। তারা উদ্‌গ্রীব, উৎফুল্ল, উৎকর্ণ। সবার মধ্যে একটা বিষয়ে কৌতূহল। প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিনের কী খবর? তিনি কি জিতেছেন, নাকি হেরে গেছেন?

একটা ফোন এল *ইত্তেফাক* অফিসে। ফোন করেছেন ময়মনসিংহের টেলিফোন অপারেটর নিজেই। 'শুনলাম, ময়মনসিংহের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফুন করছিলেন চিফ সেক্রেটারি ইসহাক সাহেবের কাছে, নুরুল আমিন হাইরা গেছে।'

এই খবর একজন জানিয়ে দিল *ইত্তেফাক* অফিসের সামনে সমবেত জনতাকে। অমনি উল্লাসে ফেটে পড়ল সমবেত মানুষগুলো।

ভিড় বাড়তেই লাগল। *ইত্তেফাক* অফিসের অদূরেই ফজলুল হকের বাড়ি। সেই বাড়ির সামনেও ভিড়।

মধ্যরাতে একটা ছাত্র মিছিল বেরোল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে। খড়ম মিছিল। ছাত্রেরা দুই হাতে দুটো খড়ম নিয়ে বাজাতে বাজাতে শহর প্রদক্ষিণ করল। মুখে তাদের জারি গান।

ইত্তেফাক-এর বার্তা সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন মিটি মিটি হাসছেন। গুনগুন করে গান গাইছেন। তাঁকে এত উল্লসিত দেখতে রিপোর্টারদেরও খুব ভালো লাগছে।

এই সময় নুরুল আমিনের পরাজয়ের খবরটি লিখে একজন রিপোর্টার তাঁর সামনে রাখল।

রিপোর্টার শিরোনাম দিয়েছেন : নুরুল আমিন ধরাশায়ী।

সিরাজুদ্দীন হোসেন রিপোর্টটা হাতে পেয়ে চোখ রাখতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন

সিরাজ ভাই কি নুরুল আমিনের পরাজয়ে মন খারাপ করলেন? তা কেন হবে? তিনি তো একটু আগেও গুনগুন করে গান গাইছিলেন।

সিরাজুদ্দীন হোসেন হেডলাইনটা কেটে নতুন একটা হেডলাইন দিলেন।

'পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আকাশ থেকে অশুভ নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি।' হেডলাইনটা দিয়ে তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

পরদিন এটা *ইত্তেফাক*-এ ব্যানার হেডলাইন হিসেবে প্রকাশিত হলো

প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন পরাজিত হলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেক নেওয়াজের কাছে।

কাপাসিয়ার ভোট গণনা শেষ হয়েছে রাত আটটায়। তাজউদ্দীন আহমদ ভোট গণনা দেখতে গিয়েছিলেন তিনটার দিকে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অফিসে। নিজের ভোট গোনা শেষ হওয়ার আগেই বের হয়ে এসেছেন। আগের দিন বিকালে ক্লাস করেছেন। সেকেন্ড শো সিনেমা দেখেছেন লায়ন হলে, ছবির নাম *শিবশক্তি*। বাড়ি ফিরেছেন রাত সাড়ে ১২টার পরে। আজকে রাত আটটায় যখন ফল ঘোষিত হলো, দেখা গেল, তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। তিনি পেয়েছেন ১৯ হাজার ৩৯ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগের সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নান পেয়েছেন ৫ হাজার ৯৭২ ভোট, তখন তাকে ছাত্রযুব কর্মীরা টেনে নিয়ে গেল মিছিলে। বাবুবাজার ব্রিজ পর্যন্ত মিছিল গেল, ফিরে এল সিমসন রোডে যুক্তফ্রন্ট অফিসে।

সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, কাদের সর্দার, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, কামরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে দেখা করলেন তাজউদ্দীন।

তারপর আবার মিছিল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলল নবাবপুর সড়ক ধরে ফজলুল হক হলে, সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল হয়ে এসএম হলে। রাত সাড়ে ১২টায় শেষ হলো মিছিল।

শেখ মুজিব ঢাকা ফিরছেন। নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত স্টিমার। তারপর ট্রেন।

ট্রেন চলছে। ঝিকঝিক ঝিকঝিক। স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেন। শেখ মুজিবের সঙ্গে কয়েকজন কর্মী। তাঁর মনে প্রশ্ন, ক্ষমতাসীন দলের এত বড় ভরাডুবি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও কখনো হয়েছে কি না! বাঙালিরা রাজনীতির জ্ঞান রাখে। তারা রাজনীতিসচেতন। এবারের ভোটেও তা-ই প্রমাণিত হয়ে

গেল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান ইস্যুতেও বাঙালি একই রকমভাবে রাজনীতি-সচেতনতার প্রমাণ রাখতে পেরেছিল।

ইসলাম শেষ হয়ে গেল, আওয়ামী লীগ কাফেরের দল, মুসলিম লীগ হলো মসজিদ, ইমাম বদলানো যায়, মসজিদ ভাঙা যায় না, যারা মুসলিম লীগ ভেঙেছে তারা কাফের—কত কী বলল এই মুসলিম লীগাররা।

বাংলার মানুষ ভোট দেবার সময় এদের কোনো কথাকেই পাত্তা দিল না কত বাঘা বাঘা মুসলিম লীগ নেতা পরাজিত হয়েছেন।

আবার নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগ চেষ্টা করেছে বাঙালি-অবাঙালি বিভাজন সৃষ্টি করতে। চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজের কলে অবাঙালি কর্মকর্তাদের বলা হলো, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে অবাঙালিদের থাকতে দেওয়া হবে না বাংলায়।

মুজিব ভাবছেন, তাদের আওয়ামী লীগের বহু নেতা-কর্মী আছে, যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তারা জানে, সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। তারা জানে, ধনতন্ত্র মানেই শোষণ। আর যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা কোনো দিন কোনো রকমের সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাস করে না। তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান। শোষক শ্রেণীকে তারা পছন্দ করে না।

রেনুর কথাও মনে পড়ে। রেনু সন্তানসম্ভবা। এবার আসার সময় কেমন ছলছল চোখে তাকাচ্ছিল। মুজিবের ব্যস্ততা আরও বেড়ে যাচ্ছে, সেটা তিনি অনুভব করেছেন। হাসিনা আর কামাল তো নৌকা নৌকা করে বাড়িময় দৌড়াদৌড়ি করছিল। আব্বা খুব খুশি হয়েছেন। তিনি ইলেকশনের ফল শুনে মুজিবকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আর ছাড়তেই চাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখে ছিল জল।

তিনি বলেছিলেন, 'আমি চেয়েছিলাম, তুমি উকিল হও। আইন পড়ো। এবার তুমি আইন পরিষদের মেম্বার হলে। আইন তোমরাই রচনা করবে। এটা কম কথা নয়।'

ফুলবাড়িয়া স্টেশনে ট্রেন থামল। শেখ মুজিব নামলেন। বিপুলসংখ্যক ছাত্রজনতা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিল আর তাঁর সঙ্গে চলল মিছিল করতে করতে। নবাবপুর রোডের আওয়ামী লীগ অফিসে গেলেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সেখানে, তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোমাকে নিয়েই চিন্তিত ছিলাম'—সোহরাওয়ার্দী বললেন। মুজিব হেসে

বললেন, 'আপনি কিন্তু আমার বাড়িতে বলে এসেছিলেন তোমার জয় সুনিশ্চিত।'

শেখ মুজিবের কাছে হেরে গেছেন ওয়াহিদুজ্জামান।

আর সোহরাওয়ার্দীর দোয়ার বদৌলতে জয়লাভ করলেন খন্দকার মোশতাক।

তার প্রতিদানও তিনি দিলেন। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগকে সমর্থন না দিয়ে সমর্থন দিতে লাগলেন কৃষক শ্রমিক পার্টিকে (কেএসপি)। কেএসপি তাঁকে চিফ হুইপ বানিয়ে দিল।

৪৪.

সোহরাওয়ার্দী মুজিবকে আলাদা করে ডেকে নিয়েছেন। বললেন, 'হামার কথা মন দিয়ে শোনো।'

মুজিব বললেন, 'লিডার, আমি কখনোই আপনার অবাধ্য হই নাই। আপনি বলেন।'

'তোমাকে হামি পার্লামেন্টে ডেপুটি লিডার বানাব। তুমি মন্ত্রী হতে চাবা না।'

'আমি তো মন্ত্রী হতে চাই না, স্যার।'

'তুমি বয়সে ছোট। পার্লামেন্টে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। এ কে ফজলুল হক লিডার হবেন। তুমি তাঁর সঙ্গে থেকে সব শিখবা। তাঁকে তোমার লাইনে রাখবা। আওয়ামী লীগের যে আদর্শ, যে কমিটমেন্ট সেইটা থেকে যেন হক সাহেব সরে যেতে না পারেন, সেইটা তুমি দেখবা।'

'ঠিক আছে স্যার। তবে আওয়ামী লীগ তো পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। আমাদের আসন ১৪৩, কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮। মাইনরিটি দল থেকে কী করে লিডার হবে, এইটা আওয়ামী লীগের কর্মীদের কী করে বোঝাব?'

'না না। সবাই বুঝবে। এ কে ফজলুল হক যে লিডার, এইটা পুরা দেশ জানে আর মানে। ৮১ বছর বয়সী একটা মানুষ। তাঁকে মানতে হবে।'

'জি স্যার। আপনি যা বলবেন। আমি আসলে মন্ত্রী হতে চাই না। অনেক

যোগ্য প্রার্থী আছে। তাদের মধ্য থেকে দেখেশুনে মন্ত্রী করেন। আমি পার্টির কাজ করতে চাই।'

আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের সভা বসেছে। সোহরাওয়ার্দী আর ভাসানী দুজনেই উপস্থিত।

সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন, 'দেশের মানুষ হক সাহেবকে লিডার মেনে ভোট দিয়েছে। আপনারাও ভোট চেয়েছেন, তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন, এই কথা বলে। এখন আর কোনো রকমের বেইমানি করা যাবে না। তাঁকেই লিডার নির্বাচন করা হবে।'

রংপুরের খয়রাত হোসেন বললেন, 'বিনা শর্তে হক সাহেবকে লিডার করলে তিনি কী করবেন না করবেন তার কোনো ঠিকঠিকানা নাই। অতীতে এই ধরনের উল্টাপাল্টা কাজ তিনি অনেক করেছেন। আমরা এক কাজ করি। লিডার নির্বাচনের আগেই হক সাহেবের মন্ত্রিসভায় কে কে থাকবেন, সেটার তালিকা ও পোর্টফলিও ঠিক করে হক সাহেবের স্বাক্ষর নিয়ে রাখি। গভর্নরের কাছে সেই চিঠি যাবে। তারপর আমরা হক সাহেবকেই নির্বাচিত করি।'

সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'না না, এটা হবে খুবই ক্ষুদ্র মনের কাজ। অতীতে তিনি যা-ই করে থাকুন না কেন, এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি ভুল করবেন না।'

সোহরাওয়ার্দীর কথায় অনেকেই আশ্বস্ত হলো, যারা হলো না, তারা কথা বাড়াতে চাইল, সোহরাওয়ার্দী ধমক দিয়ে তাদের বসিয়ে দিলেন।

তারপর বসল যুক্তফ্রন্টের সভা।

মওলানা ভাসানী সভাপতিত্ব করলেন।

সর্বসম্মতিক্রমে ফজলুল হক লিডার নির্বাচিত হলেন। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখলেন সোহরাওয়ার্দী।

মওলানা ভাসানী মোনাজাত পরিচালনা করলেন।

মন্ত্রী কারা হবেন, তা নির্ধারণের জন্য ফজলুল হকের বাড়িতে বসলেন তিন নেতা—হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী।

সেই সভাতেই মনোমালিন্য দেখা দিল। প্রথমেই ফজলুল হক বললেন, 'আমার একটা কথা আছে। আপনাদের আওয়ামী লীগ থেকে যাকেই মন্ত্রী করতে চান না কেন, শেখ মুজিব যেন মন্ত্রী না হয়। আমি তাকে মন্ত্রী করব না।'

শেখ মুজিব মন্ত্রী হতে চান না।

কিন্তু আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, তারা কাকে মন্ত্রী করবে না করবে, সেটা তাদের ব্যাপার। এটা নিয়ে ফজলুল হক কথা বলতে পারেন না। ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী বললেন, 'তাহলে আমাদেরও একটা কথা আছে আপনি আপনার ভাগনে নান্না মিয়াকে মন্ত্রী করতে পারবেন না।'

'এটা তো আপনারা বলতে পারেন না,' ফজলুল হক বললেন।

ঘোরতর অচলাবস্থা দেখা দিল। আর শেখ মুজিবের পক্ষে রাস্তায়, ফজলুল হকের বাড়ির সামনে ছাত্রজনতা মিছিল করতে লাগল।

যুক্তফ্রন্ট আবার বুঝি ভেঙে যায়!

ফজলুল হকের প্রস্তাব : 'মন্ত্রী হবেন পাঁচজন। আওয়ামী লীগের দুইজন, আতাউর রহমান খান এবং সালাম খান। পরে আরও পাঁচজনকে নেওয়া হবে।'

আওয়ামী লীগ বলল, 'হয় পুরো মন্ত্রিসভা করেন, তা না হলে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী দরকার নাই। আপনি বাকি তিনজনকে নিয়ে শপথ নেন।'

তা-ই হলো।

কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া) আর নেজামে ইসলামীর আশরাফউদ্দিন চৌধুরী শপথ নিলেন মন্ত্রিত্বের।

গভর্নর হাউসের সামনে তখন মিছিল হচ্ছে, 'স্বজনপ্রীতি চলবে না', 'কোটারি করা চলবে না'।

মিছিলের সামনে পড়লেন ফজলুল হক। তিনি গভর্নর ভবন থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে তিনি মুখ বের করে বললেন, 'কিসের স্বজনপ্রীতি?'

'আপনি নান্না মিয়াকে মন্ত্রী বানিয়েছেন?'

'নান্না মিয়া কি এমএলএ হয় নাই?'

'তা হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো আপনার ভাগনে।'

'আমার ভাগনে বলে কি সে পচে গেছে?'

বিক্ষোভকারী ছাত্ররা এই প্রশ্নের উত্তর হঠাৎ করে খুঁজে পেল না। ফজলুল হক তাঁর বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

সোহরাওয়ার্দী চলে গেলেন করাচি।

সেখানে গিয়ে এত দিনের পরিশ্রম আর অনিয়মের মাসুল তাকে গুনতে হলো। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

৪৫.

মওলানা ভাসানী আর শেখ মুজিব টাঙ্গাইলে কর্মী সম্মেলনে হাজির হয়েছেন। কর্মীরা বক্তৃতা করছেন। এরপর নেতাদের পালা। ভাসানী ও মুজিব দুজনেই মঞ্চে বসা। ভিড়ে গিজগিজ করছে চারপাশ। চৈত্র মাস। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া সহনীয়।

গরম যা পড়েছে, তা মানুষের ভিড়ের গরম।

এই সময় টাঙ্গাইলের এসডিও এসে হাজির। শেখ মুজিবের কাছে এসে বললেন, 'আমার কাছে রেডিওগ্রাম এসেছে, প্রধানমন্ত্রী আপনাকে ঢাকা যেতে বলেছেন।'

মুজিব ভাসানীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। এখন কেন ঢাকা যেতে বলবে?

ভাসানী বললেন, 'তোমারে মন্ত্রী হইতে কইব নিশ্চয়ই।'

মুজিব বললেন, 'কেন? এখন কেন আমাকে মন্ত্রী হতে বলে? বিপদ দেখেছে?'

মুজিবের এই কথা বলার একটা মানে আছে। ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেই ফজলুল হক সপারিষদ চললেন করাচি। মুসলিম লীগ নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'আপনাকে তো আমরা পছন্দ করি। আপনি যাতে ক্ষমতায় থাকতে পারেন আমরা দেখব। কিন্তু আমাদের বড় অপছন্দ ওই আওয়ামী লীগ। আপনি আওয়ামী লীগকে দূরে সরিয়ে রাখেন।'

এরপর ফেরার পথে ফজলুল হক গেলেন কলকাতা। সেখানে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি বললেন আবেগপূর্ণ কথা। বললেন, 'এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, দুই বাংলার জনগণকে একটা মৌলিক সত্য উপলব্ধি করতে হবে, সুখে বসবাস করতে চাইলে তাদের অবশ্যই পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। রাজনীতিবিদেরা ভূখণ্ডকে ভাগ করেছেন বটে, কিন্তু সাধারণ জনতাকে এটা নিশ্চিত করতে হবে, যেন প্রতিটা মানুষ শান্তিতে থাকে। ইতিহাসে প্রমাণিত হয়েছে, ভাষা হলো ঐক্যের সবচেয়ে বড় নিয়ামক। দুই বাংলার জনগণের ভাষা এক, তাদের রাজনৈতিক বিভাজন ভুলে যেতে হবে, মনে করতে হবে যে তারা এক।'

এমন কোনো কথা ফজলুল হক বলেননি যেটা খুব নতুন কিছু, যেটা পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি।

কিন্তু মোহাম্মদ আলী বগুড়া, গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ এটাকেই একটা সুযোগ হিসাবে নিতে চেষ্টা করছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু হয়েছে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে। তিনি আসলে ষড়যন্ত্র করছেন পূর্ব বাংলাকে আলাদা করে নিয়ে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার, এই সব কথাও বলাবলি হচ্ছে।

আওয়ামী লীগ অবশ্য পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে, তারা হক মন্ত্রিসভাকে পূর্ণ সমর্থন দেবে।

হক সাহেবও বিপদ বুঝে এবার মন্ত্রিসভা বাড়ানোর প্রস্তাব করলেন আওয়ামী লীগকে ডাকলেন আলোচনা করে সবকিছু ঠিকঠাক করতে।

ভাসানী বললেন মুজিবকে, 'তুমি ঢাকা যাও। দরকার হইলে মন্ত্রিসভায় যোগ দেও। তবে সবকিছুর আগে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের লগে একটু পরামর্শ কইরা লইয়ো।'

মুজিব ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলেন।

সন্ধ্যার দিকে পৌঁছালেন রজনী বোস লেনের বাসায়।

দেখলেন, বাসায় রেনু এসেছে। সঙ্গে হাসু, কামাল তো আছেই, আর তাঁর কোলে আছে একটা ফুটফুটে ছোট্ট বাচ্চা।

মুজিবের একটা ছেলে হয়েছে।

রেনু বললেন, 'আমি কালকে এসেছি। হাসু বড় হচ্ছে, ওরে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিতে হবে না নে।'

মুজিব বললেন, 'এসেছ খুব ভালো করেছ। আমার তো কোনো কিছুরই ঠিক নাই। মোসাফিরের মতো থাকি। তুমি সবকিছু গোছগাছ করে নাও। তবে হক সাহেব আমাকে ডেকে পাঠায়েছেন। মনে হয়, মন্ত্রী হতে বলবেন।'

মুজিব গেলেন ফজলুল হকের সঙ্গে দেখা করতে। ফজলুল হক বললেন, 'নাতি, শোন। তোকে মন্ত্রী হতে হবে। তুই না করিস না। রাগ করিস না। তোরা সবাই মিলে ঠিক কর, আর কাকে কাকে নেওয়া যেতে পারে।'

মুজিব বললেন, 'আমাদের তো আপত্তি নাই। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে পরামর্শ করা দরকার। তিনি তো অসুস্থ। আর মওলানা ভাসানীও তো ঢাকায় নাই। পরামর্শ করে আপনাকে মত জানাচ্ছি।'

ফজলুল হক বললেন, 'দেখ নাতি। নানার উপরে রাগ রাখবি না। অবশ্যই যেন হ্যাঁ হয়। কোনো 'না' চলবে না।'

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কারা মন্ত্রী হবেন, সোহরাওয়ার্দী আর ভাসানী তা তো আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

মুজিব ফোন করলেন সোহরাওয়ার্দীকে। 'স্যার, মুজিব বলছি স্যার হ্যালো, লিডার, শুনতে পাচ্ছেন?'

না, সোহরাওয়ার্দী এতই অসুস্থ যে তিনি ফোনেও কথা বলতে পারবেন না। তাঁর জামাতা আহমেদ সোলায়মান কথা বললেন। মুজিব তাঁকে বললেন, 'বলেন, লিডার আর মওলানা সাহেব মিলে যে তালিকা তৈরি করেছিল, সবাইকে নিতে হক সাহেব রাজি। উনি কী বলেন?'

জামাইয়ের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দী জানিয়ে দিলেন, তাঁর আপত্তি নাই।

আতাউর রহমান খান, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, আবদুল কাদের সর্দার ও মুজিব চলেছেন দুটো জিপ নিয়ে। টাঙ্গাইলের পথে।

নির্বাচনের আগে ও পরে কফিলউদ্দিন চৌধুরী আওয়ামী লীগের যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন, তুলে ধরেছেন আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রী করার প্রয়োজনীয়তার কথা, তাই তাঁকে ফজলুল হক মন্ত্রী করতে চান না, যদিও তিনি করেন ফজলুল হকের দল। আওয়ামী লীগ চায়, তিনি মন্ত্রী হোন। দরকার হলে তিনি আওয়ামী লীগের কোটায় মন্ত্রী হবেন।

রাত ১১টা পর্যন্ত ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে দেনদরবার করে নেতৃবর্গ ছুটে চলেছেন টাঙ্গাইল অভিমুখে। রাস্তা খুব খারাপ। তার ওপর চারটা খেয়া পার হতে হয়। ছয় ঘণ্টা লাগে।

ভোরবেলা টাঙাইল পৌঁছুলেন তাঁরা। ভাসানী আছেন আওয়ামী লীগ অফিসের দোতলায়। ভাসানী প্রথমে খুব খেপে গেলেন। তারপর ঠান্ডা হলেন। আতাউর রহমান খান পকেট থেকে কাগজ বের করে ভাসানীকে দিলেন। আওয়ামী লীগের মনোনীত মন্ত্রীদের নাম। আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমদ, আবদুস সালাম খান, হাশিমউদ্দিন আহমদ এবং শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাসানী অনুমোদন করলেন।

১৯৫৪ সালের ১৫ মে।

সকাল নয়টা। গুলিস্তান আর ওয়ারীর মধ্যবর্তী লাট ভবনে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন মুজিবসহ নেতৃবর্গ। কফিলউদ্দিন চৌধুরীকেও মন্ত্রিত্ব দেওয়া হলো।

শপথ নেওয়ার অনুষ্ঠানেই এল দুঃসংবাদটি। আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা বেঁধে গেছে। ভোররাত থেকেই সৈয়দ আজিজুল হক সেখানে আছেন। রাতেই ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর ফোর্স সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে। তাহলে আওয়ামী লীগের লোকেরা

যখন শপথ নিচ্ছেন, তখন কেন দাঙ্গা বাধতে গেল? এর মানে কী?

প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক মন্ত্রীদের নিয়ে সোজা চললেন আদমজী অভিমুখে।

আদমজী যাওয়ার জন্য প্রথমে যেতে হবে নারায়ণগঞ্জ। রাস্তার অবস্থা ভালো নয়, তবে জিপ যেতে পারে। তারপর সেখান থেকে উঠতে হবে লঞ্চে।

মুজিব বেরিয়েই লাট ভবনের সামনে পড়লেন অপেক্ষমাণ জনতার ভিড়ের মধ্যে। তারা ধরে বসেছে, মিছিল করতে হবে।

মুজিব তাদের বোঝালেন, অবস্থা গুরুতর। আদমজীতে তাঁকে এখন যেতেই হবে।

ফজলুল হক আগেই রওনা হয়ে গেলেন। জনতার ভিড় ঠেলে বেরোতে বেরোতে মুজিবের আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গেল।

মুজিব জিপে করে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছালেন। তাঁর জন্য একটা লঞ্চ অপেক্ষা করছে। তিনি তাতে করে আদমজী পৌঁছালেন। পুলিশের একটা জিপ তাঁকে নিয়ে চলল দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকায়।

বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন তিনি। একটু পরে মোহন মিয়া এলে তাঁর মনে জোর বাড়ল। অবস্থা খুব সঙিন। প্রায় ৫০০ লাশ মুজিব নিজে গুনলেন। আহতদের তিনি পাঠালেন হাসপাতালে।

মেলা রাত করে বাড়ি ফিরলেন। ফিরে দেখলেন, রেনু তাঁর অপেক্ষায় না খেয়ে বসে আছেন।

মুজিব বললেন, 'আমি খেয়ে এসেছি রেনু। তুমি খেয়ে নাও।'

মিথ্যা কথা। সকাল থেকে মুজিব একটু পানিও পান করার সুযোগ পান নাই। কিন্তু এতগুলো লাশ দেখে, হাত-পা কাটা, মাথা ফাটা, পেট বেরিয়ে যাওয়া মানুষকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়ার অভিজ্ঞতার পরে তাঁর খিদে চলে গেছে।

মুজিব বললেন, 'তুমি এতক্ষণ না খেয়ে থেকে ঠিক করো নাই, রেনু। তোমার কোলে দুধের শিশু। তার জন্যও তো তোমার নিয়মিত ভালো খাবার খেতে হবে।'

রেনু ভাত নিতে বাধ্য হলেন।

মুজিব খেতে খেতে বললেন, 'এইটা নির্ঘাত একটা চক্রান্ত। আমরা যখন শপথ নিচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই দাঙ্গা শুরু করার মানে কী? পশ্চিমারা খুব ভয় পেয়ে গেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। কারণ, তারা তো সব ব্যবসা-বাণিজ্য করে মুনাফা নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানে। ব্যবসায়ী, ধনিকশ্রেণীর ভয়টা বেশি।'

'রেনু বললেন, বেশি দুশ্চিন্তা কোরো না। তোমাকে খুব রোগা দেখা যাচ্ছে।'

শেখ মুজিব গেলেন সচিবালয়ে। প্রথম দিন। মুজিবকে দেওয়া হয়েছে সমবায় ও কৃষি উন্নয়ন দপ্তর। কিন্তু গিয়ে দেখেন ওখানে মোহন মিয়া তৎপর, তিনিও মন্ত্রী, আগে মুসলিম লীগে ছিলেন, মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে এখন কৃষক শ্রমিক পার্টিতে গেছেন। তিনি সিএসপি সোবহান সাহেবকে পরামর্শ দিচ্ছেন, কাকে কোন দপ্তর দিতে হবে। মুজিবের কাছ থেকে কৃষি উন্নয়ন দপ্তরটা সরিয়ে আবার আরেকজনকে দেওয়া হলো।

তিনি সোবহান সাহেবকে ডাকলেন। বললেন, 'শোনেন, আমার নাম শেখ মুজিবুর রহমান। কথাটা মনে রাখবেন। বেশি ষড়যন্ত্র করবেন না।'

মুজিব গেলেন ফজলুল হকের কাছে। 'নানা, ব্যাপার কী? এসব কী হচ্ছে? আমরা তো মন্ত্রী হতে চাই নাই। আপনি তো ডেকে আমাদের মন্ত্রী হতে অনুরোধ করলেন। এখন ভেতরে ডেকে এনে আমারে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে কেন? আমার দপ্তর আরেকজনকে দেওয়ার মানে কী?'

ফজলুল হক বললেন, 'করবার দে। আমার পোর্টফলিও তোরে দিয়া দিব। তুই রাগ করিস না। পরে তোকে সব দিয়ে দেব।'

মুজিব কিছুই বলতে পারলেন না। এই বয়সী একজন মুরুব্বির মুখের ওপরে কথা বলা যায়?

মুজিবের সঙ্গে ফজলুল হকের খাতির হয়ে গেল। তিনি প্রায়ই ডেকে নেন মুজিবকে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি বুড়া, মুজিব গুঁড়া, আমি নানা ও নাতি।'

মুজিবও উৎসাহভরে কাজ করতে লাগলেন।

মুজিবকে দেওয়া হয়েছে একটা ছোট্ট চেম্বার। তাঁর গাড়িটিও ছোট, অস্টিন টেন। মুজিবের বয়স কম, ৩৪ বছর। সরকারি কর্মকর্তারা তাঁর প্রতি সন্দিগ্ধ। কিন্তু তাঁরা তাঁকে সেটা বুঝতে দেন না।

আওয়ামী লীগ নেতাদের মন্ত্রিপরিষদে যোগ দেবার দুদিন পরেই করাচি থেকে তলব এল।

ফজলুল হক মুজিবকে ডেকে বললেন, 'করাচি থেকে খবর এসেছে। আমাকে যেতে হবে। নান্না, মোহন মিয়া আর আশরাফউদ্দিন যাবে। তুই চল। আতাউর রহমান খান সাহেবকেও নেই। ব্যাটাদের হাবসাব ভালো মনে হচ্ছে না।'

মুজিব ভাবলেন, ভালোই হলো। সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ, তাঁকে দেখতে এমনিতেই তাঁর করাচি যেতে হতো।

৪৬.

আমগাছ। বিখ্যাত আমগাছ। আজ থেকে দুই বছর দুই মাস আগে যে গাছের নিচে সমবেত হয়েছিল ঢাকার ছাত্রছাত্রীরা। তারা চেয়েছিল তাদের মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে। সেই গাছের ডালে বাস করে যে দুই পক্ষী, যারা কথা বলে মানুষের মুখের ভাষায়, যারা ত্রিকালের সবকিছু জানে, তারা আবার কথা কয়ে উঠল।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের নেতারা মন্ত্রী হওয়ার ১৫ দিনের মাথায় সেই মন্ত্রিসভা ভাইঙ্গা দিল পাকিস্তানের লাটসাবে। এইটারে কয় ৯২-ক ধারা। মন্ত্রিসভা খারিজ। প্রাদেশিক সরকার স্থগিত। রাজনীতি নিষিদ্ধ।

'অজুহাত হইল ফজলুল হকের কলকাতা বিবৃতি। যাতে তিনি কইছেন, দুই বাংলার ভাষা এক, তাই জনগণের মধ্যে সহযোগিতা দরকার। সেইটারে তারা বানাইল, ফজলুল হক কইছেন, ভারত পাকিস্তান সবটা মিইলাই ভারত। পাকিস্তান আবার কী? কইছেন দুই বাংলারে আবার এক করতে হইব।'

ব্যাঙ্গমি কইল, 'আরও অজুহাত আছে। সেইটা হইল, যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অবাঙালিদের ধইরা ধইরা গলা কাইটা দিতাছে। তারা দাঙ্গা বাধাইছে। কিন্তু আসল কারণ এইসবের একটাও না।'

ব্যাঙ্গমা কইল, 'কইছিলাম কি না, এই নয়া জমানায় গরিব দেশগুলানের ভাগ্য আর দেবতারা নির্ধারণ করে না। এইটা নির্ধারিত হয় ওয়াশিংটন থাইকা '

তখন দুই পাখি মিলে তাদের পুরোনো গানটা গাইতে লাগল :

কোন দেশে কী ঘটবে, কে বা করে ঠিক।
নেতা নাকি সৈন্যদল কিংবা পাবলিক ॥

শ্যামচাচা কলকাঠি নাড়ে তলে তলে।
গরিবের ভাগ্যচাবি তাদের দখলে ॥

তলে তলে নয় কাঠি প্রকাশ্যেই নাড়ে।
পাকিস্তানে নেবে তারা উন্নতির দ্বারে?
ছয় দশক পরে পাকিস্তান কবে—
আমারে ছাড়িলে তুমি মোর ভালো হবে ॥
তোমার ভাতিজা আমি তুমি মোর চাচা।
আমারে ছাড়িয়া চাচা মোর প্রাণ বাঁচা ॥

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আমেরিকার ভয় হইল কমিউনিস্টগো।'

ব্যাঙ্গমা বলল, '১৯৫০ সালের আগস্ট মাসেই আমেরিকানরা একটা কর্মসূচি হাতে লয়। খুবই গোপন সেই কর্মসূচি। এইটার নাম তারা দেয়, "পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট প্রভাব রোখার সমন্বিত প্রোগ্রাম।"'

'এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য তারা পরিষ্কার ভাষায় লেখে, কমিউনিস্ট-প্রভাব দূর করা এবং পাকিস্তানের নতুন ভাবাদর্শের সমর্থনে কর্মসূচি প্রণয়ন করা। তাদের টার্গেট আছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি আর তার অধীনে ৬৭ কলেজ, শ্রমিক, সেনাবাহিনী, সাধারণ নাগরিক।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'সেই প্রোগ্রাম তারা পালন করতেছে পাকিস্তানের আমেরিকান তথ্যকেন্দ্র ইউসিস আর পাকিস্তান সরকারের মধ্যে গোপন সহযোগিতার মাধ্যমে।

'তারা বুঝাইব, কমিউনিজম কত খারাপ। মুসলমানরা কেন কমিউনিস্ট হইব?'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আমেরিকার খুব দুশ্চিন্তা, যেন পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন না হইয়া যায়।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'আর চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লব হইয়া গেছে। ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি সক্রিয়। কাজেই পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্টরা জনপ্রিয় হইতেছে, পায়ের নিচে মাটি পাইয়া শিকড় ছড়াইতেছে, এইটা তাদের ভাবাইয়া তুলছে।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'ইন্ডিয়ার সাথে ভালো সম্পর্ক করতে চাইছিল কিছুদিন। তারপর তারা কইল, পাকিস্তানের সাথে ভালো সম্পর্কই বেশি লাভজনক।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'আমেরিকানরা এইটাও কইল, ইসলামি দলগুলার সাথে সম্পর্ক বাড়াইতে হইব। তাগো হেল্প করতে হইব। সিআইএ বিশেষ প্রোগ্রাম নিয়া মাঠে নামল।'

ব্যাঙ্গমি কইল, '১৯৪৮ সালেই তো আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর কইল, পাকিস্তানের লগে বন্ধন গইড়া তুলতে পারলে এইখানে বিমানঘাঁটি গইড়া তোলা যাইব। আর সেই ঘাঁটি থাইকা সহজে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিমান হামলা করা যাইব। তারা সুপারিশ করল, ইন্ডিয়ার চাইতে পাকিস্তানের সাথে পিরিতি আমেরিকার লাইগা বেশি লাভজনক।

'পাকিস্তানের নেতারাও আমেরিকাকে চিঠি লেইখা, লিয়াকত আলী খান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের লগে দেখা কইরা কইল, আরে আহেন মিয়া, একলগে কাজ করি। কমিউনিস্টগো ধ্বংস করন লাগব না?

'আমেরিকা কইল, লাগব তো। কমিউনিস্টগো জাঁতা দেও।

'পশ্চিম পাকিস্তানে আর পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্টগো ধইরা ধইরা জেলে পোরা হইল। কমিউনিস্ট পার্টি ব্যান্ড করা হইল।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'জেলখানায় কমিউনিস্টগো খুব অত্যাচার করে।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'ইলা মিত্ররে ধইরা অত্যাচার করছে। রাজশাহীর জেলে গুলি কইরা কমিউনিস্টগো মারছে।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'এত অত্যাচার-নিপীড়ন কইরাও কমিউনিজম দমানো গেল না। হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট হইয়া যাওয়ার লগে লগে কমিউনিস্টরা তাগো সাপোর্ট দিয়া বসল।'

ব্যাঙ্গমি পাখা ঝাপটে বলল, 'শেখ সাহেব শপথ লইলেন ১৫ মে ১৯৫৪। ১৯ মে সই হইল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি। পাক-ইউএস আর্মস প্যাক্ট। শেখ সাহেব যুক্ত বিবৃতি দিলেন, খন্দকার ইলিয়াস, আলী আকসাদ, আনিসুজ্জামান সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করানোর লাইগা এমএলএদের কাছে ছুটাছুটি করলেন। ১৬৫ জন এমএলএ বিবৃতি দিল পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির তীব্র নিন্দা কইরা। এই বিবৃতি দেইখা আমেরিকানরা চইটা ফায়ার হইয়া গেল।

'আর আমেরিকা থাইকা আইছেন কালাহান সাহেব। তিনি *নিউ ইয়র্ক টাইমসে* লেখছেন, এ কে ফজলুল হক পূর্ব বাংলাকে আলাদা করতে চান। দুই বাংলা এক করতে চান।'

ব্যাঙ্গমা কইল, 'ফজলুল হক মন্ত্রীগো লইয়া করাচি গেলে কালাহান সাহেবরে ডাইকা আনায়া সাক্ষী দেওয়া হইল যে ফজলুল হক দেশদ্রোহী কথা কইছেন।'

ব্যাঙ্গমি কইল, 'মোহাম্মদ আলী বগুড়া আছিল ওয়াশিংটনে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত। মুসলিম লীগের পলিটিক্‌সের লগে তাঁর কোনো সম্পর্ক আছিল না।

'৪৭-এর আগে আছিল সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার সদস্য। তারে হঠাৎ কইরা কেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হইল? ওয়াশিংটন থাইকা কেন তারে ধইরা আনা হইল?'

ব্যাঙ্গমা কইল, 'কারণ একটাই। আমেরিকার স্বার্থ। পাকিস্তানের জন্মের আগেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হইয়া গেছে। আমেরিকা বলছে, এই দেশটা সামরিক দিক থাইকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ওটা দিতে হবে।

'একদিকে আফগানিস্তান, তার পাশে রাশিয়া, পাশেই চীন, তার পাশে ইন্ডিয়া, ওই পাশে ইরান, তুরস্ক—এই রকম একটা ভূগুরুত্বপূর্ণ দ্যাশরে তারা ভালুকের থাবা দিয়া জড়ায়া ধরল, কইল, আইসো ভালোবাসা দেই। হায়! আমেরিকা যারে ভালোবাসার আলিঙ্গন কয়, তার চাপে গরিবের যে শ্বাস বন্ধ হইয়া যায়। এই যে আমেরিকা পাকিস্তানের ঘাড়ে সওয়ার হইল, আরও ৬০ বছর পরেও সেই ভূত নামব না। পাকিস্তানের গলায় যে মালা আমেরিকা পরাইল, সেইটা তার গলার ফাঁস হইয়া থাকব বহু বছর। বহু বছর।'

ব্যাঙ্গমি কইল, 'করাচিতে ডাইকা নিয়া মুজিবরে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কয়, শুনেছি, লোকে বলে, আপনি নাকি কমিউনিস্ট।

'পূর্ব বাংলায় নির্বাচনে কয়জন কমিউনিস্ট নির্বাচিত হইছে, এই খবর সবার আগে গেল ওয়াশিংটনে। প্রকাশ্যে একজনও নয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই সংখ্যা অনেক। সরকার মনে করে গণতন্ত্রী দল হইল গিয়া কমিউনিস্ট পার্টির পার্লামেন্টারি দল, ছাত্র ইউনিয়ন হইল রিক্রুটিং দুয়ার আর যুবলীগ হইল প্রশিক্ষণকেন্দ্র। গণতন্ত্রী দলের ১৩ জন তো নির্বাচিতই হইছে।

'তার উপরে ১৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্টের কর্মী সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়া মওলানা ভাসানী পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির তীব্র নিন্দা করলেন। তাঁর চীন-কানেকশনের কথা সকলেই জানে। আর শেখ মুজিব তো চীন সফরই কইরা আইছেন। তার মানে ওয়াশিংটনের হিসাব হইল, পূর্ব বাংলারে কমিউনিস্টরা খাইয়া ফেলতাছে। আর এইটা হইতেছে গিয়া যুক্তফ্রন্ট সরকারের ব্যানারে।'

ব্যাঙ্গমা কইল, '৯২/ক ধারা মানে গভর্নরের শাসন চলাকালে আমেরিকার সাথে আরও দুইটা চুক্তি হইব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা আর বাগদাদ চুক্তি—সিয়াটো আর সেনটো।'

ব্যাঙ্গমি কইল, 'তয় আমেরিকা যা চায়, সকল সময় যে তাই হয়, তাও তো না। মানষের ইচ্ছার কাছে আমেরিকার ইচ্ছাও হাইরা যায়। দেখা যাউক, পাকিস্তানে অহন কী কী হয়?'

৪৭.

পাকিস্তানের রাজধানী করাচি। মোহাম্মদ আলী বগুড়া পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী। তাঁর চেম্বারে বসে আছেন এ কে ফজলুল হক, শেখ মুজিব আর সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া। ফজলুল হক বয়স্ক, অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে, অন্তত তাঁর সামনে বেয়াদবি কেউ তো করে না। আর এই মোহাম্মদ আলী বগুড়া শেরেবাংলার সঙ্গে কথা বলছে বেয়াদবের মতো। মুজিবের সহ্য হতে চায় না।

বগুড়া বললেন, 'হক সাব, আপনি স্বাধীন বাংলা করতে চেয়েছেন?'

ফজলুল হক বলল, 'না, আমি সেই রকম কিছু বলিনি। আমি স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেছি।'

বগুড়া বললেন, 'আমার কাছে রিপোর্ট আছে। আপনি বলছেন, কলকাতায় আপনি কী বলেছেন—পাকিস্তান আবার কী? পুরোটাই ইন্ডিয়া।'

ফজলুল হক বললেন, 'না, তা কেন আমি বলব।'

বগুড়া বললেন, 'আমার কাছে রিপোর্ট আছে। আপনি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর রিপোর্টার কালাহানের সাথে সাক্ষাৎকার দিয়ে কী বলেছেন? বলেছেন, পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে চান।'

'না, বলি নাই তো!'

'বলেছেন, বলেছেন। আমার কাছে প্রমাণ আছে। সাক্ষী আছে।'

শেখ মুজিব খেপে গেলেন। বললেন, 'আপনি একজন সিনিয়র নেতার সাথে এইভাবে কথা বলতে পারেন না। হক সাহেব খুবই সম্মানিত ব্যক্তি।'

বগুড়া বললেন, 'মুজিবুর রহমান। তোমার বিরুদ্ধে বিরাট ফাইল আমার কাছে আছে।'

মুজিব হেসে বললেন, 'ফাইল তো থাকবেই। আপনাদের বদৌলতে আমাকে কম দিন তো জেল খাটতে হয় নাই!'

বগুড়া আমেরিকান কাউবয় মার্কা সিনেমার ভিলেনের মতো করে টেবিল থেকে উঠে একটা মোটাসোটা ফাইল এনে শেখ মুজিবের সামনে রাখলেন।

মুজিব বললেন, 'আপনার বিরুদ্ধেও একটা ফাইল আমাদের প্রাদেশিক সরকারের আছে?'

বগুড়া ভ্রু কুচকে বললেন, 'মানে?'

'মনে নাই? ১৯৪৭ সালে যখন খাজা নাজিম উদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন আপনাকে মন্ত্রী করে নাই। তখন ১৯৪৮ সালে আমরা যখন প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করি, তখন আপনি আমাকে দুই শত টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। মনে নাই? পুরোনো কথা ভুলে গেছেন। ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আপনি রোজ গার্ডেনে গেছলেন। সেইসব ফাইল আমাদের হাতে আছে।'

ফজলুল হক ও তার ভাগনে নান্না মিয়া দেখলেন আবহাওয়া গরম হয়ে উঠছে। নান্না মিয়া বললেন, 'আজকে আমরা উঠি। পরে আবার আলোচনা হবে।'

পরের দিন *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ প্রকাশিত হলো সাংবাদিক কালাহানের নেওয়া এ কে ফজলুল হকের সাক্ষাৎকার।

সেটার কপিই দ্রুতই চলে এল করাচিতে।

ফজলুল হককে আবার ডেকেছেন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া। সঙ্গে শেখ মুজিব আর নান্না মিয়াকে নিতে ভোলেন না ফজলুল হক।

বগুড়া *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর একটা কপি ফজলুল হকের সামনে রেখে বললেন, 'আপনি বলেছিলেন, কলকাতায় আপনি স্বাধীন বাংলার কথা বলেননি এখন আমি দেখে দেখছি, আপনি করাচিতে বসে কালাহানকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তাতে আপনি আপনার পুরা পরিকল্পনার কথাই খুলে বলেছেন।'

শেখ মুজিব পত্রিকার কপিটি হাতে তুলে নিয়ে পড়তে লাগলেন :

পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি চায়
প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী স্বাধীন দেশ গঠনে আগ্রহী

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর বিশেষ সংবাদদাতা জন পি কালাহানের প্রতিবেদন :

করাচি, পাকিস্তান ২২ মে (১৯৫৪)। পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের নেতা আজ বলেছেন, তিনি স্বাধীনতার পক্ষপাতী এই প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক দেশের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ

আলীর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর এই মন্তব্য করেন। অশীতিপর রাজনীতিক হক ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে রাজনীতি করে আসছেন। একদা তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভেতর যে এক হাজার মাইলের বেশি ব্যবধান, চার কোটি বিশ লাখ বাঙালির স্বাধীনতা দাবির এটা অন্যতম কারণ। দুই ঘণ্টা ধরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি দুই প্রদেশের ভেতর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে ভাষাগত ব্যবধান (পূর্ব পাকিস্তানে বাংলায় ও পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উর্দুতে কথা বলা হয়), ভারতের ভেতর দিয়ে দুই পাকিস্তানের মধ্যে যাতায়াতের সংযোগের অভাব এবং রাজস্ব আয়ের অসমতা।

...

তিনি বলেন, কত দ্রুত স্বায়ত্তশাসন অর্জিত হবে, সে বিষয়ে তাঁর কোনো নির্দিষ্ট ধারণা নাই। 'তবে আমার মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রধান কাজই হবে স্বাধীনতার বিষয়টি বিবেচনা করা।' পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতার চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় সরকারে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, এ প্রশ্নের জবাবে হক বলেন, 'সন্দেহ নাই, তারা সে চেষ্টায় বাধা দেবে। কিন্তু কোনো জাতি যখন স্বাধীনতা চায়, তাকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব।'

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ২৩ মে ১৯৫৪ সালের সংখ্যা এটা।

মুজিব দ্রুত পড়ে নিলেন পত্রিকাটা। তিনি মনে মনে বললেন, নানা আমার ঠিক সময়ে ঠিক কথা বলেননি বটে, কিন্তু যা বলেছেন, সব আমার মনের কথা।

বগুড়া বললেন, 'আপনি আর আপনার মন্ত্রিসভা পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। আপনার মন্ত্রিসভাকে কি এর পরেও চলতে দেওয়া যায়?'

ফজলুল হক বললেন, 'আমি এই কথা বলি নাই। আমি বলেছি অটোনমির কথা। স্বায়ত্তশাসনের কথা। আমি ইন্ডিপেনডেন্স ওয়ার্ডটাই ইউজ করি নাই।'

'ওকে ওকে মিস্টার হক। মি. কালাহান ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার।' বগুড়া হলিউডি সিনেমার কায়দায় পিএবিএক্স ফোন তুললেন। বললেন, 'আনো।'

দরজা খুলে গেল। ঢুকলেন আমেরিকান সাংবাদিক জন পি কালাহান।

বগুড়া বললেন, 'মিস্টার কালাহান, আপনার প্রতিবেদন নাকি মিথ্যা? উনি বলছেন।'

কালাহান বলল, 'একটা ওয়ার্ডও মিথ্যা নয়। আমার কাছে নোট আছে।'

ফজলুল হক বললেন, 'আমি আপনাকে বলেছি অটোনমির কথা। এটা আমাদের যুক্তফ্রন্টের ঘোষিত ও মুদ্রিত কর্মসূচি। আমি আপনাকে কখন বললাম স্বাধীনতার কথা। আপনি অবশ্যই ভুল স্বীকার করে আজকেই কাগজে নোট পাঠাবেন। আগামীকালের কাগজেই ভুল সংশোধন করে দেবেন।'

'না আপনি স্বাধীনতার কথা বলেছেন।'

'সে তো তোমাকে একটা কবিতার লাইন শুনিয়েছি। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়,/ কে পরিতে চায় হে, কে পরিতে চায়?'

কালাহান বললেন, 'আমি আমার রিপোর্টের একটা অক্ষরও পাল্টাব না। আমি আমার প্রতিবেদনের প্রতিটা শব্দ সঠিক বলে স্থির থাকব।'

বগুড়া বলেন, 'এখন হক সাহেব, আপনিই বলেন, আমার জায়গায় আপনি থাকলে আপনি কী করতেন?'

ফজলুল হক বললেন, 'আপনি, মিস্টার কালাহান, সব সময়েই আমাদের বিষয়ে মিথ্যা খবর প্রকাশ করেছেন। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপরে নুরুল আমিনের পুলিশ গুলি চালানোর পরে আপনি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ লিখেছেন, ইন্ডিয়ান পুলিশ ঢাকায় গুলি চালিয়েছে। ৪ জন নিহত, কয়েকজন আহত। ঢাকায় এসে ইন্ডিয়ান পুলিশ গুলি চালাবে, আর ছাত্ররা কেন বিক্ষোভ করছিল। আপনি লিখেছেন, দৈনিক *অবজারভার* পত্রিকা নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ছাত্ররা মিছিল করছিল। তার ওপরে ইন্ডিয়ান পুলিশ গুলি করে। এই হলো আপনার সততার নমুনা।'

কালাহান বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার আহ্বানে এখানে এসেছি। আপনার সাথে সাংবাদিকতা নিয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি আপনার কাছে সাংবাদিকতা শিখতে চাই না।'

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি আমগাছ থেকে নেমে আরেকটা কৃষ্ণচূড়া গাছে বসে। মে মাস। জ্যৈষ্ঠ। কৃষ্ণচূড়াগাছে ফুল আসছে।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি *নিউ ইয়র্ক টাইমস* পূর্ব বাংলা সম্পর্কে কী রকম সব প্রতিবেদন প্রকাশ করছে, তাই নিয়ে আলোচনা করল, আর ঠোঁটে পায়ের আঙুল রেখে ভাবতে লাগল।

২১ ফেব্রুয়ারির পরে *নিউ ইয়র্ক টাইমস* লেখে : ফেব্রুয়ারি ২১ থেকে ২৩ পর্যন্ত সংঘটিত সহিংস ঘটনায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সরকার তার প্রথম

বিজয় অর্জন করেছে।...এ ব্যাপারে সবাই মোটামুটি একমত যে, ছাত্ররা মূলত অরাজনৈতিক ছিল, কিন্তু একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য এটাই উপযুক্ত সময়—এই বিবেচনা থেকে কমিউনিস্টরা তাদের সব মেশিনারি কাজে লাগায়।'

ব্যাঙ্গমা বলে, '*নিউ ইয়র্ক টাইমস* পাকিস্তান আর আমেরিকার সরকারের মতো কমিউনিস্টভীতিতে ভুগতাছে।'

ব্যাঙ্গমি বলে, 'তারা ভাষা আন্দোলনরে কমিউনিস্টদের কাজ বইলা প্রচার করতেছে। আর প্রতিবেদন প্রকাশ করতেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট চিঠি চালাচালি কইরা যাইতাছে।

'*নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর মালিকদের একজনও চলে আসেন পাকিস্তানে ও ভারতে। তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য, এই অঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সোভিয়েত প্রোপাগান্ডার বিস্তার সরেজমিনে দেখা।

'তিনি তাঁর পত্রিকায় লেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নজর যখন ইউরোপের ওপরে নিবদ্ধ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক সেই সুযোগে প্রাচ্যের দেশগুলোর ওপরে লোলুপ দৃষ্টি বিস্তৃত করেছে।

'খাজা নাজিম উদ্দিন তাঁকে বলেন, ভারত ও বার্মার ভেতর দিয়ে কমিউনিজম পাকিস্তানে প্রবেশের চেষ্টা করছে। রাশিয়া এই কাজে হাত লাগাচ্ছিল। আমাদের তরুণ মুসলমানেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমি অনুপ্রবেশ ঠেকিয়েছি। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। এই উদ্ধৃতি *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এ প্রকাশিত হয়।'

ব্যাঙ্গমা ও ব্যাঙ্গমির বিশ্লেষণ দাঁড়াল, আমেরিকা চায় না, পূর্ব বাংলা বিচ্ছিন্ন হোক। আমেরিকা চায় না, কমিউনিস্টরা পূর্ব বাংলায় মাথাচাড়া দিক। আর পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার দোস্তি তাদের নিজেদের স্বার্থেই দরকার। আমেরিকা মনে করে, যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্টরা আছে। কাজেই আদমজীর দাঙ্গা, কালাহানের তৎপরতা, আর মোহাম্মদ আলী বগুড়ার ওয়াশিংটন থেকে উড়াল দিয়ে এসে পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব নেওয়া—সবটার পরিণতি একটাই হতে যাচ্ছে, তা হলো, যুক্তফ্রন্টের সরকার বাতিল। পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন।

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি উড়াল দিল, কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল থেকে উড়ে গিয়ে আবার আশ্রয় নিল আমগাছের ডালে।

৪৮.

করাচিতে ফজলুল হক, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবসহ কয়েকজন মন্ত্রী। তারা টের পেলেন তাঁদের মন্ত্রিত্ব আর নাই। যুক্তফ্রন্টের এই বিজয় পাকিস্তানিরা মেনে নিতে পারছে না।

কিন্তু মুজিব টের পেলেন আরেকটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাঁরা যাতে পূর্ব বাংলায় ফিরতে না পারেন, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

পূর্ব বাংলার চিফ সেক্রেটারিকে বলা হয়েছে, 'শোনেন, ওঁদের প্লেনের টিকিট করবেন না।'

চিফ সেক্রেটারি ইসহাক সাহেব জবাব দিলেন, 'আইনত আমি তা পারি না। কারণ ওঁরা এখনো মন্ত্রী। ওঁরা যা বলবেন, আমি তা শুনতে বাধ্য।'

শেখ মুজিব আর আতাউর রহমান খান সেই খবর জেনে গেলেন।

শেখ মুজিব এ কে ফজলুল হককে বললেন, 'নানা, ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পূর্ব বাংলায় ঢুকে পড়তে হবে পারলে আজকেই আমাদের করাচি ছাড়তে হবে।'

ফজলুল হক বললেন, 'আমিও যাব।'

তাঁরা টিকিটের জন্য ইসহাক সাহেবকে অর্ডার দিয়ে চললেন সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে দেখতে। তাঁর অপারেশন হয়েছে। তিনি খুবই কাতর। কথা বলতে পারেন না। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক আলাপ করতেও পরিবারের লোকেরা নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাকে চিকিৎসার জন্য জুরিখ যেতে হবে। টাকার অভাব। টাকা নাই।'

শেখ মুজিব তাঁর হাত ধরে বসে আছেন। তাঁর মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল। এই হাত দিয়ে লিডার কতজনকে কত টাকাপয়সা দান করেছেন, আর আজ তাঁর নিজের চিকিৎসার টাকা নাই! কী রকম পরিহাসের মতো শোনাচ্ছে কথাগুলো।

৪৯.

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও তাঁর মন্ত্রীরা এখন আকাশে। করাচি থেকে প্লেন ছেড়ে দিয়েছে। প্লেন দিল্লি ও কলকাতা হয়ে যাবে ঢাকা।

তাঁদের সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি ইসহাক সাহেব আছেন, আর আছেন পুলিশের আইজি শামসুদ্দোহা।

মুজিব তাঁর আসন থেকে উঠে ফজলুল হক সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, 'পুলিশের এই লোকটা কেন আমাদের সাথে এসেছে? তাকে কে পারমিশন দিয়েছে?'

ফজলুল হক বললেন, 'আমিই দিছি।'

দিল্লি থেকে প্লেন কলকাতার উদ্দেশে উড়াল দিল। কিছুক্ষণ পরে পুলিশের আইজি দোহা গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। বললেন, 'স্যার, আপনার উচিত হবে, আজকের দিনটা কলকাতায় থেকে যাওয়া। রাতেই ইস্কান্দার মির্জা এবং এম এন হুদা মিলিটারি প্লেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। ঢাকা এয়ারপোর্টেই কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যদি কোনো কিছু না হয়, আগামীকাল প্লেন পাঠিয়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।'

ফজলুল হক চোখ বন্ধ করে তর্জনী উঠিয়ে নান্না মিয়া আর মুজিবকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওদের সাথে কথা কন।'

মুজিবের কাছে এসে দোহা সাহেব বললেন সেই একই কথা। মুজিব বললেন, 'শোনেন, ভালোমন্দ যা হওয়ার দেশের মাটিতেই হোক। মারলে মারবে। ধরলে ধরবে। কলকাতায় কেন নামব। যান। নিজের সিটে গিয়ে বসেন। প্লেন এখন নামবে। সিটবেল্ট বেঁধে রাখেন শক্ত করে।' বিড়বিড় করলেন তিনি, 'পুলিশের চাকরি করে বলে নিজেকে চালাক ভেবেছে। ফজলুল হক কলকাতায় রয়ে যাবেন। আর পাকিস্তানি শাসকেরা দুনিয়াকে দেখাবে, দেখো, লোকটা দুই বাংলাকে এক করতে চায় আবার কলকাতায় রয়ে গেল। আর আমরা তার কাজের সাথি।'

কলকাতায় নামল প্লেন। কলকাতায় এক ঘণ্টা বিরতি। তাঁরাও এয়ারপোর্টে পা রাখলেন। খবরের কাগজের সাংবাদিকেরা তাঁদের ঘিরে

ধরল। ফজলুল হক কিছুই বললেন না। ইশারা করে দেখালেন, যা বলাব মুজিব বলবেন।

মুজিবও বললেন, 'এখানে আমাদের কিছু বলার নাই। যদি কিছু বলতে হয়, ঢাকায় গিয়ে বলব।'

আবার দোহা সাহেব এলেন। বললেন, 'ঢাকায় ফোন করেছিলাম স্যার। সমস্ত এয়ারপোর্ট মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে। চিন্তা করে দেখেন কী করবেন?'

মুজিব বললেন, 'ঘিরে রেখেছে ভালো কথা। যা হবার দেশের মাটিতেই হোক। বিদেশের মাটিতে এক মুহূর্ত না।'

ঢাকায় এসে বিমান নামল দুপুরবেলা। বিমানবন্দরে হাজারো মানুষ। তারা এসেছে নেতাদের বরণ করে নেওয়ার জন্য। জ্যৈষ্ঠের দিনটায় প্রচণ্ড গরম। আজকে বাতাসে আর্দ্রতাও বেশি। তবু মানুষ ভিড় করে আছে নেতাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। তারা নানান গুজব শুনছে, এ কে ফজলুল হক বিপদে পড়েছেন, তাদের নবনির্বাচিত সরকার বেকায়দায় পড়েছে, এখনই তো তাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর সময়।

সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরল নেতৃবৃন্দকে। ফজলুল হক কিছু বললেন না, শুধু দেখিয়ে দিলেন তাঁর নাতি শেখ মুজিবকে।

মুজিব সরাসরি চলে গেলেন মিন্টো রোডে, তাঁর সরকারি বাসভবনে। আগের রাতে বিমানে ভালো ঘুম হয় নাই। তার ওপর এত দীর্ঘ ভ্রমণ। তিনি ক্লান্ত বোধ করছেন। তবু বিমানবন্দরে সমবেত নেতা-কর্মীদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি হাত মিলিয়েছেন, জনতার উদ্দেশে হাত নেড়েছেন।

এই বাসায় এখনো আসবাবপত্র আনা হয়নি বংশালের বাসা থেকে। হঠাৎ বন্যা আসায় তারা রজনী বোস লেনের বাসা ছেড়ে বংশালে একটা বাসায় উঠেছিলেন। তবে মন্ত্রী হওয়ার পর জিনিসপত্র নিয়ে এই বাসভবনে ওঠার পরপরই তাঁকে পাকিস্তানে চলে যেতে হয়।

ফেরার পরে দেখলেন, রেনু বাড়িটা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। যদিও সব ফাঁকা ফাঁকা। বিছানা সব মেঝেতে করা।

রেনু বললেন, 'সব খবর ভালো।'

মুজিব বললেন, 'হ্যাঁ, ভালো। তোমাদের খবর কী?' হাসু এসে আব্বাকে জড়িয়ে ধরল। কামাল কাছে এলে মুজিব তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। এই বাচ্চাগুলোর সাথে তার দেখা হয় কত কম!

এক মাসের শিশুটির যত্ন নিচ্ছে টুঙ্গিপাড়া থেকে আসা একজন পরিচারিকা।

মুজিব বললেন, 'গোসল সেরে নিই।'

গোসল সেরে খেতে বসলেন। মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে খাবার ব্যবস্থা।

এরই মধ্যে দু-তিনজন বন্ধু সহকর্মী এসে হাজির। রেনু জানেন, কেউ না কেউ আসবে, তিনি ভাত-তরকারি বেশি করেই রাঁধতে বলে দিয়েছিলেন।

সবাইকে নিয়ে মুজিব খেতে বসলেন। ডাল-ভাত, ছোট মাছ, সবজি—এই হলো খাবার।

মুজিব বললেন, 'রেনু, আজকেই মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিবে মনে হচ্ছে তার মানে আজকে রাতেই আমাকে অ্যারেস্ট করবে।'

রেনু বললেন, 'ভাগ্যিস, বংশালের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র আনি নাই। আনলে বিপদই হতো।'

মুজিব বললেন, 'হাতের টাকা যা আনছিলা, সব নিশ্চয় শেষ। এখন কোথায় থাকবা, ঢাকায়? না হয় বাড়ি চলে যেয়ো।'

রেনু বললেন, 'তোমার কাছে থাকব বলে এসেছিলাম। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কোথায় করাব, সেইটাও একটা চিন্তা। যাক, আল্লাহ ভরসা।'

ভাত খাওয়া শেষে মুজিব গেলেন একটুখানি জিরিয়ে নিতে। এই সময় ফোন এল, কেন্দ্রীয় সরকার ৯২/ক ধারা জারি করেছে। তার মানে পূর্ব বাংলায় এখন গভর্নরের শাসন চলবে। মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত।

রেনু বললেন, 'কী?'

মুজিব বললেন, 'হ্যাঁ, ৯২/ক জারি করেছে। আমাদের মন্ত্রিপরিষদ বিলুপ্ত। পশ্চিমাগুলান এত ষড়যন্ত্র জানে!'

মুজিব এখন বেরিয়ে পড়বেন। রেনুকে বললেন, 'রেনু, আমার জন্য একটা জেলখানার ব্যাগ রেডি করে রেখো। দরকারি যা যা লাগে। করাচির সুটকেসেও অনেক কিছু পাবা।'

মুজিব কখনো একা বের হন না। কেউ না কেউ তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ মুজিব বললেন, 'শোনো। আমাকে সন্ধ্যায় বা রাতের মধ্যে অ্যারেস্ট করবে। আজকে আর আমার সাথে কারও বাহির হওয়ার দরকার নাই।'

তিনি একাই বের হলেন সরকারি গাড়ি নিয়ে।

প্রথমে গেলেন আতাউর রহমান খানের বাড়িতে। তাঁকে তুলে নিলেন। তারপর ফজলুল হকের বাড়ি। ফজলুল হক দোতলার বারান্দায় বসে আছেন। চোখ অর্ধনিমীলিত। নান্না মিয়াকেও পাওয়া গেল।

মুজিব বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না এটা অগ্রাহ্য করা উচিত।'

নান্না মিয়ার উদ্দেশে মুজিব বললেন, 'কী করবেন, ভেবেছেন কিছু?'

নান্না মিয়া কিছুই বললেন না। মনে হচ্ছে তিনি ভয় পাচ্ছেন।

আতাউর রহমান খান রাজি। তিনি প্রতিবাদ করতে চান। মুজিব তাঁকে বললেন, 'আপনি দেখেন তো, সবাইকে ডেকে আনতে পারেন কি না। আমি একটু আওয়ামী লীগ অফিসে যাই, অফিস থেকে কাগজপত্রগুলো সরায়া ফেলি।'

মুজিব চললেন সরকারি অস্টিন গাড়িতেই। নবাবপুর আওয়ামী লীগ অফিসে ঢুকে দ্রুত তিনি কাগজপত্র কোলে তোলেন। অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি গাড়িতে উঠলেন। ড্রাইভার বলল, 'স্যার পেছনে দেখেন পুলিশ আইসা ঘেরাও দিতেছে।'

মুজিব আবার গেলেন ফজলুল হকের বাড়ি। অনেকেই ভিড় করেছেন কিন্তু মন্ত্রীরা তেমন আসেননি। নান্না মিয়া বললেন, 'পুলিশ এসেছিল, আপনাকে খুঁজতে।'

মুজিব ফোন করলেন বাসায়। রেনু বললেন, 'বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, তোমারে খুঁজে গেছে।'

মুজিব বললেন, 'এবার আসলে বলিও অপেক্ষা করতে। আমি শিগগিরই আসতেছি।'

এখানে উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে মুজিব বললেন, 'আমি চললাম। আপনারা তৈরি হোন। অনেককেই জেলে যেতে হবে। তবে এই অন্যায় আপনারা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবেন না। প্রতিবাদ করবেন। জনগণ প্রস্তুত আছে। আপনারা ডাক দিলেই তারা রাস্তায় নেমে আসবে। জেলে তো যেতেই হবে, প্রতিবাদ করে তারপর জেলে যাওয়া উচিত।'

মুজিব বের হলেন। সরকারি গাড়ি ছেড়ে দিলেন। ড্রাইভারকে বললেন, 'তোমার গাড়ি, তুমি সরকারি গ্যারাজে নিয়ে যাও।'

ড্রাইভারের নাম মতিন মিয়া, তিনি কেঁদে ফেললেন। 'স্যার, আপনারে এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে হইব, ভাবি নাই।'

মুজিব একটা রিকশা ভাড়া করলেন। কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন। কাউকেই পেলেন না।

রিকশাওয়ালাকে বললেন, 'মিন্টো রোডে যাও।'

বাড়ির সামনে এসে দেখলেন পুলিশ পাহারা। তিনি রিকশায় করে ঢুকলেন। পুলিশ টের পেল না।

রেনু রাতের খাবার রেডি করে রেখেছেন। বললেন, 'খেয়ে নাও।' রেনুর চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। বাচ্চা দুটোও তাঁর সঙ্গে খেতে বসল।

এর আগে মুজিব অনেকবার গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু রেনুর সামনে থেকে কোনো দিনও তাঁকে পুলিশের সঙ্গে যেতে হয় নাই। তবু রেনুর চেহারা স্বাভাবিকই মনে হলো।

রেনু বললেন, 'আমি বাড়ি যেতে চাই না। হাসুর একটা স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে।'

মুজিব বললেন, 'আচ্ছা, আমি ইয়ার মোহাম্মদ খানকে বলে যাচ্ছি, উনি তোমার জন্য বাড়ি ভাড়া করে দিবেন।'

খাওয়ার পরে মুজিব বিছানা গোছালেন একটা। জেলে নিয়ে যাবেন। রেনু তাঁর ব্যাগ এগিয়ে দিলেন। কোনটা কোথায় রেখেছেন, বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

মুজিব ফোন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে, 'হ্যালো, শেখ মুজিবুর রহমান বলতেছি, আমার কাছে মনে হয় পুলিশ এসেছিল, আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য। এখন আমি বাসায় আছি, পুলিশ পাঠায়া দেন।'

পুলিশের গাড়ি এল। অনেক লোকই বাড়িতে ছিল, গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে পুরুষ মানুষ বেশির ভাগই পালিয়ে গেছে। এখন বাড়িটা অকারণে বেশি সুমসাম। গাড়ি থামার আওয়াজ পাওয়া গেল। গাড়ি থেকে পুলিশের নামার বুটের শব্দও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। রেনু কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

মুজিব বললেন, 'বাচ্চাদের আর উঠায়ো না। আর তোমাকে কী বলে যাব? ঢাকায় থাকলে কষ্ট হবে। তার চেয়ে বাড়ি চলে যেয়ো।'

মুজিব বিছানায় শায়িত সন্তানদের দিকে তাকালেন। হাসু এত বড় হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকানোই হয়নি। ইলেকশনের সময়ও তো টুঙ্গিপাড়া গিয়েছিলেন। ওরাও তো এসেছিল গোপালগঞ্জের বাসায়। কী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি!

কামালটাকে একটু রোগা দেখা যাচ্ছে। তিনি নিজেও ছোটবেলায় খুব হালকা-পটকা ছিলেন, মা বলেন।

ও একটু লম্বা হয়েছে হয়তো।

এবার তাঁর চোখ পড়ল দেড় মাসের শিশুটির দিকে। তিনি কি একে একবারও কোলে নিয়েছেন?

রেনুকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। ও কাঁদছে। আরও আবেগপ্রবণ হয়ে যাবে।

তিনি বললেন, 'রেনু, ছোটটাকে একটু আমার কোলে দাও তো '

মেঝেতেই বিছানা। বড় করে বিছানো। এরই এক পাশে রেনুও ঘুমায়।

রেনু হাঁটুর ওপরে বসে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। মুজিবের দিকে বাড়ালেন বাচ্চাটাকে। এত ছোট বাচ্চাকে মুজিব ধরতেও জানেন না। রেনু বললেন, মাথার নিচে হাত দাও, মাথার নিচে হাত দাও।

মুজিব বললেন, 'এর নাম কী রাখবা ঠিক করছ?'

রেনু বলল, 'তুমিই বলো।'

মুজিব বললেন, 'কামালের ভাইয়ের নাম তো জামালই রাখতে হবে শেখ জামাল। কী বলো?'

রেনু বললেন, 'খুব সুন্দর নাম।'

মুজিব বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। রেনু এলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে

পুলিশ অফিসার সালাম দিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

মুজিব উঠলেন। মুখে হাসি এনে বললেন, 'আসি, রেনু।'

গোপালগঞ্জের এক কর্মী চিৎকার করে কেঁদে উঠল। তার নাম শহীদুল ইসলাম সে চলে এল গাড়ির কাছে। এমন হাউমাউ করে কাঁদছে! মুজিব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেন কান্দিস? এ-ই তো আমার পথ। তবে আমি ঠিকই বাহির হব। তোর ভাবিকে দেখে রাখিস।'

মুজিবকে পুলিশ প্রথমে নিয়ে গেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে তিনি বসেই ছিলেন, কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে বললেন, 'কী করব বলুন। করাচি আপনাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পাগল হয়ে গেছে। আমরা জানি, আপনি জেলের ভয় করেন না। আপনাকে খবর দিলে আপনি নিজেই চলে আসবেন।'

ডিআইজি সাহেব এলেন। তিনিও খুব মোলায়েম ব্যবহার করলেন। বললেন, 'আপনার কি সিগারেট লাগবে?'

'জি না।'

'কী লাগবে, বলেন।'

'কিছু লাগবে না।'

'না, মানে আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?'

মুজিব বললেন, 'খুব বড় একটা উপকার হয়, যদি তাড়াতাড়ি আমাকে জেলে পাঠায়ে দিতে পারেন। আমি কাল রাতেও প্লেনে ঘুমাতে পারি নাই আজকে রাতে একটু শান্তিমতো ঘুমাতে চাই।'

৫০.

গণপূর্ত বিভাগের একজন লোক, তার মাথায় বড় টাক, টাকের নিচে একটা কালো দাগ, এসে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ছে।

রেনু বললেন, 'দেখ তো? কে ডাকে?'

গৃহপরিচারিকা মোমেনা, বয়স ১০, খুবই চঞ্চল, বাতাসের আগে ছোটে, দৌড়ে গেল দরজায়। এসে বলল, 'আপনেরে বুলায়।'

রেনু তাঁর শিশুপুত্র জামালকে কোলে নিয়ে গেলেন দরজায়। জামাল কাল সারা রাত ঘুমোতে দেয়নি।

দুপুরবেলা।

রেনু এগিয়ে গেলেন, 'কে?'

লোকটি বলল, 'আমি গণপূর্ত বিভাগ থেকে এসেছি, আপনারা কবে বাসা ছাড়বেন?'

রেনু শক্ত করে ফেললেন মুখ। 'কবে ছাড়ব? দুই সপ্তাহের মধ্যে ছাড়লেই তো হলো, নাকি?'

'জি। সেই কথাটাই বলতে এসেছিলাম। আপনারা ১৪ জুনের মধ্যে বাসা ছেড়ে দেবেন। ভাবি, আমার উপরে রাগ কইরেন না, আমি সরকারি কর্মচারী, আমি হুকুমের চাকর, আমার ডিউটি আমি করে গেলাম।'

'আচ্ছা যান। বলতে হবি না নে।'

'এই চিঠিটা একটু যদি সাইন করে নিতেন। সরকারি নোটিশ। এই জায়গায় একটু সাইন করে দেন।'

রেনু স্বাক্ষর করলেন। ফজিলাতুন্নেসা।

ইয়ার মোহাম্মদ খান আসেন। আল হেলাল হোটেলের মালিক হাজি হেলাল উদ্দিন আসেন।

রেনু বললেন, 'বাড়ি ছাড়ার তাগাদা দিয়ে গেছে। ভাড়া বাড়ি যে খুঁজে দিতে হয় ভাইসাব।'

ইয়ার মোহাম্মদ খান বললেন, 'আপনি একদম চিন্তা করবেন না, ভাবি আমরা সব দেখছি।'

বললেই হলো চিন্তা করবেন না! টাকাপয়সা হাতে নাই। এত বড় বাড়িতে একা একা বাচ্চাকাচ্চাগুলোকে নিয়ে থাকা। মুজিব কেমন আছেন-না-আছেন, জেলখানায় কী খাচ্ছেন-না-খাচ্ছেন, চিন্তা বুঝি হয় না! টুঙ্গিপাড়াতে আব্বা কেমন আছেন, মা-ই বা কেমন আছেন?

ইয়ার মোহাম্মদের পক্ষেও বাসা খুঁজে পাওয়া সহজ হলো না। কে নিবে বাসাভাড়া? শেখ মুজিব। শুনেই লোকে ভয় পায়। উনি তো জেলে। পুলিশ ওনাকে শুধু ধরে নিয়ে যায়। এখন তো আবার গভর্নরের শাসন। পরে কোনো ঝামেলা হবে না তো!

'বাড়ি পাওয়া গেছে।' ইয়ার মোহাম্মদ খান এসে বললেন।

'কোথায় পাওয়া গেল?'

'নাজিরাবাজারের গলিতে। ষাট টাকা ভাড়া।'

'পাওয়া যখন গেছে, চলেন। কালকেই উঠে পড়ি,' রেনু বললেন।

'মুজিব ভাইয়ের সাথে দেখা করে আসি, তারপর দুদিন পরে ওঠা যাবে। আপনি গুছায়া নেন।'

'আমার তো বেশি কিছু জিনিসপাতি নাই। আমি সব সময়ই জানতাম, এই বাড়ি আমার না। আপনার ভাইও এই লালবাড়িতে থাকতি পারবে না। তাকে জেলখানাতেই থাকতি হবে।'

'সে তো আমি জানিই ভাবি।'

৫১.

আজ রেনু যাচ্ছেন মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে জেলখানা গেটে।

ইয়ার মোহাম্মদ খান এসেছেন মিন্টো রোডের সরকারি বাসায়। ফজিলাতুন্নেসা ওরফে রেনুকে বললেন, 'ভাবি, চলেন।'

রেনু মাথায় শাড়ির আঁচল তুলে দিতে দিতে এগিয়ে এলেন, দেখলেন, ইয়ার মোহাম্মদের সঙ্গে একজন তরুণ এসেছেন।

তরুণটি তাঁকে সালাম দিলেন।

ইয়ার মোহাম্মদ পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ওর নাম তাজউদ্দীন। আওয়ামী লীগ করে। এবার এমএলএ হয়েছে।'

রেনু বললেন, 'নতুন মেহমান নিয়ে এসেছেন ভাইজান, একটু বসেন, আমি একটু দেখি নাশতা-পানির কী ব্যবস্থা করতে পারি।'

ইয়ার মোহাম্মদ বললেন, 'না না, ভাবি। আগে চলেন, মুজিব ভাইয়ের সাথে দেখা করে আসি। এখন আর ঝামেলা করবেন না।'

ইয়ার মোহাম্মদ জানেন, শেখ মুজিবের সহধর্মিণী স্বামীর মতো, অতিথিবৎসল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেনু এসেছেন ঢাকায়, এরই মধ্যে বংশালের বাসায়, মন্ত্রীর এই বাসভবনে মুজিবের সঙ্গে সকালে দুপরে রাতে তাঁকে খেতে হয়েছে কয়েকবার।

রেনু বললেন, 'তাইলে পান দিই, ছোড ভাইডি।' তাজউদ্দীন নাম বললেন না। 'ভাইডি আপনি পান খান তো!'

'জি, তাই দিন,' তাজউদ্দীন বিনীত ভঙ্গিতে বললেন।

হাসু, কামাল আর জামালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রেনু। হাসু হাত ধরল ইয়ার মোহাম্মদের, কামাল ধরল তাজউদ্দীনের আঙুল আর রেনুর কোলে জামাল। তারা রিকশায় উঠলেন। হাসুকে নিয়ে সন্তান কোলে রেনু উঠলেন এক রিকশায়, আর কামালকে কোলে বসিয়ে তাজউদ্দীন আর ইয়ার মোহাম্মদ উঠলেন আরেক রিকশায়।

'এই রিকশা, চলো জেলগেট।'

হাসু চোখ বড় বড় করে চেয়ে দেখছে ঢাকা শহর। এই শহরে তারা নতুন, আর বাড়ি থেকে তার বেরোনোও হয় খুব কম। বিকালবেলা। গির্জার ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজে। আকাশ মেঘলা। ভীষণ গরম। ভাপসা চারদিক। রিকশা চলতে শুরু করলে বাতাস এসে শিস দেয় দুই কানে। বাতাসটা হাসুর ভালো লাগে।

টুঙ্গিপাড়ার বাড়িটা কত বড় ছিল। চারদিক খোলা। কত বড় উঠোন। ঘরের চালে, আঙিনায় সারাক্ষণ পায়রা ডাকে বাকুম বাকুম। বাড়ির সামনে খুলি। সেখানে ধান শুকোনো হচ্ছে, খড়ের নাড়া নেড়ে দিচ্ছে কিষান। ওই দূরে বরইয়ের গাছ, দল বেঁধে ছেলেমেয়ের ছুটছে বরইগাছের দিকে, মাটির ঢেলা কি বাঁশের টুকরো ছুড়ে মেরে চলেছে বরই পাড়ার চেষ্টা। ওই যে ওইটা

পাকা, ওই যে ঝাঁকড়া ডালটার ওপরে, দেখ দেখ, ওইটাতে ঢিল লাগানো চাই। কুল যখন পেকে গেল সত্যি সত্যি, পাকার অবশ্য জো থাকে না, পাকার আগেই ঢিল মেরে সব সাফ, তবু দক্ষিণপাড়ার ঘন জঙ্গলের মধ্যে যে বরইগাছটা, যেখানে গেলে দিনের বেলায়ও গা ছমছম করে, একটা পুরোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে যেখানে, বেজি মাথা তুলে তাকিয়ে যেখান থেকে পর্যবেক্ষণ করে ছেলেমেয়েদের, সেখানে গেলে দেখা যায় পাকা কুল লাল হয়ে আছে। এত কুল যে গাছের পাতা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ধান শুকোনোর সময় পাখি আর মুরগি তাড়ানোর জন্য যে বড় চিকন বাঁশটা ব্যবহার করা হয়, সেটা নিয়ে গেলে আর ঢিল দেবার দরকার পড়ে না বাঁশের মাথায় একটা বাঁকা কঞ্চি থাকায় মূর্ধন্য ণ-য়ের মতো মনে হয় জিনিসটাকে, সেটা দিয়ে বরই পাড়া যায় কোছা ভরে।

তারপর বরইগুলো ছেনে কাঁচা মরিচ নুন, যদি জোগাড় করা যায়, একটুখানি সরষের তেল আর সামান্য হলুদ দিয়ে মাখতে হয়। উফ, কী যে তার স্বাদ!

কিন্তু দখিনপাড়ার জঙ্গলে যেতে ছেলেমেয়েরা ভয় পায়। ওখানে নাকি...

আরেকটা বরইয়ের গাছ আছে পুকুরের পাড়ে। সেই গাছে উঠে পড়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ। ডালটা ধরে দেয় ঝাঁকুনি। লাল টুকটুকে বরইটাই গিয়ে পড়ে পানিতে। যাই এখন রিকশায় মার পাশে বসে, মার কোলে বসা জামালকে একটুখানি আদর দিতে দিতে, হাসু ওই লাল বরইটার পানিতে ডুবে যাওয়ার স্মৃতি স্মরণ করে, আর কী যে তার দুঃখ হয়! এই বৈশাখ মাসেও তারা আম পেড়ে খেয়েছে। ছোট ছোট আম। একটা গাছ ছিল কাঁচামিঠা আমের। সেই আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সরষে বাটা, লবণ আর কাঁচামরিচ মেখে কলাপাতা দিয়ে তিন কোনা পানের খিলির মতো বানিয়ে যে-ই না তুমি মুখে দিয়েছ, আহ্, স্বর্গ!

টুঙ্গিপাড়াই তো ভালো ছিল। রিকশার পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়ার কান নাড়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাসু ভাবল, আহা রে, আমাদের টুঙ্গিপাড়ার বড় নৌকাটা এখন ঘাটে বাঁধা আছে। কত বড় নৌকা, তাতে দুটো ঘর, জানালাও বড় বড়। নৌকার হালটা পেছনে, দাঁড় দুটো সামনে। আর ছোট্ট ডিঙি নৌকাটা! ওটা তো দুজনে মিলে বাওয়া যায়। কত চড়েছে হাসু ওটায়।

পাটখেতের ভেতর দিয়ে ওই নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়ানোর দিন কি তবে শেষ হয়ে এল?

প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিনটাও মনে পড়ে। খাল পেরোতে হবে, খালের ওপরে একটা বাঁশের চিকন সাঁকো, পায়ের নিচে একটা বাঁশ, মাথার কাছে ধরার জন্য একটা বাঁশ, এক হাতে বই-খাতা, যাও, এখন সাঁকো পার হও। সঙ্গে ছিল তিন বছরের বড় ফুপু, তিনি বললেন, বই-খাতা আমাকে দাও, তুমি আমার এই হাতটা ধরো, ওই হাত দিয়ে বাঁশ ধরো। ভয়ে ধুকপুক করছিল জানটা এরপর ভয় গেল ভেঙে, সবার আগে তো ছুটে যেতে পারে হাসুই

শীতের ভোরে ঘুম থেকে জেগে লাল আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে ছুটে যাওয়া ঘুমন্ত নদীর ধারে। কুয়াশায় ঢেকে আছে চরাচর, ঘাসের ডগায় শিশির, পা ভিজে যাচ্ছে। নদীর পানিতে পা ডোবাও, ও মা, কী উষ্ণ পানি! দুপুরবেলা ছুটে যাও নদীতে, গোসল করতে, কলার গাছ কিংবা জোড়া নারকেল ধরে সাঁতরে চলো ওই কচুরিপানাটা পর্যন্ত। গোসল করতে করতেই দুজনে গামছা ধরে পানি ছাঁকলেই উঠে আসছে টেংরা কিংবা পুঁটি কিংবা বেলে মাছ। আর ওই ওখানে, ডোবানো নৌকাটার পাশে, যেখানে কচুরিপানা ঘন হয়ে আছে, পানি কালো, দুটো কড়ই গাছ পড়ে আছে কালো কালো পাতাবিহীন ডালপালাগুলো আকাশের দিকে তুলে ধরে, ওইখানে চলো, একটা কচুরিপানার ঝাঁক তুলে তীরে আনো, পানার নিচের কালো চুলের মতো ঝোলানো শিকড় থেকে পানি টপটপ করে ঝরে পড়ছে, ওই দেখো, একটা বাইন মাছ। কিংবা কই মাছ পড়ল একটা, লাফাচ্ছে কী রকম তড়বড়িয়ে।

একদিন বাইনের বদলে উঠে এল একটা সাপ।

উরে বাবা!

রিকশা এসে পৌঁছাল জেলখানার প্রধান গেটে।

রেনু বললেন, হাসু, নামো। হাসু টুঙ্গিপাড়ার মধুর স্মৃতির ঘোর থেকে ফিরে এল বর্তমানে।

রেনু নামলেন।

ইয়ার মোহাম্মদ এগিয়ে এসে রিকশাভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ভেতরে চললেন।

দেখা করার পারমিশন আছে ইয়ার মোহাম্মদের, রেনু আর বাচ্চাদের; তাজউদ্দীনের নাই।

তাজউদ্দীন বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

১৯৫৪ সাল, ৫ জুন।

মুজিবের সঙ্গে দেখা হলো রেনুর, ইয়ার মোহাম্মদের, বাচ্চাদের। ইয়ার মোহাম্মদ দ্রুত কুশলাদি সারলেন।

মুজিব বললেন, 'রেনু, কী ঠিক করেছ? টুঙ্গিপাড়া যাবা?'

রেনু বললেন, 'বাবা-মাই তো আসতিছে। কী করে যাব।'

মুজিব বললেন, 'ইয়ার মোহাম্মদ ভাই, তাহলে রেনুর জন্য একটা বাসা ভাড়া করে দেন।'

ইয়ার মোহাম্মদ বললেন, 'আমি লোক লাগায়া রাখছি। পাওয়া যায় না দেখা যাক। হবে।'

'আর কী অবস্থা? নেতা-কর্মীরা কোথায়?'

'আগামীকাল মিটিং আছে। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির। আবু হোসেন সরকারের বাড়িতে জড়ো হব। সেখান থেকে যাব সিমসন স্ট্রিটের পার্টি অফিসে। দেখা যাক কী হয়, আমরা ৯২/ক মানব না। আমি বাইরে যাই। আপনি ভাবি আর বাচ্চাদের সাথে কথা বলেন।'

ইয়ার মোহাম্মদ বেরিয়ে এলেন ভিজিটরস রুম থেকে।

মুজিব বললেন, 'হাসু, কামাল, কেমন আছো?'

হাসু বলল, 'ভালো আছি।'

কামাল বলল, 'আব্বা, আপনি বাড়ি আসেন না কেন?'

রেনু বলল, 'তুমি বড় রোগা হয়ে গেছ।'

মুজিব বললেন, 'ঠিক মোটা হয়ে যাব। জেলখানার খাওয়া ভালো। কাজকর্ম নাই। তবে মনে হয় ডাকাতি ও খুন করার চেষ্টা, লুটতরাজ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা—এই অভিযোগ দিয়েছে। আবার এই মামলায় যদি জামিন পাই, সেই ভয়ে নিরাপত্তা মামলাও দিয়েছে। তো ক্রিমিনাল চার্জ যখন দিয়েছে, কিছু কাজ করতে হতে পারে। আগের বার তো বাগান করেছিলাম, ফুলগাছ লাগিয়ে ছিলাম। এবার দেখি, কী কাজ করা যায়।'

হাসু বলল, 'আব্বা, কী ফুলগাছ লাগাবেন?'

মুজিব বলল, 'কী ফুলগাছ! দেখি মা। রেনু, টাকাপয়সা সব শেষ?'

রেনু বললেন, 'না, ইয়ার ভাই, হাজি সাব এনারা কিছু দিয়েছেন। আমিও ব্যবস্থা করেছি।'

'কী ব্যবস্থা?'

'তোমাকে আমাদের নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হবে না নে। তুমি ভালো থেকো, তাহলেই হবে।'

হাসু বলল, 'মা, একজোড়া চুড়ি বিক্রি করে দিয়েছে। খোকা কাক্কু নিয়ে গেছে।'

রেনু বলল, 'ওগুলোর ডিজাইন পছন্দ না। আমি আরেক জোড়া

পছন্দমতো গড়তে দিব।'

মুজিব ম্লান হাসলেন। বললেন, 'আমি তো কোনো দিনও তোমাদের খোঁজখবর করতে পারি নাই। চিরকাল তুমিই আমাকে টাকা দিয়েছ। কোনো দিন আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি নাই। এখন ঢাকায় এসেছ। কষ্ট হবে। আমি জানি, তুমি সামলায়া নিতে পারবা।'

বরাদ্দকৃত সময় শেষ হয়ে এল।

ছলছল চোখে সন্তান কোলে বেরিয়ে এলেন রেনু, বেরিয়ে এল হাসু, জামাল।

বেরিয়ে এসে দেখলেন, তাজউদ্দীনও নাই, ইয়ার মোহাম্মদ খানও নাই

রেনু বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকালেন।

গেল কই?

হঠাৎ কোথা থেকে একটা ছাতা দিয়ে মাথা ঢেকে তাজউদ্দীন এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'সরি ভাবি। ইয়ার মোহাম্মদ খানকে অ্যারেস্ট করল এখনই। আমি তাই সটকে পড়েছিলাম। তাড়াতাড়ি চলেন। সরকার পাগল হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের, গণতন্ত্রী দলের, যুবলীগের লোক দেখলেই অ্যারেস্ট করছে।'

তাঁরা দ্রুত হেঁটে খানিকটা দূরে এসে রিকশা পেয়ে গেলেন।

আতাউর রহমান খানও দেখা করলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে, জেলগেটে একই দিনে।

মুজিব বললেন, 'রহমান সাহেব, আমাদের উচিত প্রতিবাদ করা। সবাই মিলে আইন অমান্য করেন। অ্যারেস্ট হন। এতগুলান এমএলএ একযোগে অ্যারেস্ট হলে বড়লাট এমনিতেই বাপ বাপ করে ৯২/ক প্রত্যাহার করে নিবে।'

আতাউর রহমান বললেন, 'দেখা যাক। আগামীকাল তো এমএলএ সবাইকে ডাকা হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের সবাইকে। আমরা দেখি, এই ডিসিশন নিতে পারি কি না। আমি নেওয়ার পক্ষে। কিন্তু হক সাহেবের মতিগতি তো ভালো ঠেকছে না। উনি তো খুব ভয় পেয়ে গেছেন।'

মুজিব বললেন, 'তাহলে আমরা নতুন লিডার নির্বাচন করব।'

আতাউর রহমান বললেন, 'হ্যাঁ, তা করা যায়। আবু হোসেন সরকার, আশরাফুদ্দীন, সালাম খান আর আমি—চারজন হয়তো লিডার হওয়ার জন্য কনটেস্ট করতে পারি।'

মুজিব বললেন, 'খান সাহেব, কী বলব, যে কয়দিন মন্ত্রী ছিলাম, বেতন

তো কিছু পাওনা হয়েছে। টিএ-ও পাওনা হওয়ার কথা। রেনুর হাত তো পুরাটাই খালি। টাকাপয়সা কিছু নাই। আপনি কি আমার বেতন-টিএ তোলার ব্যবস্থা করে রেনুর হাতে টাকাটা পৌঁছে দিতে পারেন?'

আতাউর রহমান বললেন, 'আমি অবশ্যই এই কাজটা করে দেব।'

মুজিব বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে কীসব ডাকাতি, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট—এইসব অভিযোগ দিয়েছে। আপনি জামিনের আবেদন করুন।'

আতাউর রহমান খান ওকালতনামা বের করে দিয়ে বললেন, 'আমি কেস ফাইল করছি। আপনি এখানে একটু স্বাক্ষর করে দিন।'

মুজিব স্বাক্ষর করলেন। আতাউর রহমান সাহেব বিদায় নিলেন।

পুরো আলাপটা শুনে নোট নিলেন একজন গোয়েন্দা কর্মচারী। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর রিপোর্ট জমা পড়ল গোয়েন্দা কার্যালয়ে।

নাজিরাবাজারের গলিতে এক[illegible]রের বাড়ি। ষাট টাকা ভাড়া।

হাসু খালি বাসার এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে দেখতে লাগল। কামালও রইল সঙ্গে সঙ্গে। কামাল হঠাৎ জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হাসু আপা, হাসু আপা, দেখো দেখো ওইটা কী?'

একটা বাঁদর বসে আছে পাশের বাড়ির ছাদে। তার কোলে একটা বাচ্চা বাঁদর।

'মা মা, দেখে যাও,' হাসু চিৎকার করে উঠল।

রেনুও এলেন। জানালা দিয়ে তাকালেন।

'ওই দেখো মা, একটা মা-বাঁদর আর তার বাচ্চা।'

বাঁদরটা চার পায়ে হাঁটতে লাগল আর বাচ্চাটা তার বুকের কাছটা ধরে ঝুলেই রইল। রেনু বললেন, 'মা রে, আমার কি আর এইসব দেখার সময় আছে। আমারে পুরা বাড়িঘর গোছাতি হবে। চুলা ধরাতে হবে।'

অন্ধকার নেমে আসছে। গলির ভেতরে হয়তো একটু তাড়াতাড়ি নামে।

মোমেনার কোলে জামালকে দিয়ে রেনু লেগে পড়লেন ঘরদোর গোছাতে।

৫৩.

রাতের বেলা ঢাকার বাসা থেকে সরে থাকলেন তাজউদ্দীন। আশ্রয় নিলেন তাঁর এক অরাজনৈতিক বন্ধুর বাড়িতে। আজ রাতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিতে পারে।

রাতের বেলা রেডিওর খবর শুনলেন।

জানতে পারলেন সব। আগে থেকেই অবশ্য অনুমান করা যাচ্ছিল, ঢাকা শহরে নানা গুজবও ভেসে বেড়াচ্ছিল। হক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, জারি করা হয়েছে ৯২-ক ধারা। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সচিব মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। নিয়াজ মোহাম্মদ খানকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ সেক্রেটারি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

রাত ১১টার খবরে জানতে পারলেন, ফজলুল হক সাহেবকে করা হয়েছে গৃহবন্দী আর গ্রেপ্তার করা হয়েছে শেখ মুজিবকে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া রেডিওতে ভাষণ দিয়েছেন। তাজউদ্দীন সেটা সরাসরি শোনেন নাই। রেডিওর খবরে বারবার সেটার কথা বলা হচ্ছে।

মোহাম্মদ আলী বগুড়া তাঁর ভাষণে বলেছেন, ফজলুল হক মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ অযোগ্য। দেশের প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনায় দাঙ্গায় বহু মানুষ মারা গেছে, তা প্রতিরোধ করতে তো পারে নাই, আবার বলে যে, এটা কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টকে ব্যর্থ প্রমাণ করার জন্য নিজেরা ঘটিয়েছে। আমি অনেকবার বলেছি, পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্টরা সক্রিয়, আর এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামা তারা ঘটিয়েছে, ফজলুল হক ততই বলে, পূর্ব বাংলায় কোনো কমিউনিস্ট নাই। ফজলুল হকের মানসিক ভারসাম্যও নষ্ট। তিনি কলকাতায় গিয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, *নিউ ইয়র্ক টাইমস* আর রয়টার্সকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বলেছেন, পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করতে হবে, তারপর সেই সাক্ষাৎকারকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন এবং এর তিন দিনের মধ্যেই আমার সঙ্গে বৈঠককালে

তিনি আবার বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে একটা স্বাধীন পূর্ব বাংলা। এ কে ফজলুল হক পাকিস্তানের জন্য একটা অভিশাপ আর বিরাট বিশ্বাসঘাতক।

জ্যৈষ্ঠের কাঁঠালপাকা গরমে একটা হাতপাখা নাড়তে নাড়তে তাজউদ্দীন বিড়বিড় করেন, কে কাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে?

এই লোক না কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সোহরাওয়ার্দীর অফিস সেক্রেটারি ছিল। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভাতেও অবশ্য ঠাঁই পেয়েছিল সে।

তাজউদ্দীন বিছানায় বসে রেডিওর খবর শুনছিলেন। এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। এইসব সমস্যার একটাই সমাধান, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা, পায়চারি করতে করতে তিনি বললেন। সেটাই আমাদের অর্জন করতে হবে প্রস্তুতি নিয়ে, সময়-সুযোগমতো।

৫৪.

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি কথা বলছে। ব্যাঙ্গমা বলল,

পাকিস্তানি শাসক ও সঙ্গী আমেরিকা।
অ্যাকশন যা নিয়েছে তা ইতিহাসে লিখা ॥
কমুনিস্ট ধরো মারো এই লক্ষ্য নিয়া।
হক-সরকার উৎখাতিল নাইনটু দিয়া ॥
মেজর জেনারেলে লাটসাহেব বানায়।
দশ হাজার সৈন্য তারা পাঠায় বাংলায় ॥
পাইকারি গ্রেপ্তার চলে কমুনিস্ট ভেবে।
আওয়ামী লীগেও তারা একহাত নেবে ॥
আমেরিকা সব জানে, চুক্তি হবে আরো।
দুই দিকের বন্ধুত্ব হবে আরো গাঢ় ॥
সিয়োটা ও সেন্টো চুক্তি পাক ও মার্কিনে।
স্বাক্ষরিত হলো, তারা নিল ঘাড় কিনে ॥
কমুনিস্ট পার্টি ব্যান্ড হলো দুই পাকিস্তানে।
মার্কিনি তারার সাথে হাসে পাকি চানে ॥

ব্যাঙ্গমি বলল, 'শুনো, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পূর্ব বাংলার লাটসাহেব হইয়া যে ভাষায় কথা কইলেন, আর যেভাবে ফজলুল হক সরকার উৎখাতের আগে পশ্চিম পাকিস্তান থাইকা পূর্ব বাংলায় ১০ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন, সেইটা কিন্তু আমারে ভবিষ্যতের কথা মনে করায় দিতেছে।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'কী রকম, কী রকম?'

ব্যাঙ্গমি হেসে বলল, 'সবই জানো। কেন রঙ্গ করো। আজ থাইকা ১৭ বছর পরে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে এইভাবেই সৈন্য পাঠানো হইব, পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দেওনের লাইগা আর আমেরিকা তাগো সাপোর্ট দিব। আজকা মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা বইলা বেড়াইতেছেন, দরকার হইলে পূর্ব বাংলার প্রতিটা গ্রামে সৈন্য পাঠানো হইব, ৯২-ক ধারার বিরুদ্ধে কেউ কিছু কইলে সেইটা সহ্য করা হইব না। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার লাইগা আমি যে কুনু কিছু করতে রাজি আছি, দরকার হইলে আমি ১০ হাজার বাঙালি হত্যা করুম, এই ঘোষণা সে দিছে না? আর ১৭ বছর পর তার ফলোয়াররা ৩০ লাখ বাঙালি হত্যা করব।

'আর সে কী কয়? ইস্কান্দার মির্জা কয়, ভাসানী দেশে ফেরামাত্র তারে এয়ারপোর্টেই গুলি করা হইব। সে নাকি তার সবচেয়ে ভালো হাবিলদার শ্যুটাররে পাঠাইব বিমানবন্দরে। ভাসানী গেছেন বিলাতে। বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগ দিতে। অহন ফিরবেন কেমনে?'

৫৫.

তাজউদ্দীনকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে। সরকার উন্মাদ হয়ে গেছে। নির্বিচারে কমিউনিস্ট ধরার নাম করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, গণতন্ত্রী দল—শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে জেলে পুরছে। আর জেলখানায় করছে অকথ্য নির্যাতন। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে নিরাপত্তা আইনে, বিনা বিচারে আটক রাখার কুখ্যাত আইন। তিন মাসের বেশি বিনা বিচারে আটক রাখা যায় না, তাই তিন মাস পরে নামমাত্র ছেড়ে দিয়ে জেলগেট থেকে আবার

গ্রেপ্তার। এই চলছে ১৯৪৮ সাল থেকেই, কমিউনিস্টদের বেলায়। মুজিব ভাই, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহার মতো রাজনৈতিক নেতা, কিংবা মুনীর চৌধুরীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকেরা জেলে আছেন এইভাবেই।

তাজউদ্দীন এখনো পর্যন্ত সব সময়েই গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকতে পেরেছেন। এরপর থাকতে পারবেন কি না, তা-ই ভাবছেন। তাঁর এই গোপন আস্তানা, তাঁর এক আত্মীয়র বাড়ির ঘরে বসে তিনি এইসব ভাবেন।

বাড়িটা ঢাকাতেই, এই বাড়িতে তিনি এর আগে কখনো রাত কাটাননি ঢাকার বিখ্যাত গোলাপবাগানের পাশে তাঁর এই গোপন আশ্রয়। তিনি জানালা দিয়ে বাগান দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন ফুল আর নানা লতাগুল্মের বাহার

সারাক্ষণ অবশ্য বাসায় বসে থাকেন না তাজউদ্দীন। মাঝেমধ্যে বেরিয়ে পড়েন সাইকেলটা নিয়ে, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী আর ভাবির খোঁজ তাঁকে নিতে হয়। এটা তাঁর দায়িত্ব। বড় ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে তিনি এই দায়িত্ব পালন করছেন। বন্দী নেতাদের খোঁজখবরও নেন তিনি। তাঁদের পরিবারের খোঁজ। মুজিব ভাবির কাছে যেতে হয়। তিনটা ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে তিনি থাকেন ঢাকায়। ঢাকায় তাঁরা নবাগত। তাঁদের কুশলাদি জানাও তো তাজউদ্দীনের কর্তব্য।

শেখ মুজিবকে এখন মুজিব ভাই বলেই সব সময় ডাকেন তিনি। এমনকি তিনি যে রোজ ডায়েরি লেখেন, যেখানে আগে শেখ মুজিব বলে অভিহিত করতেন এই নেতাটিকে, ইদানীং লিখছেন মুজিব ভাই। শেখ মুজিবের বিষয়ে ক্রমাগত তাঁর দ্বিধা কেটে যাচ্ছে, তাঁর ওপরে আস্থা বাড়ছে। বিশেষ করে, যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন দানের সময় শেখ মুজিবের ভূমিকা তিনি দেখেছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব পশ্চিমা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, নৈশক্লাবে যাতায়াত করা মানুষ। তিনি কমিউনিস্টদের নমিনেশন দিতে চান না।

তাজউদ্দীন *ইত্তেফাক*-এর সাংবাদিকের কাছে শুনেছেন সোহরাওয়ার্দীর মনোনয়ন দেওয়ার সময়কার ঘটনা। দিনাজপুরের মনোনয়ন প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে সেদিন। সোহরাওয়ার্দীর হাতে জেলা আওয়ামী লীগের পাঠানো মনোনয়নপ্রার্থীদের তালিকা। তিনি নামগুলো মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। একটা নামের দিকে তার চোখ পড়ল। এই লোক তো আওয়ামী লীগের না। এ কোত্থেকে এসেছে!

তিনি ডাকলেন আওয়ামী লীগের দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি রহিমউদ্দীন উকিলকে। তাঁকে ওই নামটা দেখিয়ে বললেন, 'মে আই আস্ক ইউ হু ইজ দিস জেন্টলম্যান?'

রহিমউদ্দিন উকিল কোনো জবাব দিলেন না।

এবার তিনি ডাকলেন সেই সন্দেহভাজন ভদ্রলোককে।

তাঁকে বললেন, 'আপনি কি দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি?'

'জি হ্যাঁ।'

'তাহলে তো আপনাকে নমিনেশন দিতেই হবে। তবে হামাকে একটা সত্য কথা বলুন।'

'কী বিষয়ে?'

'হামি বলতে চাই, আপনের মতো হামার পার্টিতে আর কতজন ঢুকেছেন?'

'জি মানে। প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না।'

'আপনে ঠিকই বুঝেছেন। হামি কমিউনিস্টদের কথা বলছি।'

সেই কমরেডকে নমিনেশন দেওয়া হয়নি। তবে শেখ মুজিব বাম বলে কথিত, কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলে পরিচিত অনেককেই নমিনেশন পাইয়ে দিয়েছেন। মুজিব ভাই বলেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই। কিন্তু সমাজতন্ত্র যে বৈষম্যমুক্তির পথ, সেটা আমিও বিশ্বাস করি। আর আমি বিশ্বাস করি অসাম্প্রদায়িকতায়। যদিও আমি মুসলমান।'

শেখ মুজিব আর মওলানা ভাসানীই যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন তালিকায় বেশ কয়েকজন বামপন্থীকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ঢুকিয়েছেন।

মুজিব ভাই চেয়েছিলেন নির্বাচিত সরকার উৎখাতের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচিত এমএলএরা প্রতিবাদ করুন। ৬ জুন যুক্তফ্রন্টের অফিসে সব এমএলএর দুপুর দুইটায় সমবেত হওয়ার কথা। জানা গেল, পুলিশ ফ্রন্ট অফিসের পুরোটাই ঘিরে রেখেছে। তখন সবাই সমবেত হলেন আবু হোসেন সরকারের বাড়িতে।

যুক্তফ্রন্টের যে এমএলএরা জেলখানার বাইরে ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই সমবেত এই বাড়িতে।

আবুল মনসুর আহমদ আর আবদুস সালাম খান বেরিয়ে পড়লেন একটা জিপ নিয়ে। প্রথমে গেলেন সিমসন রোডের ফ্রন্ট অফিসে। গিয়ে দেখলেন, অফিসে পুলিশ তালা ঝুলিয়েছে। তারা এগিয়ে গেলে পুলিশ বাধা দিল। একজন অফিসার একটা সরকারি নোটিশ দেখিয়ে, বললেন, 'এখানে কোনো সভা করতে দেওয়া হবে না।'

ফজলুল হক সাহেব পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে বাড়ির বাইরে এলেন। পুলিশ বলল, 'আপনি গৃহবন্দী, আপনার বাইরে যাওয়ার অনুমতি নাই।' তিনি রাগে গজরাতে গজরাতে ঘরে ফিরে গেলেন।

আবু হোসেন সরকারের সরকারি বাড়িতেই সভা শুরু হলো।

সভাপতিত্ব করলেন চৌধুরী আশরাফউদ্দিন আহমদ।

কেন্দ্রীয় সরকারের ৯২-ক ধারা জারির অনিয়মতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক, অন্যায় কাজের নিন্দা করা হলো। ফজলুল হককে অন্তরীণ করা আর শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে গৃহীত হলো প্রস্তাব।

আতাউর রহমানের নেতৃত্বে একটা আহ্বায়ক পরিষদ গঠিত হলো সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার জন্য।

এই সময় পুলিশ এসে এই বাড়িতেও হানা দিল। সভা ভেঙে গেল অবিলম্বে।

আবুল মনসুর আহমদসহ কয়েকজন এমএলএ দেখা করতে গেলেন ফজলুল হকের সঙ্গে।

আবুল মনসুর পরে বলেছেন তাজউদ্দীনকে, 'হক সাহেবকে তো কিছুই বোঝা যায় না। তাঁকে মনে হয় বার্ধক্যে পেয়ে বসেছে। আমরা বললাম, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত আমরা মানব না। সকল এমএলএ গ্রেপ্তার বরণ করব। তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সাত দিনের মধ্যে আবার আপনাকে প্রধানমন্ত্রী পদ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। আমরা ডাক দিলে দেশের সব মানুষ রাস্তায় নেমে আসবে। হক সাহেব বললেন, এইভাবে বিপ্লব হয় না। জেলে গিয়ে কী লাভ। গ্রামে যাও, থানাপুলিশ আক্রমণ করো, সশস্ত্র বিপ্লব করো। আমার পক্ষে গ্রেপ্তার হওয়া সম্ভব না। আমরা বুঝলাম, তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন। বোধ হয়, মাথাও একটু খারাপ হয়ে গেছে।'

ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমি বলাবলি করল, প্রায় একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে ১৭ বছর পর, যখন শেখ মুজিব এই নির্দেশই দেবেন বাংলার মানুষকে, বলবেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো, তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব, মরতে যখন শিখেছি কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, বাংলার মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।'

তাজউদ্দীনের কাছে একটা চিঠি এসেছে। আজ সকালে একজন কর্মী চিঠিটা তাঁকে দিয়ে গেছে। চিঠিতে অবশ্য প্রাপকের নাম তারেক, প্রেরকের নাম রহমত। দেখেই তাজউদ্দীন বুঝলেন জেলখানা থেকে কৌশলে চিঠি পাঠিয়েছেন অলি আহাদ। অলি আহাদ নিজের নাম নিয়েছেন রহমত। তাজউদ্দীনের ছদ্মনাম তারেক।

অলি আহাদ আর কারাগারে থাকতে নারাজ। বহুদিন হলো তিনি কারাগারে। দাসখত দিয়ে মুক্তি তিনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি দাসখত দিতে নারাজ। তাই তাঁর মুক্তির আশাও সুদূরপরাহত। তবু তিনি চান, তাঁকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্যই তিনি তাজউদ্দীনকে চিঠি লিখেছেন। এর আগেও একটা চিঠি অলি আহাদ লিখেছিলেন। তাজউদ্দীন তার উত্তর দিতে পারেননি। জেলখানায় চিঠি পাঠানো সহজ নয়। তার চেয়ে বড় কথা, তাজউদ্দীন গ্রেপ্তারবরণ করতে চান না। এমন নয় যে, গ্রেপ্তার হওয়াটাকে তিনি ভয় পান। দেশের সেবা করতে চাইলে কিছু মূল্য তো দিতে হতেই পারে। ভাষাশহীদেরা মাতৃভাষাকে ভালোবেসে চরম মূল্য দিয়ে গেছেন। মুজিব ভাইয়ের নিষেধ আছে গ্রেপ্তার হওয়ার ব্যাপারে। এর আগে অন্তত দুইবার মুজিব ভাই তাঁকে বলেছেন, গ্রেপ্তার হোয়ো না। কাজেই অলি আহাদের চিঠির জবাব লিখতে হবে, এটা যেমন কর্তব্য, তেমনি তাজউদ্দীনের কর্তব্য বোকার মতো ধরা না পড়া।

তিনি অবশ্য অলি আহাদের মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আতাউর রহমান খানের সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেছেন।

তাজউদ্দীন এখন বসে বসে সেই চিঠির উত্তর লিখছেন। বৃষ্টি হতে শুরু করল। জানালা দিয়ে তিনি দেখতে পাচ্ছেন বাগানের পত্রপুষ্পের গায়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ঝরছে। বুলবুল পাখিগুলো সব উড়ে কোথায় চলে গেল।

তিনি লিখলেন :

প্রিয় রহমত,

সকালে আপনার পত্র পেলাম। আমি খুবই দুঃখিত। আপনার এর আগের চিরকুটটির উত্তর দিতে পারিনি বলে অপরাধ মানছি। কিন্তু আপনি নিশ্চিত জানবেন, আপনার মতামতের প্রতি আমরা খুবই আগ্রহী। আমার অনুরোধে আর নিজের আগ্রহে আতাউর রহমান খান সাহেব চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে আপনার মামলার বিষয়ে কথা বলেছেন। মি. খান প্রায়ই যান চিফ সেক্রেটারির কাছে, রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলেন, বিশেষ করে কথা বলেন আওয়ামী লীগের রাজবন্দীদের ব্যাপারে। আপনার আর মি. তোয়াহার মুক্তির ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ আছে। নেজামে ইসলামী আর কৃষক শ্রমিক পার্টির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে আপনার চিঠি কামরুদ্দীন সাহেব আমাকে দেখিয়েছেন। আমি আতাউর রহমান খান সাহেবকে

আপনার মত জানিয়েছি। তিনি আপনার মতের প্রশংসা করেছেন। আপনি হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, বন্যা ত্রাণ কমিটিতে অবাঞ্ছিত লোকদের প্রাধান্য কমিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এমনভাবে চলতে হবে, যাতে যুক্তফ্রন্টের সংহতি বিনষ্ট না হয়। অন্তত বাইরের কেউ যেন না বোঝে, যুক্তফ্রন্টে কোনো বিভেদ আছে। আমাদের নির্দোষ শুভাকাঙ্ক্ষী কিংবা ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুদের কাউকেই তা জানতে দেওয়া উচিত নয়। আজ এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আপনার উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা আপনার খারাপ বন্ধুরাও (বললাম না শত্রুরা) অনুভব করবে।

পূর্ব বাংলা সরকার আর আতাউর রহমান খান সাহেবের মধ্যেকার আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে, সরকার আওয়ামী লীগের ব্যাপারে সদয় হবে। কিন্তু পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, যুবলীগ আর গণতন্ত্রী দলের লোকদের ব্যাপারে তারা কঠোর হবে। ভুল হোক, আর ঠিক হোক, এই তিনটা দলকে তারা মনে করে কমিউনিস্ট পার্টির অনুসারী। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে, সরকার মনে করে, ছাত্র ইউনিয়ন হলো কমিউনিস্ট পার্টির রিক্রুটিং সংগঠন, যুবলীগ তাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র আর গণতন্ত্রী দল হলো তাদের পার্লামেন্টারি শাখা। এ হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশ্লেষণ।

তোয়াহা সাহেব আওয়ামী লীগার, আবার যুবলীগেরও লোক। ইয়ার মোহাম্মদ খানও তাই। সুতরাং আমরা সবাই মনে করি, আপনার আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা উচিত। তত দিন পর্যন্ত, যত দিনে সরকারি কর্মকর্তারা বুঝতে পারে যে তাদের ঈর্ষান্বিত ও পদোন্নতিকামী আইবি-কর্তারা যা রিপোর্ট করেন, স্বর্গ ও মর্ত্যে তার বাইরেও আরও কিছু থাকতে পারে। আমরা মনে করি, শিগগিরই সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। আমি আপনার অসুবিধা বুঝতে পারছি, কিন্তু এই তো আমাদের নিয়তি বা আমরা তো এই পথই বেছে নিয়েছি, যে পথে শুধুই কাঁটা। দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে পারে না। তাদের অকৃত্রিম দেশপ্রেম মানবতাবাদীদের চিরকাল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। কোনো নির্যাতনই তাদের সত্যের পথ থেকে তাদের সরাতে পারে না।

মওলানা (ভাসানী) সব সময়েই চান দ্রুত আত্মপ্রকাশ করতে, ঠিক আপনারই মতো। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী মওলানাকে বলেছেন তিনি পাকিস্তানে না আসা পর্যন্ত যেন মওলানা দেশে না আসেন। আমরা

আপনার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আমাদের মত হলো, আপনি সোহরাওয়ার্দীর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। দু সপ্তাহ আগে তাঁর অপারেশন হয়েছে। তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাঁর লেখা চিঠি আমি আতাউর রহমান খান আর কামরুদ্দীন সাহেবের কাছে দেখেছি। দয়া করে বিশ্রাম নিন আর অপেক্ষা করুন। আপনি তো সব সময়ই পিলারের মতো শক্ত। আমাদের বিশ্বাস, আপনি সব কষ্ট সহ্য করবেন এবং হতাশায় নিমজ্জিত হবেন না।

তারেক

এ পর্যন্ত লিখে ফের লিখলেন—পুনশ্চ : এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না।

চিঠিটা এখন জেলখানায় পৌছাতে হবে।

একটা কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাজউদ্দীনকে। জেলখানার প্রহরীরাই চিঠি আদান-প্রদান করে থাকে। তাজউদ্দীনের সূত্র জানা আছে। যেভাবে এসেছিল অলি আহাদের চিরকুটগুলো, সেভাবেই চিঠিটা পৌছাতে হবে তাঁর হাতে।

৫৬.

শেখ লুৎফর রহমান, সায়রা বেগম, তাঁদের ছেলে শেখ আবু নাসের আর ভাতিজা আবুল হোসেন এসেছেন ঢাকায়। নাজিরাবাদের বাড়িতে এসে পৌছুলেন তাঁরা। সারা রাত কষ্টকর জার্নি। পাটগাতী পর্যন্ত নৌকায়। তারপর স্টিমার। স্টিমার সদরঘাটে থামল। সেখান থেকে ঠিকানা হাতে করে এই ৭৯ নাজিরাবাজার লেন। ভোরবেলা এসে পৌছালেন তারা।

তখন রেনু উঠে নামাজ সেরেছেন। কাল সারা রাত ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়েছে। ভোরের দিকে বৃষ্টি থেমে গেছে।

এই সময় দরজায় করাঘাত।

রেনু জানতেন, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি আসবেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

হাসু কামালও জানত, ভোরবেলা দাদা-দাদি আসবেন। দরজায় একটু শব্দ হতেই তারা ঘুম থেকে উঠে খালি পায়ে দরজার কাছে চলে এল।

দাদা-দাদিকে কাছে পেয়ে হাসু আর কামাল যেন আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল।

দাদি বললে, 'কেমন আছো, বুবু?'

হাসু বলল, 'এখানে ভালো লাগে না দাদি। আমাদের টুঙ্গিপাড়া অনেক ভালো।'

দাদি হাসুর জন্য আম এনেছেন। গাছের পাকা আম।

আমের ঝুড়িটা খুললেন তিনি। ধানের বিচালির মধ্যে রাখা আম।

হাসু বলল, 'দাদি, তুমি পাকা আম এনেছ? কাঁচা আম আনতে পারলা না। ছোট ছোট কাঁচা আম?'

দাদি বললেন, 'এখন জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে আষাঢ় মাস, এখন ছোট কাঁচা আম পাওয়া যায় না, বুবু।'

রেনু তাঁর শাশুড়ির হাত ধরে বললেন, 'হাসুবুড়ির পটর-পটর কথা শুনেছেন। ওরা যে সারা দিনে কত কী বলে?'

শেখ লুৎফর রহমান সাহেব বললেন, 'আমাদের খোকার সাথে দেখা করার টাইম কখন? তোমরা রেডি হয়ে নাও। খোকা কই? মমিনুল হক খোকা?'

রেনু বললেন, 'ও তো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হোস্টেলে কার সাথে জানি থাকে। ও আসবে। ওর সাথেই আমরা যাব জেলখানায়। বেশি দূর তো নয়।'

'ও আচ্ছা।'

রেনু বললেন, 'আপনারা গোসল করে নেন। আমি নাশতা তৈয়ার করে ফেলি।'

একটাই গোসলখানা। লুৎফর রহমান সাহেব ঢুকলেন। সায়রা খাতুন রান্নাঘরে এসে বললেন, 'পিঠা এনেছি। যা গরম, নষ্ট না হয়। চিড়ামুড়ি গুড় এনেছি। তোমারে আর কষ্ট করে এখন নাশতা বানাতে হবে না। আমরা ওগুলোই খেয়ে নেব। বাচ্চাদের দাও।'

'তাহলে আমি ভাত চড়ায়ে দেই। খেয়ে একেবারে বের হয়ে জেলখানায় যাব। নাকি খিচুড়ি চড়াব?'

'খিচুড়িই চড়াও। ঝামেলা কম হবে।' সায়রা খাতুন বললেন।

রেনু খিচুড়িই চড়ালেন। সবার সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে খিচুড়ি খেতে খেতে হাসু বলল, 'মা, ভাত রাঁধা ভুলেই গেছে। আমরা রোজ খিচুড়ি খাই।'

রেনু বললেন, 'কী বলো। পরশুই না ভাত রাঁধলাম।'

সায়রা খাতুনের চোখে জল চলে এল। সেটা গোপন করার জন্য তিনি বললেন, 'একটা কাঁচা মরিচ মুখের নিচে পড়েছে।'

তিনি জানেন, বউমা কেন প্রতিবেলা খিচুড়ি রেঁধে বাচ্চাদের খাইয়েছে। শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না, কিন্তু খিচুড়ি কোনো তরকারি ছাড়াই খাওয়া যায়। বউমার হাতে টাকা নাই।

কয়েকটা রিকশা নিয়ে তারা চললেন জেলখানা অভিমুখে। মমিনুল হক খোকাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

মুজিব যখন মন্ত্রী হলেন, তারপর ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে যখন চলে গেলেন মিন্টো রোডে, তখন মমিনুল হক খোকা ঢাকার বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর ঘরের জিনিসপত্র কিছু নাই।

কে নিয়ে গেছে?

মুজিব ভাই লোক পাঠিয়ে সব নিজের মন্ত্রিভবনে নিয়ে গেছেন।

মমিনুল হক খোকা গেলেন মিন্টো রোডে। গিয়ে দেখলেন, বাড়ি ভর্তি লোক গমগম করছে। তাঁর জিনিসপত্র বিছানা সব এক কোণে সবার অলক্ষ্যে পড়ে আছে।

তিনি রেনুকে বললেন, 'কী করেছেন, ভাবি। আমাকে না জানিয়ে আমার বিছানাবালিশ সব নিয়ে এসেছেন।'

মুজিব বললেন, 'আমার যখন থাকার জায়গা ছিল না, তোর কাছে আমি ছিলাম না! এখন এত বাড়ি নিয়ে আমি একলা থাকব? তোর আবার আলাদা বাসা কিসের? তুই এখন থেকে আমাদের সাথেই থাকবি।'

রেনু বলেছিলেন, 'ভাইডি, ভাই যা বলে শোনো। আমাদের সাথেই থাকো। আমরা যদি দুডো ডালভাত জোগাড় করতি পারি, তুমিও তা-ই খাবে।'

তাই ছিলেন মমিনুল হক খোকা। কয়েক দিনের মধ্যেই তো মন্ত্রিত্বই চলে গেল।

বাড়ি ছেড়ে দিতে হলো। মুজিব ভাই নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'সরে থাক। আমাকে অ্যারেস্ট করতে এসে না হলে তোরেও অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। এর আগে তো ভোটের সময় জেল খেটেছিস।'

মুজিব প্রায় জোর করেই তাঁকে ওই দিন বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। তখনই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বন্ধুর হোস্টেলে তাঁকে উঠতে হয়।

লুৎফর রহমান সাহেবকে জেলগেটের সবাই চেনে। তিনি অনেকবার এসেছেন এই গেটে। তাঁরও জায়গাটা, নিয়মকানুন সব মুখস্থ হয়ে গেছে।

সকাল থেকেই মুজিবের মনে ফুর্তি। আজ তাঁর 'দেখা' আসবে। আব্বা, মা, রেনু, বাচ্চারা। তিনি জেলখানার বাগান থেকে ফুল তুললেন। ফুলের একটা তোড়া বানালেন। বানানোর পরে মনে হলো, একটা তোড়া কাকে দেবেন? তিনি আরেকটা তোড়া বানাতে লাগলেন।

দুটো তোড়া নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে।

আব্বার হাতে একটা ফুলের তোড়া দেবেন কি! কেমন বেখাপ্পা লাগবে। দুটো তোড়ার একটা তিনি হাসুকে, একটা কামালকে দিলেন ।

কামাল তার প্যান্টের পকেট থেকে বের করল একটা মুড়ির মোয়া। বলল, 'আব্বা, নেন, দাদি আজকে এনেছে।'

হাসু বলল, 'আব্বা, আপনার বাগান থেকে আমাকে একটা গোলাপ ফুলের চারা দেবেন তো। আমি আমাদের বাসায় মাটির হাঁড়িতে লাগাব '

লুৎফর রহমান বললেন, 'খোকা, তোমারে কত দিন রাখবে মনে হয়?'

মুজিব বললেন, 'মনে হয় না ছাড়বে। ডাকাতি মামলা দিয়েছে, আবার নিরাপত্তা আইনেও গ্রেপ্তার দেখায়েছে। ছাড়ার ইচ্ছা থাকলে এত কিছু করত না। বাইরে আন্দোলন না হলে ছাড়ার কোনো কারণ দেখি না।'

লুৎফর রহমান বললেন, 'এরা দেখি গণতন্ত্র মানে না। জনগণের ভোটের যদি কোনো দাম না-ই থাকে, ভোট করার কী দরকার ছিল?'

বিদায়ের সময় হলো। উপস্থিত কারারক্ষী বলল, 'সময় শেষ। আপনাদের যেতে হবে। স্যার, আপনিও ওঠেন।'

শেখ লুৎফর রহমান বললেন, 'চলো, আমরা একটু বাইরে যাই। রেনু যদি একলা কোনো কথা বলতে চায়, বলুক।'

শেখ লুৎফর রহমান ছেলের হাত ধরে বললেন, 'আসি খোকা। নীতি নিয়া থাকো, আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করিও না। ইনশাল্লাহ জয়যুক্ত হবা।'

সায়রা খাতুন মুজিবকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে ভালো রাখুক।'

মমিনুল হক খোকা বললেন, 'মিয়াভাই, আসি। আমি আছি। ভাবিদের নিয়া চিন্তা করবেন না।'

হাসু বলল, 'আসি আব্বা, আমি আছি, মাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না '

কামাল বলল, 'হাসু আপু। তুমি যাও। আমি যাব না। আমি জেলখানায় থাকব।'

রেনু বললেন, 'আমার আলাদা কোনো কথা নাই। আমি আপনাদের সাথেই বারাই। কামাল চলো।'

কামাল মুজিবের কোলে উঠে পড়ল। বলল, 'আমি যাব না। আমি আব্বার সঙ্গে জেলখানাতেই থাকব।'

রক্ষী আবার তাগাদা দিল। 'স্যার, আপনার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আপনি তো বোঝেনই স্যার। আমরা হুকুমের চাকর।'

মুজিব সব সময় পুলিশ বা ডিবি সদস্যদের ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধা যাতে না হয়, তা দেখে এসেছেন। এরা তো আসলেই চাকুরে মাত্র, এদেরকে বিপদে ফেলার কোনো মানে হয় না। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তোমরা যাও। আমিও যাই। কামাল বাবা, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাব। তোমার সাথে থাকব। এখন মার সাথে তুমি বাড়ি যাও।'

কামাল বলল, 'না, তোমার বাড়ি যাওয়ার দরকার নাই। তুমি জেলখানায় থাকো। আমিও তোমার সঙ্গে জেলখানায় থাকব। তোমার সাথে ফুলের বাগান করব।'

কামাল কিছুতেই তার আব্বার কোল ছাড়বে না। কিছুতেই না। তাকে নামাতে গেলেই সে হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে লাগল।

৫৭.

আতাউর রহমান খান লম্বা-চওড়া মানুষ। শেরওয়ানি পরছেন হোটেল কক্ষে। বোতাম লাগাচ্ছেন। তিনি এসেছেন করাচি। দেখা করবেন গভর্নর জেনারেল বা বড় লাটসাহেবের সঙ্গে। লাটসাহেব গোলাম মোহাম্মদ অসুস্থ শুয়ে শুয়ে দেশ পরিচালনা করেন। তার শরীরের অর্ধেকাংশ অবশ। কথা জড়িয়ে যায়।

বড়লাট খবর পেয়েছেন আতাউর রহমান করাচিতে। তিনি নিজেই ডেকে পাঠিয়েছেন। বড়লাট ডেকে পাঠালে না গিয়ে উপায় কী? ৪৭ বছর বয়সী এই রাজনীতিক কাম উকিল চললেন লাটসাহেবের প্রাসাদে।

আতাউর রহমান খান বললেন, 'স্যার, ডেকেছিলেন কেন?'

তখন তাঁর দীনহীন বেশ। মুখখানা করুণ।

বললেন, 'ওরা আমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে আমাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।'

আতাউর রহমান তাঁকে কয় মাস আগেও দেখে গেছেন। তখনই তিনি এই

রকম অর্ধ-অবশই ছিলেন। ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে পঙ্গু করে দেওয়ার কথাটা একটা রূপক মাত্র।

আতাউর রহমান মুখখানা কাতর করলেন। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়ার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের গণপরিষদ সদস্যরা বিল উত্থাপন করে পাস করে নিয়েছে। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাস। গভর্নর জেনারেল তখন করাচি ছিলেন না, হাওয়া বদল করতে গেছেন অ্যাবোটাবাদ।

গোলাম মোহাম্মদ ঘটনা বলতে লাগলেন তো তো করে। আর গালি দিতে লাগলেন মন্ত্রী আর গণপরিষদ সদস্যদের, ও একটা চোর, ওটা বদমাশ, ও তো একটা হারামজাদা।

আতাউর রহমান বললেন, 'এই সমস্যার একটা সমাধান আছে। আপনি গণপরিষদ ভেঙে দেন। আট বছর আগে ওরা নির্বাচিত হয়েছে। কাজের কাজ কিছু করতে পারে নাই। তাদের আসল কাজ হলো শাসনতন্ত্র রচনা করা। সেটাই তো তারা করেনি। তা না করে আইনপ্রণেতার ভূমিকা নেওয়ার মানে কী?'

গোলাম মোহাম্মদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'দেখা যাক কী করতে পারি! আর শোনো। এসব কথা কাউকে কিছু বোলো না। তোমার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকুক।'

'আমি তো লন্ডন আর জুরিখ যাচ্ছি। লন্ডনে মওলানা ভাসানী আছেন। একটু দেখা করব। আর সোহরাওয়ার্দী সাহেব আছেন জুরিখে। তাঁর অপারেশন হয়েছে। তাঁকেও একটিবার দেখা আমার কর্তব্য।'

'শহীদকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। তাকে আমার খুব দরকার।'

সন্ধ্যার সময়ে আতাউর রহমান খান আয়োজন করলেন এক সাংবাদ সম্মেলন। জানালেন, পূর্ব বাংলায় বন্যা হচ্ছে। বন্যা-পরিস্থিতি খুব ভয়ংকর।

সাংবাদিকেরা বন্যা নিয়ে জানতে আগ্রহী নয়। একজন প্রশ্ন করলেন, 'এ কে ফজলুল হককে বাদ দিয়ে আপনারা সরকার গঠন করতে পারেন না?'

'সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বিবেচনা করলে অবশ্যই পারি।'

পরের দিন ভোরবেলা তিনি রওনা হলেন লন্ডনের উদ্দেশে।

সেখানে তিনি দেখা করলেন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। সেই একই রূপ ভাসানীর। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। মাথায় সেই তালের আঁশের টুপি।

ভাসানী দেশ ছেড়েছিলেন বার্লিনে বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে অংশ নেবেন বলে। বিশ্বশান্তি পরিষদের সভাপতি জুলিও কুরি তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন

সফরসঙ্গী ছিলেন খন্দকার ইলিয়াস, জমিরুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ আর ফয়েজ আহমদ।

করাচি গিয়েছিলেন তাঁরা প্রথমে। জার্মানির ভিসা তাঁরা জোগাড় করতে পারেননি। তাই তাঁরা ইউরোপে চলে আসেন। প্রথমে যান রোমে। সেখানেও জার্মানির ভিসা না পেয়ে চলে আসেন লন্ডনে।

তত দিনে বার্লিনের শান্তি সম্মেলন সমাপ্ত হয়ে যায়। ভাসানী অবশ্য একটা বাণী পাঠিয়েছিলেন বার্লিন সম্মেলনে। সভাপতি জুলিও কুরি তা পাঠ করে শোনান।

ভাসানী বললেন, 'আতাউর, এইখানে তো ভালো লাইগতেছে না, আমারে দেশে ফেরার ব্যবস্থা কইরে তারপর তুমি যাও। পরের ঘরে পরেরটা খাইয়া কি ভালো লাগে! দেশের মানুষ কেমন আছে, না আছে, জানতে ইচ্ছে করে।'

আতাউর রহমান খান বললেন, 'আপনাকে তো সোহরাওয়ার্দী সাহেব আর কয়েক দিন অপেক্ষা করতে বলেছেন। করেন অপেক্ষা। আমি যাচ্ছি জুরিখে। দেখা করে তাঁকে করাচিতে ফিরে যেতে বলি। গোলাম মোহাম্মদও তাঁকে খুঁজছেন।'

ভাসানী লন্ডনে আছেন ২৯ সেন্ট মেরিজ অ্যাবোট টেরাসে। তাঁর আগমনের খবরে বাঙালিরা ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। তাঁরাই চাঁদা তুলে তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

ভাসানী বললেন, 'শোনো, তুমি শহীদ সাহেবরে বইলবা, পাকিস্তানে কমিউনিস্টদের উপরে অত্যাচার বন্ধ না হইলে আমি দেশে ফিইরব না।'

আতাউর রহমান খান বুঝতে পারলেন না, ভাসানী আসলে কী চান? তিনি কি দেশে ফিরতে চান, নাকি দেশের বাইরে থাকতে চান!

আমগাছের ডাল থেকে পাখি দুটো উড়ে যায় মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগের ছাদে। সেখানে দুজনে গল্প করে।

ব্যাঙ্গমা বলল, 'এরপরে শান্তি সম্মেলন হইব স্টকহোমে। সেখানে ভাসানী হাজির হইব। তাঁর সঙ্গে চিলির কবি পাবলো নেরুদা, তুরস্কের নির্বাসিত কবি নাজিম হিকমত হোটেল রুমে আইসা দেখা করব।

'আর ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি নেতা তারে আমন্ত্রণ জানাইব তাগো সম্মেলনে ভাষণ দিতে। ভাষণ শুইনা তারে খেতাব দেওয়া হইব "ফায়ার ইটার মওলানা"।

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আচ্ছা, সে তো আরও কিছুদিন পরের কথা। অহন আতাউর রহমান খান কই যাইব?'

'জুরিখ। সুইজারল্যান্ড।'

আতাউর রহমান গেলেন জুরিখে। সোহরাওয়ার্দীর হাসপাতালে যখন পৌঁছালেন, তখন সন্ধ্যা। খবর এল, বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছেন। মোহাম্মদ আলী বগুড়া তখন যুক্তরাষ্ট্রে। আর ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব বাংলা থেকে সরিয়ে করা হয়েছে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কথা হলো আতাউর রহমান খানের. আতাউর রহমান খান বললেন, 'এখন শরীরটা ভালো?'

'হ্যাঁ এখন ভালো। তবে ডক্টর বলছে, হামাকে আরও রেস্ট করতে হোবে।'

'আপনি করাচি ফিরে যান। বড়লাট আপনাকে খোঁজে। আপনাকে খুব দরকার। শুনেছেন তো, আজ গণপরিষদ বাতিল করে দিয়েছে।'

'শুনেছি। কেন খোঁজে?'

'মনে হয়, আপনাকে ক্ষমতা দিতে চায়।'

'শরীরটা ঠিক হোক। তারপর হামি ফিরব।'

আতাউর রহমান খান ফিরলেন করাচিতে। বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ তখন করাচি থেকে ২০ মাইল দূরে আরব সাগরতীরে। আরাম করছেন।

আতাউর রহমান টেলিফোন করলেন বড়লাট ভবনে। 'আমি কি একটু দেখা করতে পারি বড়লাট সাহেবের সঙ্গে?'

'বিলকুল নেহি।'

'আমার নাম আতাউর রহমান খান। নামটা একটু বলবেন তাঁকে।'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এক সামরিক কর্মচারী হোটেলে এসে হাজির। লাটসাহেব সালাম দিয়েছেন।

আতাউর রহমান গেলেন লাটসাহেবের কাছে, গাড়িতে করে, ২০ মাইল দূরে, মরুভূমির লু হাওয়া খেতে খেতে।

আতাউর রহমানের জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। গোলাম মোহাম্মদ অনেকটাই সুস্থ। তিনি এখন হেসে হেসে কথা বলছেন। জিগ্যেস করলেন, 'সোহরাওয়ার্দী সাহেব তো এখন সুস্থ, তাহলে তিনি এলেন না কেন?'

'তিনি বিশ্রাম করছেন। আপনি ডাকলেই এসে পড়বেন।'

'তাঁকে আমার বহুত দরকার। গণপরিষদ ভেঙে দিয়েছি। এ অবস্থা তো চলতে পারে না। শাসনতন্ত্র তো রচনা করতে হবে। একটা ছোটখাটো পরিষদ গঠন করে দেওয়া যায়। যারা শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবেন। তুমি সোহরাওয়ার্দীকে চিঠি লিখে বলো, তাড়াতাড়ি যেন চলে আসে।'

'আমি লিখব। আপনিও লিখুন। তবে, একটা কথা। সোহরাওয়ার্দী কিন্তু ষড়যন্ত্র জিনিসটা পছন্দও করেন না, নিজেও ঘোঁট পাকাতে জানেন না। আপনার এখানে এসে এইসব প্যাঁচঘোচের মধ্যে পড়ে না আবার নাজেহাল হন।'

'তওবা তওবা। আমার এখানে কোনো ষড়যন্ত্র নাই।'

৫৮.

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অজিত গুহর পাঠশালীয় এক নতুন ছাত্র এসেছেন তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ভালোবাসেন কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কাজী নজরুলের কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ। অজিত গুহ তাঁকে কালিদাস পড়ে শোনাচ্ছেন।

অজিত গুহ এই ছাত্রকে শুধু যে পাঠদান করেন, তা নয়, খাদ্যও সরবরাহ করেন।

অজিত গুহ আগের মতোই রান্নাবান্না করছেন জেলখানার ভেতরে। বন্দী যাঁরা আছেন এখানে, ইয়ার মোহাম্মদ খান, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জি, মোহাম্মদ তোয়াহা—সবাই এক ওয়ার্ডেই থাকেন। অজিত গুহর রান্না করা খাবার খান। মুনীর চৌধুরী এপ্রিলেই মুক্তি পেয়ে গেছেন, যুক্তফ্রন্টের স্বল্পায়ু শাসনকালে।

অজিত গুহও মুক্তি পেলেন।

ফজলুল করিমও।

এবার রান্নার ভার নিলেন মোহাম্মদ তোয়াহা।

তাঁর রান্না আগের মতো ভালো হয় না। মুজিব বলেন, 'আমাদের আগের বাবুর্চিই ভালো ছিল।'

মোহাম্মদ তোয়াহা রাগ করেন।

আবার তাঁকে অনুরোধ করতে হয়, 'আরে, তোয়াহার রান্নার মতো এত ভালো কেউ রাঁধতে পারে নাকি?'

তিনি আবার রাঁধতে বসেন। মুজিব আর কোরবান আলী তাঁর রান্নার আশপাশে ঘুরঘুর করেন। যা পাওয়া যায়, তাই তো লাভ! কিন্তু কোরবান আলীর শরীরের ধারণক্ষমতা বেশি। এতটুকুন খাবারে তাঁর পোষায় না। তিনি একটু কষ্টই পান। কোরবান আলীর মুক্তির আদেশ এল। কোরবান সবার কাছ থেকে বিদায়-আদায় নিয়ে মালপত্র কাঁধে তুলে চললেন জেলগেটে।

একটু পরে কোরবান ফিরে এলেন। ভীষণ রেগে আছেন তিনি। বললেন, 'আরে আমারে গেটে নিয়া যায়া আবার গ্রেপ্তার করল। তারপর বলে ছেড়ে দিব, যদি বন্ড সই করেন। আমি কি সেই রকম, যে বন্ড সই করে মুক্তি নেব?'

সবার কাছ থেকে বিদায়-আদায় নিয়ে গেছেন, বেচারা! আবার তাঁকে ফিরে আসতে হলো। তিনি খুব কষ্ট পেয়েছেন।

মুজিব ডাকলেন এক জেলকর্তাকে। 'শোনেন, এর পরে যদি কাউকে বন্ড সই দিয়ে মুক্তি নিতে হয়, এটা আগেই বলে দিবেন। অন্য মামলা থাকলেও আগেই বলে দেবেন। মালপত্র নিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা বড় অবমাননাকর। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তো কেউ দরখাস্ত করে নাই যে আমি বন্ড সই করব, আমাকে মুক্তি দেন। আরেকবার যদি এই কাণ্ড ঘটতে দেখি, জেলে ভীষণ গন্ডগোল হবে, বলে দিলাম।'

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্মচারী এসেছেন। তিনি কিছু বলেন না। মুজিবের সামনে শুধু হাত কচলান। মুজিব খেপে গেলেন। 'শোনেন, বন্ড নিতে এসেছেন তো। যান। অযথা ঘোরাঘুরি করার দরকার নাই। আপনার সরকারকে বলে দেন, শেখ মুজিবর বলে দিছে, সরকারকে বন্ড দিতে হবে। ভবিষ্যতে এই রকম অন্যায় যেন আর না করে আর বিনা বিচারে যেন কাউকে আটক করে না রাখে।'

কর্মচারীটি হেসে ফেললেন। বললেন, 'স্যার, আমি কি আপনাকে বন্ড দিতে বলেছি?'

শেখ মুজিবুর রহমান চিঠি লিখলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগকে :

'আমাকে কেন ডিটেনশন দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যা আমি পেয়েছি। আপনারা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এর মধ্যে এক ফোঁটা সত্যতা নাই। আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য। এইটা একটা সাংবিধানিকভাবে গঠিত বিরোধী দল।'

জেলপুলিশের কর্মকর্তা দেখা করলেন মুজিবের সঙ্গে। মুজিবকে বললেন, 'শেখ সাহেব, আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। তা হলো, আপনার সঙ্গে কমিউনিস্টদের যোগাযোগ আছে। এই কারণে আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না।'

মুজিব বললেন, 'শোনেন। আপনাদের পাকিস্তানের বড়লাটসাহেবও আমাকে এই কথা বলেছিলেন। মুজিব, তুমি নাকি কমিউনিস্ট। আমি তাঁকে যা বলেছিলাম, আপনাকেও তা-ই বলি। আমার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। উনি একজন সত্যিকারের গণতন্ত্রী। আমিও তাঁর মতো শুধু গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করি। আওয়ামী মুসলিম লীগ ছাড়া আর কোনো পার্টির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই। ছিল না।'

'আচ্ছা বলেন তো, পূর্ব পাকিস্তানে যে ৯২/ক জারি করা হলো। এটা নিয়ে আপনার অভিমত কী?'

'এই প্রশ্ন করবেন না। এটা আমার জন্য খুব একটা বেদনার বিষয়। এটা আমাকে রাতারাতি মন্ত্রী থেকে নিরাপত্তাবন্দীতে পরিণত করেছে।'

'আপনি যদি বন্ড সই দেন, তাহলে আপনাকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবা যায়।'

'শেখ মুজিবর রহমান জীবন থাকতেও বন্ড সই দিয়ে মুক্তি নিবে না। আপনার সরকারকে বলে দেন, অন্যায় করা থেকে বিরত থাকতে যেন বন্ড দেয়।'

জেলপুলিশের কর্তা তাঁর রিপোর্টে লিখলেন, 'তাঁর মনোভাব দৃঢ় এবং অপরিবর্তিত। তিনি শর্তসাপেক্ষ মুক্তির বিরোধী।'

৫৯.

ব্যাঙ্গমা বলল, 'বড়লাট গোলাম মোহাম্মদের শরীরটা ভালা না, তার কথা যায় জড়ায়া, কিন্তু দাবার চাল তিনি কম চালতে পারেন না।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'ঠিকই কইছ। তিনি তো সবাইরে ঘোল খাওয়ায়া ছাড়তেছেন। আতাউর রহমানরে পাঠাইলেন সোহরাওয়ার্দীর কাছে। সোহরাওয়ার্দীরে ডাইকা আনতে চান। তিনি সোহরাওয়ার্দীরে কইবেন, আপনেরে প্রধানমন্ত্রী করুম। আহেন।'

ব্যাঙ্গমা বলল, 'আর আতাউর রহমান খানরে কইবেন, আপনেরে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী বানামু, আহেন মিয়া, ফজলুল হকের উপরে আমার রাগ। আপনের উপরে তো না। আপনি যুক্তফ্রন্টের পার্লামেন্টারি বোর্ডের সভাপতি হন।'

ব্যাঙ্গমি বলল, 'আর ফজলুল হকরে খবর দিবেন, আপনেই তো পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হইবেন। আপনেরেই তো আমি শ্রদ্ধা করি। আওয়ামী লীগরে বাদ দেন।'

ব্যাঙ্গমা বললেন, 'গোলাম মোহাম্মদ বললেন, আমি ঢাকা আসতাছি। ৯২/ক তুইলা দিব। পূর্ব পাকিস্তানে নতুন মন্ত্রিসভা হইব। কারে যে প্রধানমন্ত্রী হইতে কই আতাউর রহমান সাব, মনে হয়, আপনেরেই ডাকুম। আবার ফজলুল হকরে কন, হক সাব, আপনে ছাড়া আর কে হবেন প্রধানমন্ত্রী খেলা জইমা উঠল।'

৬০.

কার্জন হল প্রাঙ্গণকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। পাশেই বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেখানে গোলাপ ফুটে আছে সারি সারি। বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ এখানেই চায়ের নেমন্তন্ন জানিয়েছেন সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি আর পার্লামেন্ট মেম্বারদের। আর সবার জন্য চার-পায়া টিংটিঙে চেয়ার। শুধু একটা তিন আসনবিশিষ্ট শুভ্র সোফা ঈষৎ উঁচুতে রাখা। তার মধ্যখানে বসলেন বড়লাট। এক পাশে এ কে ফজলুল হক। আরেক পাশে আতাউর রহমান খান।

এঁরা দুজন এয়ারপোর্টে ছুটে গিয়েছিলেন বড় বড় ফুলের মালা নিয়ে। কে বড়লাটের গলায় আগে মালা পরাবেন, এই নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা। আতাউর রহমান খানের বয়স ৪৭, আর এ কে ফজলুল হকের ৮১। দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলেন আতাউর রহমান। তবে মালার ওজন, দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্যে জয়লাভ করলেন ফজলুল হক।

গোলাম মোহাম্মদ তাঁর বাঁকা ঠোঁটে মৃদু মৃদু হাসলেন।

এখন কার্জন হলের এই চা-চক্রে এই সাদা সোফায় উপবিষ্ট বড়লাট গোলাম মোহাম্মদের ওপরে শ দুয়েক মানুষের শ চারেক চোখ নিবিষ্ট। গোলাম মোহাম্মদ কোন দিকে ঝোঁকেন! তিনি ডান দিকে ঝুঁকলেন। মৃদু হাসলেন। ফজলুল হক তাকে কী যেন বলছেন। গোলামের ঠোঁটও নড়ে উঠল। তিনিও কী যেন বলছেন।

কৃষক শ্রমিক পার্টির সবার মনে আশা, মুখে হাসি ফুটে উঠল, যাক, শেরেবাংলাই হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

খানিক পরে গোলাম ঝুঁকে পড়লেন বাঁ দিকে। আতাউর রহমান খানের কানে কানে কী যেন বললেন। আতাউর রহমান খানও জবাব দিলেন তাঁর কথার।

আওয়ামী মুসলিম লীগারদের মনে আশার সঞ্চার হলো। খেলা ১-১ ড্র। আরেকটা গোল করতে পারলেই...

চা-চক্র শেষ হয়ে গেল। কে হবেন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী, তা অনিষ্পন্ন রেখে বড়লাট সহকারীদের ঘাড়ে হাত রেখে গাড়িতে উঠলেন। মোটামুটি তাঁকে কোলে করেই তাঁরা গাড়িতে তুলে দিল।

ফজলুল হকও একজনের কাঁধে হাত রেখে উঠে পড়লেন তাঁর কালো গাড়িতে।

ওই রাতে ফজলুল হক গেলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা, কেন্দ্রীয় গণপরিষদ সদস্য শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে, কারণ র‍্যাংকিন স্ট্রিটের এই বাড়িতেই ফজলুল হকের চিকিৎসক ডা. এম এন নন্দীও থাকেন। ডাক্তারের কাছেই এসেছেন ফজলুল হক। শুনে শ্রীশ তাঁকে ডেকে নিলেন নিজের ঘরে। বললেন, 'হক রে, গোলাম তোকে কানে কানে কী বলল রে?'

ফজলুল হক গোলাম মোহাম্মদের বাচনভঙ্গি নকল করে বললেন, 'ও তো একতা অথব্বো, ওর কথা কি বোথা দায়?' (ও তো একটা অথর্ব ওর কথা কি বোঝা যায়)

শ্রীশ বললেন, 'না বুঝলে কাত হয়ে উত্তর দিলি যে!'

'ও যেমন করেছে। আমিও তেমন করেছি। ও আমার কথা বুঝে নাই। আমিও ওর কথা বুঝি নাই।'

উপস্থিত সবাই দুই বৃদ্ধের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন।

৬১.

হাসিনা আর কামাল ঘুমিয়ে আছে জাহাজের কেবিনে। জাহাজ ছেড়েছে রাতে, বাদামতলী ঘাট থেকে। রেনুর কোলে ঘুমুচ্ছে কয়েক মাস বয়েসী জামাল।

রেনুরও তন্দ্রামতো এসেছে। তবু কোথায় এলাম, কী বৃত্তান্ত, বোঝার জন্য কেবিনের জানালা খুলে তিনি একবার উঁকি দিলেন। বাইরে অন্ধকার নদী। জেলে নৌকার আলো জোনাকির মতো জ্বলছে। লঞ্চ, জাহাজ চলাচল করছে। হইচইও হচ্ছে। বোধ করি, জাহাজ এসে নারায়ণগঞ্জ ঘাটে থামল।

জাহাজের বারান্দার আলো কিছু পড়েছে নদীর জলে। কালো কালো ঢেউয়ের অবিরাম ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। খুব ঠান্ডা। রেনু জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

রেনু যাচ্ছেন টুঙ্গিপাড়া। তাঁর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে। শেখ লুৎফর রহমান সাহেব গুরুতর অসুস্থ।

তিনি তখনই মনস্থির করে ফেললেন, টুঙ্গিপাড়া যাবেন।

তবে যাবার আগে সরকারের কাছে একটা আবেদন করলেন। তাঁর কারাবন্দী স্বামীকে কি সরকার মুক্তি দিতে পারে না? মুজিব কি তাঁর অসুস্থ পিতাকে দেখতে পারবেন না?

এরই মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব করাচি ফিরে এসেছেন। আর তিনি এখন কেন্দ্রে আইনমন্ত্রী। রেনু কারাবন্দী মুজিবকে বলেছিলেন, সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে। মুজিব বলেছেন, 'না, টেলিগ্রাম করব না। আমার দরকার নাই।'

রেনু খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আব্বার শরীরটা না জানি এখন কেমন? মুজিব তো মুক্তি পেল না। এখন আব্বার যদি কিছু হয়ে যায়!

হঠাৎই কেবিনের দরজায় ঠকঠক আওয়াজ। কে এত রাতে তাঁর কেবিনের দরজায় আঘাত করছে? বাচ্চারা ঘুমিয়ে আছে। রাত বাজে ১১টারও বেশি। খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে, লঞ্চের পরিচারককে খাবারের দাম তিনি দিয়েও দিয়েছেন।

রেনুর বুকটা একটু কেঁপে উঠল। তিনি এক হাতে জামালকে বুকের সঙ্গে

চেপে ধরে আরেক হাতে কেবিনের ছিটকিনি খুললেন।

খুলে যা দেখলেন, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মুজিব। সঙ্গে পার্টির কর্মী নুরুদ্দীন।

রেনুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি সহাস্য মুখে বললেন, 'আসো।'

মুজিব নুরুদ্দীনকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন।

নুরুদ্দীন না থাকলে তো আজকে তিনি নিজের বাসাও খুঁজে পেতেন না। আর রেনুর সঙ্গে একই জাহাজে বাড়ি ফিরতে পারতেন না।

রাত সাড়ে সাতটার সময় জেলখানায় সংবাদ এল, শেখ মুজিবের মুক্তির আদেশ এসে গেছে। নয়টার সময় মুজিবকে ছেড়ে দেওয়া হলো। তিনি সহবন্দীদের ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতো কারাগারের বাইরে থাকবেন, এটা ভাবতেই তার মনটা বিষাদে ছেয়ে গেল। তিনি বিদায়ের সময় ইয়ার মোহাম্মদ খানকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'হয় তোমরা মুক্তি পাবা, নাহলে আমি আবার জেলে এসে তোমাদের সঙ্গে থাকব।'

জেলগেটে এরই মধ্যে ভিড় জমে গেছে। কোথেকে খবর পেয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধব ভক্তরা ফুলের মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁকে দেখেই তারা স্লোগান দিয়ে উঠল, 'শেখ মুজিব শেখ মুজিব/ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। রাজবন্দীদের মুক্তি চাই, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই।'

মুজিব মিছিল করে বংশাল রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এই সময় রায়সাহেব বাজারের আওয়ামী লীগ কর্মী নুরুদ্দীন তাঁর কাছে ছুটে এল। বলল, 'মুজিব ভাই, আমি ভাবিকে জাহাজে তুলে দিয়ে আসতেছি. ভাবি বাদামতলী ঘাট থেকে জাহাজে উঠে গোপালগঞ্জ রওনা হইছেন। আপনি যদি এখনই রওনা হন, তাইলে নারায়ণগঞ্জ গিয়া জাহাজ ধরতে পারবেন. আপনার আব্বার শরীরটা মনে হয় বেশ খারাপ।'

বন্ধুদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে মুজিব ছুটলেন। নাজিরাবাজারের বাসা মুজিব চেনেন না। নুরুদ্দীনই তাঁকে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে। বাসায় ঢুকে কিছু জিনিসপত্র রেখে, কিছু নিয়ে তাঁরা ছুটলেন নারায়ণগঞ্জ ঘাটের উদ্দেশে। ট্যাক্সি খুঁজছিলেন। একটা পাওয়া গেল।

মুজিবকে জাহাজে তুলে দিয়ে কেবিনে রেনুর হাতে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে নুরুদ্দীন বিদায় নিল।

মুজিব কেবিনে ঢুকেই হাসিনা আর কামালকে ঘুম থেকে তুললেন।

হাসিনা উঠতে চায় না। চোখ রগড়ে দেখল, আব্বা। সে আব্বার কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরল।

কামালেরও ঘুম ছুটে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সে বলল, 'আব্বা, আমি কি জেলখানায়?'

খানিক পরে বাচ্চারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

মুজিব বললেন, 'রেনু, চলো, বাইরে বসি। কত দিন বাইরের আকাশ দেখি না, খোলা প্রান্তর দেখি না। নদী দেখি না। জেলখানায় তো সন্ধ্যার পরেই তালা লাগিয়ে দেয়।'

তাঁরা দুজন বারান্দায় বসে রইলেন দুটো চেয়ারে। জাহাজ চলছে একটানা শব্দ তুলে। ওই দূরে নদীতীরে কোথাও কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মানুষের বসতির আভাস। মাঝেমধ্যে অন্য জাহাজ বা লঞ্চ চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

শীতকাল। কুয়াশা আছে। কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে কখনোও উঁকি দিচ্ছে তারা।

রেনু আর মুজিব পাশাপাশি বসে আছেন।

মুজিব রেনুর হাত ধরলেন। সারা রাত তারা গল্প করলেন।

এই রকম নিরিবিলি সময় কাটানো তো এই জীবনে কখনো হয়ে ওঠে নাই।

কত কথা জমে আছে দুজনের।

ভোর হচ্ছে। নদীর বুকে ভোরের। দুজনেই ক্লান্ত। তারা ঘুমুতে গেলেন।

সারা দিন ধরে জাহাজ চলল।

রাতের বেলা তারা নামলেন জাহাজ থেকে। এখান থেকে আরও দুই মাইল পথ নৌকায় যেতে হবে। তাঁদের নিজেদের নৌকাকে ঘাটে আসতে বলা হয় নাই। তবে শেখ মুজিব নৌকা পেয়ে গেলেন সহজেই।

টুঙ্গিপাড়া গিয়ে দেখলেন, আব্বা এখানে নাই। তাঁকে গোপালগঞ্জ নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। গ্রামে ভালো ডাক্তার নাই।

রাতেই তাঁরা রওনা হলেন গোপালগঞ্জের দিকে।

গোপালগঞ্জের বাসায় তারা পৌছুলেন সকাল ১০টায়।

আব্বা বাসায়। তিনি আরোগ্যের দিকে। আম্মা বললেন, 'খোকা, এখন আর কোনো দুশ্চিন্তা নাই। যে অবস্থা হয়েছিল তোমার আব্বার।'

মুজিব দেখা করলেন ডাক্তার ফরিদ আর বিজিতেন বাবুর সঙ্গে। তাঁরা বললেন, 'আর ভয় নাই।'

বাসায় ফিরে এসে দেখলেন, রেনুর মুখটা একটু ছায়াচ্ছন্ন।

'কী হয়েছে, রেনু?'

রেনু একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিলেন। আতাউর রহমান সাহেব টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের আদেশ। মুজিবকে যেতে হবে করাচি। এখনই।

মুজিব বললেন, 'চিন্তা কোরো না। আজ রাতে যাব না। কাল রাতে রওনা হব।'

রেনু বললেন, 'এর আগের বার জেল থেকে বের হয়ে তুমি কিছু দিন বাড়ি ছিলা। আমি ভাবলাম, আমরা কিছুদিন একসাথে থাকতে পারব। তা হলো না। অসুবিধা নাই। তুমি যাও।'

মুজিব বললেন, 'রেনু। তোমার মতো স্ত্রী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। শামসুল হক সাহেবকে দেখো। তাঁর স্ত্রী কোথায় বিদেশে চলে গেছেন। আর ভদ্রলোক আধাপাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর তুমি আমার সংসার কত কষ্ট করে আগলে আছ। কোনো দিন তুমি আমাকে বাধা দাও নাই। আমি যদি দেশের জন্য সামান্য কিছু করে থাকতে পারি, তবে তা তোমার কারণেই সম্ভব হয়েছে। লোকে তো এই কথা জানবেও না।'

'লোকের জানার দরকার কী!' রেনু হাসলেন।

পরের দিন বিকালে গোপালগঞ্জে শেখ মুজিবের সংবর্ধনা। হঠাৎ করেই আয়োজন করা হয়েছে এই সভা। হাজার চারেক মানুষ উপস্থিত সেখানে। সভাপতিত্ব করলেন রহমত সরকার।

মুজিবের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা করার জন্য বক্তারা সরকারের সমালোচনা করলেন। আর প্রশংসা করলেন মুজিবের আত্মত্যাগের।

মুজিব দাঁড়ালেন ভাষণ দিতে। তিনি বললেন, ২১ দফা বাস্তবায়নের কথা, বললেন, সংখ্যালঘুদের সমস্যার কথা।

সভা শেষে বণিক সমিতি মুজিবের যাতায়াতের খরচ বাবদ ৫০১ টাকা চাঁদা তুলল আর তা অর্পণ করল মুজিবের হাতে।

টাকা পেয়ে ভালোই হলো মুজিবের। তিনি বিমানে ঢাকা যাবেন। তাতে সময় বেঁচে যাবে। গোপালগঞ্জ থেকে খুলনা। খুলনা থেকে যশোর। যশোর থেকে বিমানে ঢাকা। ঢাকা থেকে বিমানে করাচি যাবেন। প্লেনে উঠে বসে আছেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন নেতা। কিন্তু তিনি নিজেকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব মোহাম্মদ আলী বগুড়ার অধীনে আইনমন্ত্রী! এটা কোনো কথা হলো! গোলাম মোহাম্মদ যে তাঁকে ফাঁদে ফেলেছেন, এটা কি তিনি বুঝবেন না?

সোহরাওয়ার্দী সাহেব ষড়যন্ত্র বোঝেন না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতি হলেই

তিনি হেরে যান। এবারও যাবেন। মুজিব করাচিগামী বিমানে বসে সিদ্ধান্ত টেনে ফেললেন।

করাচি পৌছালেন রাতে। রাতের বেলায়ই যেতে পারতেন সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু গেলেন না। কারণ খুব রাগ হচ্ছে। লিডারের সঙ্গে তিনি বেয়াদবি করে ফেলতে পারেন। রাতে ঘুমিয়ে নিতে হবে আগে হোটেলে। রাগটা যদি কিছু কমে।

পরের দিন সকালে গেলেন হোটেল মেট্রোপলে, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে দেখা করতে।

সোহরাওয়ার্দী বাইরে যাবেন। কাপড়চোপড় পরছেন। বললেন, 'শুনলাম রাতে এসেছ। রাতে দেখা করতে এলে না যে?'

'ক্লান্ত ছিলাম। আর দেখা করেই বা কী হবে? আপনি তো এখন মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রী।'

'রাগ করেছ বোধ হয়?'

'রাগ করব কেন, স্যার? ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুল করেছি কি না!'

'বুঝেছি। অনেক কথা আছে। বিকাল তিনটায় এসো। বিস্তারিত কথা বলব।'

৬২.

ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মাথা খারাপ হয়ে গেছে : ওয়ান কমিউনিস্ট ফ্রম জেইল ইলেক্টেড টু কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লি। একজন কমিউনিস্ট জেলে বসে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে গেছে।

এটা কী করে সম্ভব? পাকিস্তানকে প্রথম দিন থেকে বলা হচ্ছে, তুমি আমার দোস্ত, কিন্তু একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, কমিউনিস্টদের নির্মূল করতে হবে, এ জন্য বিশেষ ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হলো। পাকিস্তান বলে আসছে, কমিউনিস্টদের ব্যাপারে তারা ক্ষমাহীন এবং নিষ্ঠুর। আমেরিকার উদ্বেগ তো পূর্ব বাংলা নিয়ে। ওটা কমিউনিস্টদের লীলাক্ষেত্র। এটা তারা মোহাম্মদ আলীকে

বুঝিয়েছে, মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জাকে বুঝিয়েছে পইপই করে। তাঁরা বলেছেন, কমিউনিস্টদেরকে কোনো দিনও তাঁরা বাড়তে দেবেন না। আমেরিকা নাম ধরে ধরে বলে দিয়েছে, ও কমিউনিস্ট, ওকে ধরো, ও কমিউনিস্ট, ওকে ক্ষমতাচ্যুত করো। এত সাবধানতা, এত সতর্কতা, এত কর্মসূচি, এত পয়সা খরচ—তার পরও জেলে বসে একটা কমিউনিস্ট গণপরিষদ সদস্য হয়ে গেল!

ওয়াশিংটন জরুরি তারবার্তা পাঠাল করাচির আমেরিকান দূতকে কীভাবে এটা সম্ভব হলো, ব্যাখ্যা দাও। তার মানে পূর্ব বাংলার আইনসভায় অনেকেই কমিউনিস্ট। তোমরা খোঁজ রাখো না!

করাচি থেকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কৈফিয়ত তলব করল করাচির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে। কী করো তোমরা? একটা কমিউনিস্ট ইলেক্টেড হয়ে যায়, আর তোমরা ঘোড়ার ঘাস কাটো? স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তখন আবার শোকজ করে ঢাকার আবু হোসেন সরকারকে। বাতাও। সরদার ফজলুল করিম তো ঢাকা জেলে ছিল। ও ছাড়া পেল কী করে?

সরদার ফজলুল করিম একজন ছোটখাটো মানুষ। বরিশালের কৃষকের ছেলে। লেখাপড়ায় ভালো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অনার্স আর এমএ দুটোতেই প্রথম শ্রেণী পেয়ে শিক্ষক হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে। তখন পাকিস্তান একেবারেই শিশু, আর সরদারের বয়স ২২। দাঁত ওঠার বয়স হবার আগেই শিশু পাকিস্তান কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করল সর্বাত্মক যুদ্ধ। যেখানে পারে, কমিউনিস্ট ধরে আর জেলে পোরে। ধরবে না-ই বা কেন? মহান আমেরিকার নির্দেশ এবং কর্মসূচি। কিছুদিন চাকরি করার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশ পেলেন সর্দার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার চাকরি ছাড়ো, পুলিশ তোমাকে ধরবে, জেলে পুরবে, তার আগেই চলে যাও অন্তরালে। আন্ডারগ্রাউন্ডে। মজিদ কিংবা অশোক নামের আড়ালে নিজেকে গোপনে রেখে বিভিন্ন কৃষকের বাড়িতে ভালোই তো কাটছিল সময় সরদারের। ১৯৪৯ সালে ধরা পড়লেন। ঢাকার সন্তোষ গুপ্তর বাড়িতে গোপন বৈঠক করার সময়। ঘুরলেন এ জেল ও জেল, একবার জেলে অনশন করলেন ৫৮ দিন। তারপর একসময় দেখলেন, দেশে নির্বাচন হচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট জিতে গেল। মুসলিম লীগ ধরাশায়ী। এ কে ফজলুল হক মন্ত্রী হলেন বাংলায়, আবার ক্ষমতাচ্যুতও হলেন। কেন্দ্রে চলছে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রী হলেন মোহাম্মদ আলী বগুড়ার অধীনে। শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন সোহরাওয়ার্দী। মওলানা ভাসানী দেশে ফিরে এলেন।

তারপর পূর্ব বাংলায় কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের প্রধানমন্ত্রিত্বে প্রাদেশিক সরকারও গঠিত হলো। তাঁরা ক্ষমতায় এসে রাজবন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে লাগলেন। শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। কিস্তিতে রাজবন্দীরা মুক্তি পেতে লাগলেন।

ঢাকা জেল থেকে ফজলুল করিম মুক্তি পেলেন। সরদার প্রথম দফায় পেলেন না। এরই মধ্যে একদিন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ জেলে এসে সরদার ফজলুল করিমের কাছ থেকে নমিনেশন ফরমে সাইন নিয়ে গেলেন। গণপরিষদ সদস্য নির্বাচন হবে। সরদার ফজলুল করিমকে প্রার্থী হতে হবে। ভোটার হলেন প্রাদেশিক পরিষদের এমএলএরা।

ঢাকা জেল থেকে সরদার করিমেরও মুক্তির আদেশ এল। তিনি কারামুক্ত হলেন।

তারপর ভোট। এমএলএরা সমবেত হচ্ছেন অ্যাসেমব্লি ভবনে। প্রত্যেক সদস্যের একটা করে ভোট। সবচেয়ে বেশি ভোট পেলেন এ কে ফজলুল হক। মোট ৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। আওয়ামী লীগ আর কৃষক শ্রমিক পার্টি এর মধ্যে আলাদা হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ পেল ১৩টা আসন, যুক্তফ্রন্ট ১৬টা। আওয়ামী লীগের এই ১৩টা আসনের মধ্যে একটা হলো সরদার ফজলুল করিমের।

প্রাদেশিক পরিষদে বেশ কয়েকজন কমিউনিস্ট সদস্য ছিলেন। হিন্দু আসনের নেতাদের মধ্যেও তাঁরা ছিলেন, যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও ছিলেন। তাঁরা শেখ মুজিবকে ধরলেন, 'আমরা আপনাদেরকে ভোট দেব, কিন্তু একটা আসন আমাদেরকে ছেড়ে দেন। আমরা ওই আসনে আমাদের একজন প্রার্থী দেব।' মুজিব বললেন, 'কে?' তাঁরা বললেন, 'এটা আমাদের ব্যাপার।' শেখ মুজিব রাজি হলেন।

আর সেই আসনে জিতে গেলেন একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট, সরদার ফজলুল করিম, যিনি কিনা দুই সপ্তাহ আগেও জেলে ছিলেন।

ওয়াশিংটনের মাথা তখন এলোমেলো হয়ে গেছে। তার মানে, প্রাদেশিক পরিষদে অনেকেই আছে কমিউনিস্ট, তা না হলে কীভাবে একজন কমিউনিস্ট জয়লাভ করে! আর জয়লাভ করল করল, সে জেলের বাইরে কেন? করাচির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী আবু হোসেন সরকারকে কারণ দর্শাতে বলা হলো। তারা বলল, আমরা সরদার ফজলুল করিমকে মুক্তি দিইনি। আরেকজন ছিলেন, ফজলুল করিম। তাকে

মুক্তি দিয়েছি। সরদার নিজের নাম গোপন করে মুক্তি নিয়েছে। দাঁড়াও তাকে গ্রেপ্তার করছি।

সরদার ফজলুল করিম পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছিলেন গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে অংশ নিতে। সভা হয়েছিল মারিতে। পরের বার যাওয়ার জন্য প্লেনে উঠলেন, প্লেন আর ছাড়ে না, সবাই বসে আছে প্লেনে, শেষে পুলিশ উঠল প্লেনে, বলল, 'হু ইজ সরদার ফজলুল করিম। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।' সরদার বলে উঠলেন, 'মুজিব ভাই, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

সরদারকে আবার জেলে পোরা হলো, যেহেতু ওয়াশিংটন তা-ই চেয়েছে।

শেখ মুজিব দেখলেন, সরদারকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। তিনি সিটবেল্ট খুলে উঠে পড়লেন।

সরদারকে এইভাবে ধরে নিয়ে যাওয়ার মানে কী? বিমানের আসনে বসে মুজিব ভাবলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর স্টেশনের ওসিকে মুজিব বললেন, 'গ্রেপ্তার করতে হলে আগে করতে পারলেন না। সরদার ভাই, আমরা অবশ্যই আপনার মুক্তির জন্য লড়াই করব। আমরা সব রাজবন্দীর মুক্তি চাই। আর নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হোক, তাই চাই।'

করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশন বসেছে। মুজিব উঠলেন বক্তৃতা দিতে। লম্বা শেরওয়ানি পরা মুজিবকে দেখাচ্ছে অপূর্ব। তাঁর কণ্ঠে স্পষ্টতা। তবে তিনি কথা বলছেন ধীরে ধীরে। এর আগে যখন তিনি প্রথমবার পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তখন তাতে ছিল জনসভার সুর সোহরাওয়ার্দী তাঁকে ডেকে বললেন, 'মুজিব তোমার বক্তৃতায় এখনো পল্টনের ধ্বনি। এখানে কথা বলবে আস্তে, অনুচ্চ স্বরে, ধীরে ধীরে, নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে।'

আজ তাই করবেন মুজিব।

তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন, 'স্যার, আপনি দেখবেন ওরা "পূর্ব বাংলা" নামের পরিবর্তে "পূর্ব পাকিস্তান" নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি, আপনারা এটাকে "বাংলা" নামে ডাকেন। "বাংলা" শব্দটার মধ্যে একটা ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য।'

পূর্ব বাংলার বদলে তাঁর স্বদেশের নাম পাকিস্তান রাখা হোক, এটা কখনোই চাননি শেখ মুজিব। কিন্তু তা-ই পাস হয়ে গেল গণপরিষদে।

কিন্তু শেখ মুজিব কোনো দিনও পূর্ব পাকিস্তান কথাটা উচ্চারণ করতে চাইতেন না। তিনি এই বদ্বীপটাকে অভিহিত করতে লাগলেন 'বাংলা' বলে।

৬৩.

শেখ মুজিব বাড়ি ফিরলেন ভোরের বেলা। চারদিক ফরসা হতে শুরু করেছে। দোকানপাট সব বন্ধ। আরমানিটোলার অবনীর দোকানের সামনে সিঁড়িতে শুয়ে আছে কোনো বাস্তুহারা, নাকি নৈশপ্রহরী! বটগাছের নিচে ঝরা পাতার স্তূপ। ফেলে দেওয়া খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে কুকুরের দল। হাওয়া উঠল, হেমন্তের বাতাসে রিকশারোহী শেখ মুজিবের একটুখানি আরামই বোধ হলো, শিরশিরিয়ে উঠল বটগাছের পাতা, সরসরিয়ে উঠল রাস্তায় পড়ে থাকা ঝরাপাতার দল। কাক কা-কা করতে লাগল ভোরের আগমনীর সংবাদ পেয়ে। রূপমহল সিনেমা হল থেকে তিনি ফিরছেন। ওখানে পার্টির কাউন্সিল ছিল।

রিকশা এসে থামল তাঁর বাসার সামনে। বাচ্চারা সব ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়, তিনি আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিলেন।

রেনু জেগেই ছিলেন। দরজা খুলে দিলেন। বললেন, 'সারা রাত ধরে মিটিং হলো?'

মুজিব বললেন, 'হ্যাঁ, আর বোলো না। কথা তো শেষই হয় না।'

'গরম পানি করে দিই। একেবারে গোসল করে তারপর ঘুম দাও।'

'সেই ভালো।'

মুজিব ঘরে গেলেন। পাশাপাশি দুটো বিছানা। একটায় শুয়ে আছে আট বছরের হাসিনা আর ছয় বছরের কামাল। পাশের বিছানাটা বড়। সেখানে শুয়ে আছে দেড় বছরের জামাল, আর ৪০ দিনের শিশু রেহানা।

জানালা দিয়ে আসছে ভোরের আলো। খুব স্নিগ্ধ আর নরম সেই আলো। শিশু চারজনকে মনে হচ্ছে স্বর্গের পারিজাত।

মুজিব গোসল সেরে এলেন। নাশতা করার জন্য বসলেন টেবিলে।

রেনু রুটি করেছেন। গৃহপরিচারিকা তাঁকে সাহায্য করছে।

এই সময় রেহানা কেঁদে উঠল। দৌড়ে গেলেন রেনু। বাচ্চাকে কোলে করে আনলেন। পিঠে চাপড় দিতেই রেহানা ফের ঘুমিয়ে পড়ল।

সায়রা খাতুন উঠে এলেন। বললেন, 'তুমি রেহানাকে আমার কোলে দিয়ে দাও।'

রেনু বললেন, 'লাগবে না, মা। আপনি ওজু করে নামাজ পড়ে নেন।'

সায়রা খাতুন এই বাসাতেই আছেন মাস দুয়েক। বউমার বাচ্চা হবে শুনে তিনি একা একা জাহাজে চড়ে চলে এসেছেন টুঙ্গিপাড়া থেকে। যাত্রাপথে কষ্ট হয়েছে। জাহাজের কেবিনের টিকিট ছিল, কিন্তু এক সরকারি কর্মকর্তা কেবিন দখল করে দরজা বন্ধ করে ঘুম দিয়েছিল। তিনি কী করবেন, বুঝছিলেন না। পরে নীলিমা ইব্রাহিম নামের এক শিক্ষিকা তাঁকে তাঁর কেবিনে ডেকে নেন। এইসব গল্প মুজিবকে শোনাতে পারেননি সায়রা খাতুন। ছেলে যে তাঁর বড় ব্যস্ত। তিনি বলেন, আমার পাগল ছেলে। রেনু শাশুড়ির একা একা ঢাকা আসার রোমাঞ্চকর কাহিনি সবিস্তারে শুনেছেন।

এই শাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কটা অন্য রকম। পিতৃমাতৃহীন রেনু যে ছোটবেলায় শাশুড়িকে বাবা ডাকতেন।

রেনু শেখ মুজিবের পাতে একটুখানি খেজুরের গুড় ভেঙে দিলেন। মুজিব রুটির সঙ্গে গুড় খেতে পছন্দ করেন।

রেনু বললেন, 'এত কী নিয়ে আলোচনা হলো যে সারা রাত কাবার হয়ে গেল?'

মুজিব নাশতা খেতে খেতে বললেন, 'আমাদের পার্টির একটা বড় সিদ্ধান্ত আজকে নেওয়া হয়ে গেল। আমাদের দলের নাম আর আওয়ামী মুসলিম লীগ না।'

একটু বিরতি দিয়ে মুজিব বললেন, 'আজ থেকে আমাদের দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ।'

'তাই তো ছিল।'

'না। মুসলিম শব্দটা আমরা বাদ দিলাম।'

'ও তাই তো!'

'এইটা নিয়া সারা রাত তর্ক। মওলানা সাহেব চান, মুসলিম শব্দ বাদ দিতে। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দুশ্চিন্তা, মানুষের রি-অ্যাকশন কী হবে! সালাম খানেরা বলল, মুসলিম শব্দ বাদ দিলে তোমাদেরকে আমরা বহিষ্কার করব। আমরা আওয়ামী মুসলিম লীগেই থেকে যাব। আমি এই দলকে একবার বোঝাই ওই দলকে একবার বোঝাই। দল তো সবার। দেশ তো সবার। হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবাই এই দলে আসতে পারবে। ভোর চারটায় আলোচনা শেষ হলো। আমরা এখন থেকে আওয়ামী লীগ।'

'কমিটি কী হলো?'

'আগের মতোই। মওলানা সাহেব সভাপতি। খান সাহেব, মনসুর সাহেব, খয়রাত সাহেব সহসভাপতি। আমি সাধারণ সম্পাদক।'

'তাজউদ্দীন?'

'তাকে এবার সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক করলাম।'

'অলি আহাদ?'

'যুগ্ম সম্পাদক।'

রেহানা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে রেনু চা করে আনলেন।

মুজিব চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'গোসলটা করে আরাম লাগল। একটু ঘুমায়া নেই। কাল তো আবার কাউন্সিল শুরু হবে ১২টায়।'

'তুমি এই ঘরে শোও। না হলে বাচ্চারা ঘুম থেকে জেগে তোমাকে জ্বালাবে। কামাল এসে তোমার ঘাড়ে চড়ে বসলে আর ঘুমাতে পারবা না।'

মুজিব শুয়ে পড়লেন। আলো আসছে জানালা গলিয়ে। রেনু জানালার পর্দা টেনে দিলেন। রাস্তায় লোকজনের চলাচলের শব্দও আসছে।

'তুমি ঘুমাও।' পান চিবুতে চিবুতে বললেন রেনু।

মুজিবের মনে আজ প্রশান্তি। ৩৫ বছরের জীবনে তাঁর রাজনীতির অভিজ্ঞতা কম হলো না। কিশোরবেলা থেকে শুরু। সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। সেখান থেকে মুসলিম লীগ। তখন হিন্দু জমিদারেরা মুসলমান কৃষকদের কীভাবে শোষণ করেছে, সেসব কথা শুনতেন, পড়তেন, বলতেন। আস্তে আস্তে আবুল হাশিম সাহেবদের সংস্পর্শে এসে ইসলামের উদারতার কথা শুনলেন। অসাম্প্রদায়িকতার পথ হয়ে উঠল তাঁর পথ। সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ রূপ দেখেছেন কলকাতায়।

কমিনিস্টদের সঙ্গেও মুজিবের খাতিরের সম্পর্ক। তিনি বারবার করে বলেন, তিনি কমিউনিস্ট না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক কর্মসূচি তাঁর পছন্দ। তিনি একটা শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেন। আর হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানে পার্থক্য না করার আদর্শটা তাঁর পছন্দ।

আল্লাহ এক। সবাই তাঁরই সৃষ্টি। আল্লাহ যদি সব মানুষের জন্য চাঁদের আলো, মেঘের ছায়া, সূর্যকিরণ, বৃষ্টি সমান করে দেন, রাষ্ট্র কেন তাহলে মানুষে মানুষে পার্থক্য করবে? তা হয় না। গণতন্ত্রে সব মানুষ সমান। প্রতিটা মানুষ এক ইউনিট। প্রত্যেকের এক ভোট। রাজার ছেলের এক ভোট, নুলো ভিখিরির এক ভোট। এটাই গণতন্ত্রের মূল কথা। এখানেই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।

মুজিবের আজ মনে পড়ছে চন্দ্র ঘোষের কথা।

ফরিদপুর জেলে গিয়ে দেখলেন, চন্দ্রবাবু ওখানে। মুজিব, চন্দ্রবাবু আর ফণীভূষণ মজুমদার একই কক্ষে থাকতেন। ফণীভূষণ মজুমদার ইংরেজ

আমলে করতেন ফরোয়ার্ড ব্লক, তখন অনেক দিন জেল খেটেছেন, বিয়ে করেন নাই, পাকিস্তান আমলেও জেলখানাই তাঁর ঠিকানা।

আর বৃদ্ধ চন্দ্রবাবু। গোপালগঞ্জের দানশীল নিঃস্বার্থ সমাজসেবক। রাজনীতির সাতে-পাঁচে তিনি নাই। সাত্ত্বিক মানুষ, মহাত্মা গান্ধীর মতো বেশবাস, একটা সেলাইহীন কাপড় পরনে, আরেকটা গায়ে। জুতা-স্যান্ডেল পরবেন না, সব সময় খড়ম পায়ে দেবেন। কি শীতে, কি গ্রীষ্মে—এই তাঁর এক বেশ। গোপালগঞ্জ মহকুমায় স্কুল গড়ে দিয়েছেন অনেকগুলো। কাশিয়ানি থানার রামদিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছেন ডিগ্রি কলেজ। যেখানে খালকাটা দরকার পড়েছে, মানুষ গিয়ে তাঁকে ধরেছে, তিনি দান করেছেন, খালকাটা হয়েছে। যেখানে রাস্তা বানানো দরকার, সেখানে তিনি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন। একটা মেয়েদের স্কুল তিনি করে দিয়েছেন গোপালগঞ্জে। এমন মানবদরদি দেশদরদি মানুষ কমই হয়। দেশকে ভালোবেসে পাকিস্তানে রয়ে গেছেন, ভারতে যাননি। হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁর ভক্ত। হিন্দুদের মধ্যে আবার তাঁর বিশেষ ভক্ত তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে। একজন সরকারি কর্তা নিজের কাজ দেখানোর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বানিয়ে বানিয়ে যা নয় তা বলে সরকারকে রিপোর্ট দিয়েছে। অভিযোগ হলো, চন্দ্রবাবু পাকিস্তান মানেন না, তিনি ভারতের পতাকা উড়িয়েছেন। এর চেয়ে বড় মিথ্যা কথা আর কিছুই হয় না। এই অভিযোগে চন্দ্রবাবুর সাজা হয়। কিন্তু সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলেও তাঁর মুক্তি আসে না। তাঁকে নিরাপত্তা আইনে আটক দেখানো হয়। শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে চলছে তাঁর বিনা বিচার কারাবাস।

বছর চারেক আগের কথা। ফরিদপুর জেলে মুজিবের খুব জ্বর এল একদিন। মাথাব্যথা ভীষণ, বুকেও চাপ। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা চন্দ্রবাবু রইলেন মুজিবের শিয়রের কাছে বসে। তাঁর মাথা টিপে দেন, তাঁকে ওষুধ খাওয়ান, পথ্য খাওয়ান, না খেতে চাইলে ধমক দেন। তিন দিন চন্দ্রবাবু একবারও বিছানায় শোন নাই, এক ফোঁটাও ঘুমান নাই। ফণীভূষণ মজুমদারও অনেক সেবাযত্ন করেছেন মুজিবের। অন্য বন্দীরাও তাঁর জন্য খেটেছেন। মুজিবের মাথায় পানি ঢেলে দিয়েছেন চন্দ্রবাবু।

মুজিব তাঁকে বলেছিলেন, 'এত কষ্ট করবেন না। আপনারও তো বয়স হয়েছে, এই বয়সে এত কষ্ট আপনার সহ্য হবে না। একটু শোন। একটু বিশ্রাম করেন।'

চন্দ্রবাবু জবাব দিয়েছিলেন, 'সারাটা জীবন এই কাজ করেছি। মানুষের সেবা। এখন এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। বুড়া বয়সে আর কোনো কষ্ট পাই না।'

ডাক্তার এসে বললেন, 'শেখ সাহেব, আপনাকে হাসপাতালে নিতে হবে।'

চন্দ্রবাবু বললেন, 'ওষুধপথ্য লিখে দেন। ওষুধ এখানে দিয়ে যান। হাসপাতালে নিতে হবে না। ওখানে ওকে কে দেখবে?'

মুজিব এই বৃদ্ধের সেবা আর যত্নের গুণেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তারপর চন্দ্রবাবু নিজেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। মুজিবকে নেওয়া হয়েছিল গোপালগঞ্জ, ওখানকার আদালতে তাঁর মামলার হাজিরার তারিখ ছিল। ফিরে এসে দেখেন এই অবস্থা—চন্দ্রবাবু ঘোরতর অসুস্থ। হার্নিয়া ছিল, পেটে চাপ পড়ে নাড়ি উল্টে গেছে, মুখ দিয়ে মল বেরোচ্ছে, অপারেশন করতে হবে, মারা যেতে পারেন যেকোনো মুহূর্তে।

তাঁর আত্মীয়স্বজন কেউ নাই। অপারেশনের অনুমতি কে দেবে?

চন্দ্র ঘোষ নিজেই তাঁর অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করে দিলেন।

চন্দ্র ঘোষকে জেল হাসপাতাল থেকে বাইরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ট্রেচারে করে। সেখানে তাঁর অপারেশন হবে। জেলগেটে চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার তো কেউ নাই। কেবল আছে শেখ মুজিব। সে আমার ছোট ভাইয়ের তুল্য। তাঁকে আমি একবার দেখতে চাই। জীবনে তো আর দেখা হবে না।'

তখন মুজিবকে নেওয়া হলো জেলের গেটে।

চন্দ্র ঘোষকে দেখে বড় মায়া হলো মুজিবের, এত শুকিয়ে গেছেন, চোখ বসে গেছে, মুখমণ্ডলে ক্লেশের চিহ্ন। চন্দ্রবাবু মুজিবকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'আমার কোনো দুঃখ নাই। কিন্তু মরার আগে আমার একটাই দুঃখ। ওরা আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে বদনাম দিল। কোনো দিন হিন্দু-মুসলমানকে আলাদা করে দেখি নাই, সব সময় সমান দৃষ্টিতে দেখেছি। সবাইকে বোলো আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখবা। মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য তো ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই। আপন ভেবে তোমাকে কথাগুলো বললাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

তাঁর কথা শুনে উপস্থিত ডাক্তার, জেলার, ডেপুটি জেলার, সুপারিনটেনডেন্ট, গোয়েন্দা কর্মচারী সবার চোখে জল চলে এল। জেলগেটে নেমে এল বিষাদের ছায়া। মুজিবের চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি চোখ মুছে ধরা গলায় কোনোমতে বললেন, 'আপনি ভালো হয়ে যাবেন চন্দ্রবাবু। এত বড় ডাক্তার আপনার অপারেশন করবে। আর চিন্তা করবেন না। আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।'

বলতে বলতে কান্নায় মুজিব নিজেই ভেঙে পড়লেন।

আজ আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক সংগঠন করা গেল। চন্দ্রবাবুর কথা আজ তাই তাঁর খুব মনে পড়ছে।

চন্দ্রবাবু সেরে উঠেছিলেন। হাসপাতালে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। তারপর তাঁকে এক হাতে মুক্তির আদেশ ধরিয়ে দিয়ে আরেক হাতে দেওয়া হয় আরেক হুকুম, তিনি গৃহবন্দী। তাঁর গ্রাম রামদিয়ায় তাঁকে থাকতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তবে চিকিৎসার জন্য চাইলে আপনি কলকাতা যেতে পারেন। তাতে আমাদের সরকারের কোনো আপত্তি নাই।'

চন্দ্রবাবু জেলখানায় এলেন তাঁর জিনিসপত্র নিতে। তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাচ্ছেন। তাঁর জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাই ভারতে চলে গেছে। বিশেষ করে, তাঁকে গ্রেপ্তারের পরে ভয়েই দেশ ছেড়েছে অনেকে।

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে জেলগেটে গেলেন মুজিব।

চন্দ্রবাবু বললেন, 'মুজিবর, দেশ ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। এখানে যে আমার নাড়িপোঁতা।'

মুজিবর চোখ আবার জলে ভরে যায়।

আরমানিটোলার বাড়িতে তখন অনেক আলো, সেই আলোর মধ্যেই মুজিব ঘুমিয়ে পড়লেন। এক টুকরা রোদ তাঁর মুখে এসে পড়েছে, আর তাঁর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে।

দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত